প্রেম-ভক্তির রসঘনবিগ্রহ, সর্বযুগসমন্বয়ের দীপঙ্কর

অখণ্ড অমিয় শ্রী গৌরাঙ্গ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

গ্রন্থম্, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ
অগাস্ট, ১৯৬৫ (ভাদ্র, ১৩৭২)

প্রকাশক
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা
গ্রন্থম্
২২।১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

একমাত্র পরিবেশক পত্রিকা সিণ্ডিকেট (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১৬

শিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মূল্য ৭'৫০

ভূমিকা

'তোমারি নাম বলব, বলব নানা ছলে।' আর কিছু না হোক, পাকে-প্রকারে কিছু কৃষ্ণনাম হরিনাম রামনাম গৌরনাম বলা হল লেখা হল দেখা হল এইটুকুই যা লাভ। সুদুরাচারও ভগবানের কাছে বর্জনীয় নয়। নামাভাসেই তার পাপদোষের খণ্ডন হবে, জাগবে কৃষ্ণপ্রেম। 'বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম, সেই ডাকে মোর শুধু পুরবে মনস্কাম।' তাই নাম করতেই ভক্তি এসে যায়, আবার ভক্তি ভাবতে নাম দেখা দেয়। এই নাম-ভক্তিই একসঙ্গে চৈতন্য-নিত্যানন্দ। এ কথার ইতি নেই, অন্ত নেই, মুখর শেষ হলে মৌনে এর সঞ্চার হয়, আবার মৌন থেকে মুখরে স্ফুরিত হয়ে ওঠে। 'অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।'

অচিন্ত্যকুমার

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দসহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

'পতিতপাবনহেতু তোমার অবতার।
আমি বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি, সবে তোমা বিনে॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিত-পাবন-নাম তবে সে সফল॥
সত্য এক বাত কঁহো শুন দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥
মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল

৬৩

সন্ন্যাসগ্রহণের পর ছ'বছর যে লীলা করলেন তা প্রভুর মধ্যলীলা। শেষ আঠারো বছরের লীলার নাম অন্ত্যলীলা। মধ্যলীলায় প্রভু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেছেন কিন্তু অন্ত্যলীলায় নীলাচলের বাইরে পা বাড়ান নি। অন্ত্যলীলার আঠারো বছরই নীলাচলে।

বৃন্দাবন থেকে প্রভু নীলাচলে এসেছেন এই সংবাদ পোঁছুল গৌড়ে। স্বরূপ দামোদরই পাঠালেন সংবাদ। গৌড়ীয় ভক্তেরা সকলেই আনন্দিত। সকলে চলল শ্রীক্ষেত্রে গৌরমিলনের আকাঙ্ক্ষায়। শচীমাতাও আনন্দিত। মন বলে উঠল, চলো তুমিও চলো। কিন্তু তিনি কী করে যান? বিষ্ণুপ্রিয়াকে তবে কে দেখে?

প্রভুর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে আছে রূপ। তার সেখানে কৃষ্ণলীলা নাটক লেখবার অভিলাষ হল। গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক লিখে ফেলল। কিন্তু প্রভু যদি নীলাচলে গিয়ে থাকেন আমিও তবে সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিই। অনুপম বললে, আমিও যাব। দুই ভাই প্রয়াগ হয়ে কাশী হয়ে পোঁছুল গৌড়ে। গৌড় থেকেই যাত্রা করব নীলাচল।

এমন বিধান, গৌড়ে এসে অনুপম অসুস্থ হয়ে পড়ল। রূপ অনেক পরিচর্যা করল কিন্তু অনুপম তারকব্রহ্ম নাম করতে-করতে গঙ্গাপ্রাপ্ত হল।

রূপের তাই দেরি হয়ে গেল, গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গ নিতে পারল না। সে চলল একাকী। চলল অনন্যলক্ষ্য।

পথে যেতে-যেতে সে তার নাটকের কথা ভেবেছে, কখনো বা খসড়া করেছে। নাটকের কথাই তো কৃষ্ণের কথা। আর কৃষ্ণ এখন কোথায় সশরীরে ?

নীলাচলে।

পথে সত্যভামাপুরে একরাত্রি বিশ্রাম করল রূপ। রাত্রে স্বপ্ন দেখল। দেখল এক দিব্যরূপা নারী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, 'আমাকে চিনতে পারলে ?'

'পেরেছি।'

'কৃপা করে দর্শন দিয়েছি তোমাকে।' বললে সে অলোকরূপসী : 'আমি সত্যভামা।'

'আদেশ করুন।'

'আমার নাটক আলাদা করে লেখ। ব্রজলীলা আর দ্বারকা-লীলা মিশিয়ে দিও না। আলাদা করে লিখলেই তোমার দুই নাটক সার্থক হবে।'

এই নির্দেশের তাৎপর্য বুঝতে পারল রূপ। যেন মাধুর্য আর ঐশ্বর্যকে একত্র না করি।

ব্রজে কৃষ্ণের লীলা মাধুর্যময়ী আর দ্বারকায় ঐশ্বর্যময়ী। ব্রজে ঐশ্বর্য মাধুর্যের অনুগত, কিন্তু দ্বারকায় ঐশ্বর্য স্বতন্ত্র, মাধুর্যনিরপেক্ষ। সুতরাং এদের বর্ণন-বন্দন আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ভাবতে-ভাবতে হরিদাসের বাসায় এসে উঠল রূপ। কাশী মিশ্রের বাড়ির দক্ষিণে নির্জনে হরিদাসের বাসা।

আগে হরিদাসকে দেখি পরে মহাপ্রভুকে দেখব। আগে ভক্তকে স্বীকার করি পরে ভগবানকে স্বীকার করব।

ভাগবতেও আগে ভক্তের কথা পরে ভগবানের।

রূপে অশেষ দৈন্যভাব। সে দৈন্যভাবেই রূপবান। এ দৈন্য মৌখিক নয়, এ একেবারে অস্থি-মজ্জায়। অন্তরের স্তরে-স্তরে। উদ্যোগ করে প্রথমেই প্রভুর কাছে গেলে বোধ হয় অহঙ্কারের মত

দেখায়। তাই আগে হরিদাসের কাছে গিয়ে বসি। ভক্তের কৃপা না পেলে ভগবানের কৃপা পাব কী করে?

'আরে, তুমি?' হরিদাস লাফিয়ে উঠল : 'প্রভু আমাকে আগেই বলেছিলেন তুমি আজ আসবে।'

'কোথায় বললেন?'

'আমার বাসায়, এইখানে।'

'এইখানে?'

'হ্যাঁ, প্রত্যহ প্রাতে জগন্নাথের উপলভোগ দর্শন করে আমার বাসায় এসে পদধূলি দেন। তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ। প্রভুর সময় হয়েছে আসবার।'

আর বলতে-বলতেই প্রভু এসে উপস্থিত।

উপস্থিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই রূপ দণ্ডবৎ হয়ে পায়ে পড়ল। হরিদাসও দণ্ডবৎ হল। প্রভু আগে হরিদাসকে আলিঙ্গন করলেন। পরে রূপকে।

তারপরে তিন জনে বসলেন ঘন হয়ে। কুশল প্রশ্নের পর সুরু হল কৃষ্ণকথা।

কৃষ্ণ আমার নিত্যকিশোর। 'কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ।' তার প্রৌঢ়ত্ব নেই বার্ধক্য নেই রুগ্নত্ব নেই বয়োমালিন্য নেই। 'রসময় মূর্তি—সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।' রসের সদন—অশেষ বিশেষে রস আস্বাদন করছে। পূর্ণরসস্বরূপ, পূর্ণানন্দস্বরূপ। কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন। কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে লোভ উপজায়।

'তারপর সনাতনের খবর কী?'

'তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।' বললে রূপ, 'আমি এলাম গঙ্গাপথে আর উনি রাজপথ দিয়ে গিয়েছেন।'

'আর অনুপম?'

'গৌড়ে গঙ্গাতীরে দেহ রেখেছে।'

প্রভু রূপকে হরিদাসের বাসায় থাকতেই উপদেশ করলেন। উপদেশ করে চলে গেলেন নিজগৃহে।

গৌড়ীয় ভক্তরা আগেই চলে এসেছে, তাদের নিয়ে প্রভু এলেন রূপের কাছে। রূপ সকলকে দণ্ডবৎ করল, ভক্তরাও আলিঙ্গন করল রূপকে।

অদ্বৈত ও নিত্যানন্দকে প্রভু বললেন, 'তোমরা কায়মনে রূপকে কৃপা করো। যাতে তোমাদের কৃপাতে রূপের প্রাণে শক্তিসঞ্চার হয়। আর শক্তিসঞ্চার হলেই তো রূপ কৃষ্ণরস ও কৃষ্ণভক্তি সম্যক ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

ভক্ত কৃপাস্পর্শে রূপের মধ্যে তত্ত্বপ্রকাশিকা শক্তি প্রস্ফুটিত হোক।

প্রভু যাকে কৃপা করেছেন তাকে স্নেহ করতে কার অসাধ হবে ?

প্রত্যহই প্রভু এসে হরিদাস আর রূপের সঙ্গে মিলিত হন, ইষ্টগোষ্ঠী করেন—অর্থাৎ করেন কৃষ্ণালোচনা। মন্দির থেকে যে প্রসাদ পান তাই বণ্টন করে দেন।

রথের আগের দিন তো ভক্তদের নিয়ে গুণ্ডিচামন্দির মার্জন করলেন, আইটোটার বাগানে করলেন বন্যভোজন। রূপ দেখল ভক্তরা প্রসাদ পাচ্ছে আর বলছে হরি-হরি। রূপের পাশে হরিদাস, হরিদাসও দেখল। ওরা, রূপ আর হরিদাস, নিজেদের হেয় ও অস্পৃশ্য মনে করে, তাই ভক্তদের সমান পঙক্তিতে না বসে দূরে বসেছে। দূরে বসেই দেখল ভোজনলীলা। সকলের আহার হয়ে গেলে গোবিন্দকে দিয়ে প্রভু পাঠিয়ে দিলেন তাঁর ভুক্তাবশেষ। প্রভুর শেষ প্রসাদ দেখে ওদের আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠল। আর আমাদের পায় কে ! প্রেমে মত্ত হয়ে নাচতে লাগল দু'জনে।

আরেক দিন, রূপের বাসায়, ভক্ত সমাবেশে প্রভু বলে উঠলেন : 'কৃষ্ণকে ব্রজের থেকে বার কোরো না। ব্রজ ছেড়ে কৃষ্ণ কোথাও কখনো যায় নি।'

এর তাৎপর্য কী ?

তাৎপর্য প্রকট লীলায় কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যান কিন্তু অপ্রকট লীলায় বৃন্দাবনেই বন্দী থাকেন। অর্থাৎ যে ঘটনার উপলক্ষে

কৃষ্ণকে ব্রজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হচ্ছে সে সব ঘটনা তোমার নাটকে বর্ণনা কোরো না। শুধু ব্রজলীলাতেই আবদ্ধ রেখো। তোমার নাটক ব্রজলীলায় সুরু, ব্রজলীলায় শেষ। তাতে মথুরা-দ্বারকার কীর্তি কাহিনী যেন না থাকে। তোমার নাটকে বৃন্দাবনই নন্দিত হোক।

রূপ বিস্ময় মানল। সত্যভামা বলে গেল, আমার পুরলীলার নাটক আলাদা লেখ। এখন রাধাবিভাবিতচিত্ত প্রভু বলছেন, ব্রজলীলার নাটক যেন পৃথক হয়। দুই ধামের দুই কৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্ন ভাবে একই আদেশ করলেন।

তাই হবে।

দুই ভাগে ভাঙব নাটককে। পৃথক পৃথক নান্দী প্রস্তাবনা লিখব। ঘটনাবিন্যাসও দু'রকম। দু'রকমের ভাবগৌরব।

চলো রথাগ্রে প্রভুর নৃত্য দেখে আসি।

কিন্তু নৃত্যের সঙ্গে-সঙ্গে ঐ কোন শ্লোক তিনি আবৃত্তি করছেন? 'যঃ কৌমারহরঃ—' সবই সেই রকম আছে, আমিও আছি, আমার মনোহারী প্রেমিকও আছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ম্লান হয় নি, তবু প্রথম যৌবনোন্মেষে যে জায়গায় দু'জনের মিলন হয়েছিল সেই জায়গায় সেই মিলনটির জন্যেই আমি উৎকণ্ঠিত।

প্রভু ভাবছেন তিনি রাধা আর জগন্নাথ কৃষ্ণ। আর এ স্থান যেন কুরুক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রে মিলনে রাধার তৃপ্তি নেই, চলো, ব্রজে ফিরে যাই আমাদের সেই নিভৃত নিকুঞ্জে, সেইখানে আমাদের সেই আদিম মিলনমুহূর্তটি কুড়িয়ে নিই।

প্রভু কেন এই শ্লোক পড়ছেন কে জানে!

রূপ জানে। রূপ বুঝেছে। সে তখুনি তার অথশ্লোক রচনা করল। 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ।' কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাধা বলছে সহচরীকে, দেখ, ইনি সেই বৃন্দাবনবিহারী কৃষ্ণ আর আমিও সেই রাধা। আমাদের এই মিলনও সুখদায়ক, দীর্ঘ

বিরহের পর বলে এই মিলন প্রায় প্রথম সঙ্গমের মতই রমণীয়, তবু আমার মন সেই যমুনাপুলিনচারী কৃষ্ণকেই শুধু কামনা করছে। আর চাইছে এ স্থানের পরিবর্তে সেই মধুবন যেখানে কৃষ্ণ বাঁশি বাজাত আর ঘুরে বেড়াত আর যেখানে বাঁশির পঞ্চম স্বরে পুলিন-কানন শিহরিত হত, রোমাঞ্চিত হত, ধারণ করত মধুরিমা।

'সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥'

শ্লোকটি একটি তালপাতায় লিখে রূপ তা ঘরের চালের মধ্যে গুঁজে রাখল। সমুদ্রস্নান করতে গিয়েছে, প্রভু হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন চালের মধ্যে তালপাতা গোঁজা। টেনে এনে দেখলেন তাতে একটি শ্লোক লেখা। আহা, কী মধুর সে শ্লোক। প্রভুর যে গোপন ভাব একমাত্র স্বরূপ দামোদরের জানা তা রূপ টের পেল কী করে?

স্নানান্তে ফিরল রূপ। এ কি, প্রভু দাঁড়িয়ে! দণ্ডবৎ করল আভূমি।

প্রভু অঙ্গনে নেমে এসে রূপকে এক চড় মারলেন। ক্রোধের চড় নয় স্নেহের চড়। দৃঢ় আলিঙ্গন করে ধরলেন। বললেন, 'তুমি আমার অন্তরের গোপন কথা কী করে জানলে? তোমাকে কে বোঝাল?'

শ্লোকটা পড়তে দিলেন স্বরূপকে। আশ্চর্য, কী করে জানতে পারল আমার নিগূঢ় তত্ত্ব?

'শুধু তোমার কৃপাশক্তিতে।' বললে স্বরূপ, 'তোমার কৃপা ছাড়া তোমার মনের ভাব কার সাধ্য কে বোঝে? শ্লোক উচ্চারিত হোক শব্দের বাচ্যার্থ প্রাঞ্জল হোক, নিহিত সত্যকে বুঝতে হলে তোমার কৃপার দরকার।'

'হ্যাঁ,' সমর্থন করলেন প্রভু, 'প্রয়াগে যখন রূপকে দেখি, মনে হল এ যোগ্য পাত্র। তাই আমি একে কৃপা করে শক্তিসঞ্চার

করেছি, ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ দিয়েছি। রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যেখানে যে বিশেষত্ব আছে তুমি একে বুঝিয়ে দিও।'

'ওর ঐ শ্লোক দেখেই আমি আপনার কৃপা বলে সিদ্ধান্ত করেছি।' বললে স্বরূপ: 'ফল দেখেই ফলের কারণও বোঝা যায়। কারণে যে গুণ বর্তমান তাই কার্যে প্রতিফলিত। রূপের প্রতিভা যেখানে কার্য আপনার কৃপাই সেখানে কারণ। ভগবানের কৃপা ছাড়া প্রতিভা অসম্ভব।'

হাঁসকে দময়ন্তী বললেন, তুমি এত সুন্দর হলে কী করে? অনুমান করো। স্বর্গে নদী বয়, সেই নদীতে স্বর্ণকমল ফোটে, সেই স্বর্ণকমলের মৃণাল আমি ভোজন করি। তাতেই আমার দেহের এই কান্তি-পুষ্টি, সৌন্দর্য-মাধুর্য।

শয়ন-একাদশী থেকে সুরু করে উত্থান-একাদশী পর্যন্ত চার মাসের নাম চাতুর্মাস্য। চাতুর্মাস্যের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দেশে ফিরে গেল। কিন্তু রূপ ফিরল না। প্রভুর চরণে শরণ নিয়ে থেকে গেল নীলাচলে।

একদিন নাটক লিখছে রূপ, প্রভু এসে উপস্থিত হলেন। প্রণাম-আলিঙ্গনের পর প্রভু জিগগেস করলেন, 'কী লিখছ?' বলেই এক পত্র ধরে টান মারলেন।

কী সুন্দর হস্তাক্ষর। যেন মুক্তোর সার। সপ্রশংস প্রভু অক্ষরের স্তুতি করলেন। যেমন অক্ষর তেমনি রচনা। কী অপূর্ব শ্লোক! 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং—'

'কৃ' আর 'ষ্ণ' এই দু'টি অক্ষর কী অমৃতে তৈরি বলতে পারো কেউ? এই দুটি শব্দ যদি একত্র হয়ে জিহ্বাগ্রে নাচতে আরম্ভ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত শত মুখে শত শত জিহ্বায় এই নাচের আসর বসুক, যদি এক কানে তা প্রবেশ করে, ইচ্ছে হয় আরো শত শত কানে তা বিস্তৃত হোক, আর যদি একবার তা চিত্তপ্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হয় অন্য-অন্য ইন্দ্রিয়ের শত শত ঘরে খিল পড়ে যাক।

অর্থাৎ এক মুখে কত বলব, অসংখ্য মুখ অসংখ্য জিহ্বা পাবার আকাঙ্ক্ষা হয়। দুই কানে নামসুধা কতটুকু পান করব, ধ্বনির অমৃত ধরবার জন্যে অসংখ্য কান দাও। আর ইন্দ্রিয়সমূহ কত প্রবল কত সক্রিয় কিন্তু নামের সামনে তাদের আর অস্তিত্ব নেই, তারা তখন মন্ত্রশান্ত বিলয়তন্ময়। নদীতে বান এলে যেমন খাল-বিল-জলা-নালা জলে একাকার হয়ে যায় তেমনি নামসমুদ্র উথলে উঠলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ডুব মারে তলিয়ে যায় অতলে। এমন কৃষ্ণ নাম কোন মধুতে প্রস্তুত।

হরিদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'শাস্ত্রে আর সাধুমুখে কৃষ্ণনামের অনেক মহিমা শুনেছি কিন্তু এমনটি কখনো শুনিনি। যেমন নাম তেমনি তার ব্যাখ্যা। মধুরে-মধুরে কোলাকুলি।'

এখন একবার রামানন্দ আর সার্বভৌম দেখুক। তারা কী বলে।

তাদের কাছে প্রভু রূপের গুণ বর্ণন করলেন। তোমরাও বিচার করো রূপ কেমন লিখেছে! ভাবে ছন্দে রসে কাব্যে কেমন উতরেছে তার রচনা!

ঈশ্বরের বোধ করি এই রকমই রীতি। ভক্তের কোনো ত্রুটিই গায়ে মাখেন না। নেন না কোনো অপরাধ। অল্প সেবাকেই বহু বলে মানেন। ভক্তের কাছে হারেন। ভক্তের হাতে দান করে দেন নিজেকে।

'ঈশ্বরস্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্প সেবা 'বহু' মানে, আত্মপর্যন্ত প্রসাদ ॥'

আর তিনি এমন, দুর্জনের প্রতিও অসূয়া প্রকাশ করেন না। তিনি স্বীয় স্বভাবেই নির্মলমতি।

ভক্তদের নিয়ে একদিন বসলেন রূপ-হরিদাসের বাসায়।

রূপকে বললেন, 'তোমার শ্লোক দুটি পড়ো।'

লজ্জায় মুখ লুকোতে চাইল রূপ। 'লজ্জাতে না পড়ে রূপ—মৌন ধরিল।' তখন স্বরূপ দামোদর পড়ল। 'প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ—'

সকলে চমৎকার মানল।

ভট্টাচার্য বললে, 'তোমার হৃদয়ের কথা তোমার কৃপা ছাড়া অন্যে জানবে কী করে? রূপ গোস্বামীতে যে তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে সবই তোমার কৃপাস্পর্শে।'

'তা ছাড়া আবার কী।' সায় দিল রামানন্দ। বললে, 'আমার মত সামান্য মানুষে প্রভু শক্তি সঞ্চার করলেন। আর তাঁর কৃপা-শক্তিতে আমি সে-সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলাম যার অন্ত ব্রহ্মারও সুদুর্লভ। একমাত্র তোমার প্রসাদেই,' প্রভুর দিকে তাকাল রামানন্দ: 'তোমার হৃদয়ের অনুবাদ সম্ভবপর।'

প্রভু রূপকে বললেন, 'আহা, দ্বিতীয় শ্লোকটি পড়ো যে শ্লোকে মানুষ শোক-দুঃখ ভুলে যায়—'

দ্বিতীয় শ্লোকটি রূপ নিজে পড়ল। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে—'

সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল।

'কী বই লিখছ' জিগগেস করল রামানন্দ, 'যার মধ্যে আছে, এই সিদ্ধান্তখনি?'

স্বরূপ বললে, 'কৃষ্ণলীলা। ব্রজলীলা আর পুরলীলা দুই লীলা আগে একত্র ছিল। এখন পৃথক হয়ে গিয়েছে। এখন বিদগ্ধমাধব আর ললিত-মাধব। দুইই নাটক। বিদগ্ধমাধবে ব্রজলীলা আর পুরলীলা ললিতমাধবে। আর দুই নাটকেই পরিপূর্ণ প্রেমরস।'

৬৪

রামানন্দ বললে, 'তবে এবার নান্দী শ্লোক পড়ো।'

রূপ পড়তে লাগল।

'হরিলীলাকথা তোমার সমস্ত তৃষ্ণা, সমস্ত অতৃপ্ত ভোগবাসনা হরণ করুক। কী রকম সে কথা? যেন চিনিপাতা দই। তাতে ব্রজসুন্দরীদের প্রণয়কর্পূর মেশানো। তাতেই সুগন্ধি করা। এমন সে সুধা যা চন্দ্রসুধার মাধুর্যগর্বকে ম্লান করেছে। সে স্নিগ্ধ ও সুস্বাদু পানীয় সংসারপথশ্রান্ত সন্তপ্ত প্রাণীদের তৃষ্ণা দূর করে। দুর্বিষয়ের তৃষ্ণা।'

রামানন্দ বললে, 'এবার ইষ্টদেবের বর্ণন করো।'

প্রভু সামনে বসে, কী করে পড়ে? রূপ কুণ্ঠিত হয়ে রইল।

'সে কি, সঙ্কোচ কিসের?' প্রভু আশ্বাস দিলেন: 'গ্রন্থের ফল সমস্ত বৈষ্ণবসমাজকে শোনাও।'

রূপ পড়ল: 'পুরটসুন্দরদ্যুতি শচীনন্দন হরি সকলের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হোক। যিনি উন্নত-উজ্জ্বলরসাশ্রিতা ভক্তিশ্রী করুণা করে বিতরণ করছেন—যে শ্রী বহুদিন ধরে সংসারে অনুপস্থিত।'

সকলে বলে উঠল: 'এই শ্লোক শুনে কৃতার্থ হলাম। রূপ, তুমি এই শ্লোক শুনিয়ে সকলকে কৃতার্থ করলে।'

রামানন্দ জিগগেস করল, 'তোমার নাটকে প্রস্তাবনা কী নিয়ে? সূত্রধার এসে কী বলছে?'

'বলছে, বসন্তকাল সমাগত। এবার পূর্ণচন্দ্র বিশাখা তারার সঙ্গে মিলিত হবেন।' 'অর্থাৎ', রূপ বললে, 'পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ রুচিরা রাধিকার সঙ্গে মিলিত হবেন।'

'তারপর বলো কী নাটকের প্ররোচনা?'

শ্রোতাদের প্রশংসা করে তাদের উন্মুখ করার নাম প্ররোচনা। আর সেই সঙ্গে লেখকের দৈন্য জানানো।

'প্ররোচনা এই ভাবে।' রূপ বললে, 'স্বভাবোজ্জ্বল ভক্তেরা এসে উপস্থিত হয়েছেন। গোপিনীবন্ধু কৃষ্ণ সজ্জিত হয়েছেন। বৃন্দাবনের রাসস্থলীও নৃত্য-কলাবিধির উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে। মনে হয় আমার মত অভাজনেরও কিছু পুণ্যফল ছিল। হে

বুধমণ্ডলী, আমি ক্ষুদ্র হলেও আমার কথা তুচ্ছ হবে না। কেন না সে কথা হরিগুণময়ী কথা, হরির গুণবর্ণনায় পরিপূর্ণ। সে কথা সিদ্ধার্থবিধাত্রী। আপনাদের যা অভীষ্ট এই কথা তারই সিদ্ধি এনে দেবে। নীচ জাতি পুলিন্দ যদি কাঠ ঘষে আগুন উৎপাদন করে সে আগুন কি স্তিমিত হয়, না কি সেই আগুনে সোনার অন্তর্মল দূরীভূত হয় না? আমি লঘু হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় লঘু নয়। আমি হীন হতে পারি কিন্তু আমার বিষয় গুণগরীয়ান।'

রামানন্দ বললে, 'তবে এবার প্রেমোৎপত্তির কারণগুলি বলো।'

'রতির আবির্ভাবের কারণ সাতটি। অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব।'

অভিযোগ কী রকম? বিশাখাকে বলছে রাধিকা, যমুনার পারে গিয়ে দেখলাম, কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে, এমন নির্লজ্জ, আমার অধরের দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছে আর সতেজ লতার নতুন পাতা দংশন করছে। যেন দাঁতে পাতা কাটছে না, আমার হৃদয় কাটছে।

বিষয়? রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই পাঁচটি বিষয়। কৃষ্ণের রূপ দেখে, কৃষ্ণের মুখের তাম্বুল আস্বাদ করে, কৃষ্ণের গাত্রগন্ধে, কৃষ্ণের পদশব্দে বা বংশীধ্বনিতে বা কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ স্পর্শে যে রতির উদয় তার নাম বিষয়।

সম্বন্ধ? বল বীর্য শৌর্য সৌন্দর্য শীল ও সৌশীল্য সম্পর্কে গৌরববোধই সম্বন্ধ। কৃষ্ণের লোকাতীত চরিত্র চিন্তা করলে কে ধৈর্য রক্ষা করবে? বলছে ব্রজাঙ্গনা। সেই রূপ ও গুণের কাছে কে না চাইবে নিজেকে উৎসর্গ করি?

অভিমান? মমতাবুদ্ধির আধিক্য থেকেই অভিমান। এক সখী এসে রাধিকাকে বলছে, তোমার কৃষ্ণ বহুবল্লভ, তোমার কৃষ্ণ লম্পট, নিষ্প্রেম, তার প্রতি তোমার অনুরাগ কেন? আর কোনো রূপগুণান্বিত ব্যক্তিকে বেছে নাও। রাধিকা বলছে, আমার অন্যে

দরকার নেই, থাকুন অনেক পুরুষ, মাধুর্যের সমুদ্র, বৈদগ্ধ্যের পর্বত, গুণবতা রমণীরা তাদের বরণ করুক। আমার ঐ মাথায় শিখিপুচ্ছ, মুখে বাঁশি, গায়ে তিলকচিহ্ন সেই মনোহরেই একমাত্র রুচি। অন্যকে আমি তৃণতুল্য মনে করি। এই যে মনোভাব এইটিই অভিমানে। আর এই অভিমানেই রতির উদ্ভব।

তদীয় বিশেষ হচ্ছে কৃষ্ণের সংশ্লিষ্ট কোনো বস্তু। যেমন কৃষ্ণের গোষ্ঠ, কৃষ্ণের গাভী, কৃষ্ণের প্রিয়জন, কৃষ্ণের পদচিহ্ন।

কেউ কৃষ্ণ সেজেছে বা কেউ কৃষ্ণলীলার অভিনয় করছে তা দেখেও রতির উদ্রেক হতে পারে। এর নাম উপমা।

আর স্বভাব? কোনোই কারণ নেই, আপনা-আপনি এসে হঠাৎ দেখা দেয়। আর সব যে রীতি বলা হল সে লৌকিক রীতি। আসলে কৃষ্ণরতি স্বাভাবিকী। রাধিকার কৃষ্ণরতি নিত্যসিদ্ধ।

রামানন্দ প্রশ্ন করল: 'পূর্বরাগবিকার কী বলো? কাকে বলে চেষ্টা? কী বা কামলেখন?'

'নায়ক-নায়িকার সঙ্গমের আগে যে দেখাশোনার স্বাদ তাই পূর্বরাগ। আর শঙ্কা ব্যাধি শ্রম ক্লম দৈন্য অসূয়া চিন্তা নিদ্রা জড়তা উন্মাদ নির্বেদ ঔৎসুক্য মোহ ও মৃতি—এ-সবই বিকার। শরীর চাঞ্চল্যই চেষ্টা আর প্রেমপত্রই কামলেখন।'

রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের তখনো দেখা হয় নি, কৃষ্ণের নাম শুনেছে, বাঁশি শুনেছে, আর ছবি দেখেছে। তিন জনের প্রতি আমার রতি জন্মাল, ছি ছি, আমার মরণই শ্রেয়। রাধিকা কাঁদছে আর বলছে ললিতাকে। 'কষ্টং ধিক পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিং শ্রেয়সীং। এইখানে নাম, ধ্বনি আর চিত্রপট তিন বস্তুই রাগোৎপত্তির হেতু।

রাধাহৃদয়বেদনা সুদুঃসাধ্য। এর চিকিৎসা শুধু চিকিৎসকের নিন্দা। এই ব্যাধিই পূর্বরাগের বিকার।

কৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠাল রাধা: তুমি চিত্রপট রূপ ধারণ করে আমার মন্দিরে বাস করছ। তোমাকে দেখলেই আমার চিত্তবিকার

ঘটে, ভয়ে আমি পালিয়ে যাই, কিন্তু কোথায় যাব, যেখানে যাই সেখানেই তোমার ছবি দেখি। সর্বত্রই তুমি এসে আমার পথরোধ করে দাঁড়াও। সর্বত্রই তোমার স্ফূর্তি, তোমার উদ্দীপন।

ময়ূরপুচ্ছ দেখে রাধিকা কাঁদছে, গুঞ্জাবলী দেখে শোকাকুল হয়ে আর্তনাদ করছে, কখনো বা ছুটোছুটি করছে পাগলের মত। কোনো দুষ্ট গ্রহ তাকে নিশ্চয়ই ভর করেছে। কে জানে রাধিকার নবানুরাগই এই দুষ্ট গ্রহ।

রাধিকার দুঃখে বিশাখা কাঁদছে। তুমি কেন কাঁদছ? রাধিকা বলছে বিশাখাকে, 'কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি অকরুণ, তাতে তোমার কী অপরাধ? আমিই মরব। আমার মৃতদেহকে তমালের ডালে এমনি করে বেঁধে দিও যেন আমি তাকে আমার ভুজবল্লরী দিয়ে আলিঙ্গন করে আছি। আমার এই মিলনেচ্ছাকে বৃন্দাবনে অবিনশ্বর করে রেখো।'

রামানন্দ বললে, 'এবার তবে প্রেমের স্বভাব কী বলো।'

'প্রেমে যে পরিমাণে সুখ সেই পরিমাণে দুঃখ। বিষ আর অমৃত এক সঙ্গে।'

'এই প্রেমের আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সে-ই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন॥'

'সহজ প্রেম, স্বাভাবিক প্রেমের লক্ষণ কী?'

রূপ বললে, 'লক্ষণ, প্রিয়ের দোষে-গুণে প্রেমের দোষে-গুণে প্রেমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। প্রিয় যদি স্তুতি করে, মনে হয় বুঝি উপেক্ষা করছে আর যদি নিন্দা করে, মনে হয় পরিহাস। উপেক্ষায় দুঃখ, পরিহাসে আনন্দ।'

কৃষ্ণের উৎসঙ্গ সুখের আশায় গুরুলজ্জা শিথিল করে দিলাম, রাধিকা সখীদের কাছে বিলাপ করছে, তোমরা প্রাণের চেয়েও

সুহৃত্তম তোমাদেরই বা কত ক্লেশ দিলাম, সাধ্বীসেবিত মহান পাতিব্রত্য ধর্মেরও সম্মান রাখলাম না, তবুও কৃষ্ণ আমাকে উপেক্ষা করল, তারপরেও পাপীয়সী আমি বেঁচে আছি, আমার ধৈর্যকে ধিক। তারপর বলছে কৃষ্ণের উদ্দেশে, এ কী তোমার ঠিক হল? নিজের বাল্যস্বভাবে ঘরের মধ্যে আমরা খেলা করি, ভালো-মন্দ ভদ্র-অভদ্র কিছুই জানি না, আমাদের এ-রকম নিরাশ্রয় অবস্থায় টেনে আনা কি উপযুক্ত হয়েছে? তারপর টেনে এনে উদাসীন হয়ে থাকা কি আর তোমার পক্ষে সঙ্গত?

ললিতা বলছে, অন্তরক্লেশে কলঙ্কিত হয়ে যমপুরীতে চললাম, আর উনি এখনো প্রবঞ্চকের হাসি হাসছেন। হে মেধাবিনী রাধিকে, এই একটা গভীরকপট আভীরপল্লীর ধূর্তের সঙ্গে তোমার কী করে প্রেম হল?

দেবী পৌর্ণমাসী কৃষ্ণকে বললে, 'কৃষ্ণ, তুমি সমুদ্র, আর রাধিকা বাহিনী, নদী। ধর্মসেতু ভেঙে দিয়ে সে এসেছে। বেদধর্ম লোকধর্ম আর্যপথ স্বজন ভবন সব সে বিসর্জন দিয়েছে। শুধু তোমাতে মিলিত হবার জন্যে। ছেড়েছে ধব-তরু বা পতিচ্ছায়ার সান্নিধ্য, লঙ্ঘন করেছে সমস্ত গুরু-পর্বত। আর তুমি কিনা কপট বাক-চাতুরীতে তার প্রতি বিমুখতা দেখাচ্ছ?'

সকলে একবাক্যে বলে উঠল: 'চমৎকার।'

রামানন্দ প্রশ্ন করল: 'বৃন্দাবনের কেমন বর্ণনা করলে? মুরলীধ্বনির? আর কৃষ্ণ-রাধিকাকেই বা কী রকম চিত্রিত করলে?'

কৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলছে, মধুমঙ্গল, দেখ আম্রমুকুল থেকে মকরন্দ ক্ষরিত হচ্ছে, তার সুগন্ধে-মধুরে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমর এসে বন্দীকৃত হচ্ছে, চন্দনগিরির মন্দানিলে আন্দোলিত বৃন্দাবন, আমার অতুল আনন্দের আস্পদ।

এই বৃন্দাবন আমার ইন্দ্রিয়ের আনন্দবর্ধন। কোথাও ভ্রমরীর গান, কোথাও অনিলভঙ্গির শীতলতা, কোথাও বল্লীলাস্য বা লতা-

নৃত্য, কোথাও মল্লীপরিমল বা মল্লিকা ফুলের গন্ধ, কোথাও বা রসভর দাড়িম্বের স্তূপ। ভ্রমরীর গান কানের তৃপ্তি, শিশিরবায়ুর স্পর্শ ত্বকের, লতানৃত্য চোখের, মল্লিকাগন্ধ নাকের আর দাড়িম্ব রসনার।

কল্যাণী কেলীমুরলী কৃষ্ণকরে বিলাস করছে। মুরলীর দুই প্রান্তে তিন আঙুল পরিমিত স্থান ইন্দ্রনীলমণিতে খচিত, তারপরের তিন আঙুল পরিমিত স্থান দু'দিক থেকেই অরুণমণিতে খচিত, ঠিক মধ্যস্থলটি সোনা দিয়ে মোড়া আর সেই সোনায় আবার হীরে বসানো।

মুরলীকে সম্বোধন করে রাধিকা বলছে, হে মুরলি, তুমি তো জাতিতে সরল, জড়বংশে জন্ম বলে তোমার তো কুটিলতা থাকার কথা নয়, আছও তো পুরুষোত্তমের হাতে, তবে কার কাছে গোপাঙ্গনাদের বিমোহনের বিষমদীক্ষা নিলে, কোন গুরুর কাছে?

হে সখি মুরলি, তুমি বিশাল ছিদ্রজালে পূর্ণ, তুমি লঘু, অতি কঠিনা নীরসা গ্রন্থিলা, তবু কোন পুণ্যের ফলে কৃষ্ণকরের আলিঙ্গন ও কৃষ্ণাধরের চুম্বন পাচ্ছ? আমার কি সেই পুণ্য হয় না?

হায় কৃষ্ণের বাঁশি! এই বাঁশির ধ্বনিতে মেঘের গতি স্তম্ভিত হয়, তুম্বুরু ঋষি যে স্বরনাদ-বিশারদ, গায়কশ্রেষ্ঠ, সেও বিস্ময়ে চমকে ওঠে। যারা ব্রহ্মাসক্ত, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন, সেই সব সনক-সনন্দনের ধ্যান ভেঙে যায়, ব্রহ্মা তার সৃষ্টিকার্য ভোলে, গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি বলিও চঞ্চল হয় আর অনন্তদেব যে পৃথিবীকে মাথায় ধরে আছে সেও পারে না নির্বিচল থাকতে। সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে, লোকে-লোকান্তরে।

দেখ কৃষ্ণকে দেখ। তার নয়নচ্ছটায় পুণ্ডরীকের প্রভা তিরস্কৃত, তার পীতাম্বরে নবকুঙ্কুমের শোভা পরাভূত, তার আরণ্য অলঙ্কারে মণিরত্নের আভরণ বিড়ম্বিত। সেই উজ্জ্বলাঙ্গকে হরিকে দেখ, তার কান্তি হরিণ্মণিমনোহর। বামজঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ চরণটি ন্যস্ত হয়ে দেহের তিনস্থান কিঞ্চিৎ বাঁকা করে রাখা, স্কন্ধ বক্রভাবে স্তম্ভিত-

নেত্রপ্রান্ত বক্রভাবে সঞ্চারিত, সঙ্কুচিত অধরে লোলাঙ্গুলিসঙ্গত বাঁশি, নীলকমলের উপর ভ্রমরের মত নয়নের উপরে যার ভ্রূ নৃত্য করছে সেই পরমানন্দ পুরুষকে অঙ্গীকার করো।

বিশ্বকর্মা পাথর কেটে ও ছিদ্র করে কতশত মণিমুক্তা বসিয়ে দেবতাদের গৃহ-চত্বর নির্মাণ করে। এ কে নতুন বিশ্বকর্মা যে তার শাণিত অপাঙ্গের অস্ত্রে গোপতরুণীদের প্রস্তরকঠিন কুলধর্ম চূর্ণ করে নিজের গোষ্ঠস্থল খেলার মাঠ তৈরি করছে!

ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্র কে এই নবীনা যুবা? স্থিরা পতিব্রতা রমণীদের নীবিবন্ধের অর্গলচ্ছেদনের কৌতুকে নিরন্তর এ কার বাঁশি জয়যুক্ত হচ্ছে?

আর রাধিকা?

যার নয়নশোভায় নবকুবলয় পরাজিত, যার মুখোল্লাসে ফুল্ল কমলবন উল্লঙ্ঘিত, যার আঙ্গিকরুচিতে স্বর্ণকান্তি লাঞ্ছিত, রাধার সেই অনির্বচনীয় বিচিত্ররূপ ঝলমল করছে।

মধুমঙ্গলকে কৃষ্ণ বলছে, চন্দ্র দিবাভাগে বিরূপ হয়ে যায়, শতপত্র পদ্ম শর্বরীমুখে সন্ধ্যাকালেই ম্লান হয়, আমার প্রেয়সীর শ্রিয়োজ্জ্বল মুখের সঙ্গে কার তুলনা করব?

আনন্দরসতরঙ্গে কপোল যার ঈষৎ হাস্যযুক্ত, কন্দর্পধনু ভ্রূলতা যার নৃত্য করছে, ঘনসন্নিবিষ্ট পক্ষ্মযুক্ত যার চক্ষু, তারই কটাক্ষ আমাকে দংশন করছে।

রামানন্দ বললে, 'তোমার কবিত্ব অমৃতনির্ঝর। এবার তবে দ্বিতীয় নাটক ললিতমাধবের কথা বলো।'

'তুমি সূর্য আর আমি খদ্যোত,' বললে রূপ, 'তোমার কাছে কিছু ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা আমার ধৃষ্টতামাত্র।'

'না, না, পড় নান্দীশ্লোক।'

রূপ পড়ল: 'নিশানাথ চন্দ্র রাত আনে আর রাত এলেই চক্রবাক মিথুনবিহারবঞ্চিত হয় আর কমলও বিশীর্ণ হয়ে যায়।

তাই চন্দ্র চক্রবাক মিথুন ও কমলের খেদের কারণ। কী রকম চক্রবাক? না, অসুরকামিনীর স্তন। আর কী রকম কমল? না, অসুরকামিনীর মুখ। কৃষ্ণযশঃশশীও অসুরকামিনীর স্তনদ্বয়রূপ চক্রবাকমিথুনেরও মুখরূপ কমলের খেদ উৎপাদন করে। যেহেতু কৃষ্ণ তাদের স্বামীদের বধ করেছেন। স্তনে পতিকরস্পর্শের অভাব ও মুখে পতির অধরস্পর্শের অভাব থেকেই খেদ। কিন্তু চন্দ্রে উল্লাসও তো আছে। উল্লাস চকোরের। চকোর চন্দ্রের সুধাপান করে বলে চন্দ্রোদয়ে তার অসীম আনন্দ। তেমনি কৃষ্ণের দর্শনে, কৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণে সুহৃদ ও ভক্তদের আনন্দ। তাই কৃষ্ণের যশঃশশী অখিল সুহৃচ্চকোরনন্দা।'

'তারপরে দ্বিতীয় নান্দী বলো।' রামানন্দ বললে, 'রাতে ইষ্টদেবের চরণবন্দনা।'

আবার সঙ্কুচিত হল রূপ। তবু পড়ল থেমে-থেমে: 'যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হয়ে স্বীয় প্রেমসুধা অকাতরে বিতরণ করছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি অজ্ঞানতিমির নাশ করেছেন, যিনি বশীকৃতজগন্মনা, জগজ্জনের মন যাঁর বশীভূত, সেই শচীসুতশশী দিকে-দিকে আনন্দ ঢালুন।'

অন্তরে উল্লসিত হলেও বাইরে কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করলেন প্রভু: 'কৃষ্ণরসকাব্যসুধাসিন্ধুর মধ্যে আমার মিথ্যাস্তুতির ক্ষারবিন্দু মিশিয়েছ কেন? তাতে অমৃতের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেল।'

রামানন্দ বললে, 'অমৃতের সঙ্গে কর্পূর মিশল। তাতে আনন্দ-চমৎকারিতা আরো বেড়ে গেল।'

'তোমার এতে উল্লাস হচ্ছে? শুনতে লজ্জা করে, লোকে উপহাস করবে।'

'এ শুনে লোকের আনন্দ বাড়বে।' বললে রামানন্দ, 'অভীষ্টদেবের স্মৃতি চিরজাগরূক থাকবে।' তাকাল রূপের দিকে: 'ললিতমাধবের কী বিষয়বস্তু?'

'কৃষ্ণ কিরাতরাজ কংসকে নিধন করবে ও রাধাকে বিবাহ করবে।' বললে রূপ, 'সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পূর্তির জন্যে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহের প্রয়োজন।'

বংশীধ্বনির গুণকীর্তন শুনুন।

যে দূতী নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দেয় তাকে নিস্যষ্টার্থা দূতী বলে। বরবংশজকাকলী অর্থাৎ বংশীধ্বনি সেই নিস্যষ্টার্থা দূতী। রাধিকার কানের মধ্যে দিয়ে মর্মে পৌঁছে তাকে বিলজ্জা করে কৃষ্ণের কাছে টেনে নিয়ে আসে। রজ আর তম দুই-ই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটায় বৃন্দাবনে। রজ মানে গো-ধূলি আর তম মানে সন্ধ্যার অন্ধকার। সাধারণত রজ আর তমগুণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। কিন্তু বৃন্দাবনে বিপরীত। এখানে রজ আর তমই কৃষ্ণমিলনের সহায়ক। তাই ব্রজাঙ্গনার ভজনকৌশল বেদেরও অপ্রকট।

হে সহচরি, যে নবজলধরকান্তি, মদমত্ত মাতঙ্গের মত যার বিলাস, সেই নির্ভীক নিরাতঙ্ক যুবক কে? কোথা থেকে এসেছে ব্রজমণ্ডলে? হায়, তার কটাক্ষদস্যু আমার চিত্তধনাগার থেকে ধৈর্যধন লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে।

আর কৃষ্ণ বলছে রাধিকার উদ্দেশ্যে: 'যে আমার চিত্তকরীন্দ্রের বিহার মন্দাকিনী, যে আমার নয়ন-চকোরের শারদীয় চন্দ্রপ্রভা, যে আমার হৃদয়াকাশের চারুতারাবলী, বহুকালব্যাপী উৎকণ্ঠার ফলে তাকে আমি পেয়েছি।'

রামানন্দ সহস্র মুখে রূপের কবিত্বের প্রশংসা করতে লাগল। সেই কবির কাব্যরচনায় প্রয়োজন কী যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে আনন্দে না তাকে অভিভূত করে? সেই ধনুর্ধারীর বাণনিক্ষেপেই বা কী প্রয়োজন যদি তা অন্যের হৃদয়ে লগ্ন হয়ে তার মূর্ছা না ঘটায়?

প্রভুকে উদ্দেশ করে বললে, 'তোমার শক্তিতেই এই কাব্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।'

'প্রয়াগে এর সঙ্গে দেখা। এর বড় ভাই সনাতন,' বললেন প্রভু, 'তারও বিষয়ত্যাগ তোমার মতই। এই দু'ভাইকে আমি বৃন্দাবনে পাঠালাম, ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তন করবার জন্যে শক্তিসঞ্চার করে দিলাম। দেখ গ্রন্থ কেমন মধুর, প্রসন্ন ও সালঙ্কার হয়েছে। কবিত্ব থাকলেই তো রসপ্রচার হবে।'

'সব তোমার ইচ্ছায়।' বললে রামানন্দ, 'তুমি ইচ্ছে করলে কাঠের পুতুল নাচাতে পারো। গোদাবরীতীরে আমার মুখে যে-সব রসতত্ত্ব বলালে সব আবার এই রূপের লেখায় স্থাপিত হয়েছে। ভক্তের প্রতি কৃপায় ব্রজরস প্রচার করতে চাও, যাকে দিয়ে তুমি করাবে সেই করবে, সমস্ত জগৎ তোমার বশংবদ।'

রূপকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। আর রূপকে দিয়ে সকল ভক্তের চরণবন্দনা করালেন। সকলে চলে গেল হরিদাস একান্তে এসে আলিঙ্গন করল রূপকে। বললে, 'তোমার কী ভাগ্য, কে বলবে তোমার রচনার কী মহিমা।'

'আমি কিছুই জানি না। প্রভু যেমন বলিয়েছেন তেমনি বলেছি।'

প্রভুর ভক্ত গোঁসায়েরা চার মাস থেকে গৌড়ে ফিরল। রূপ থেকে গেল নীলাচলে। দোলযাত্রার পরে প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। বললেন, 'তুমি সেখানে থাকো, একবার সনাতনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

রূপ প্রভুকে প্রণাম করে বৃন্দাবনে যাবার উদ্দেশে গৌড়ে এল।

৬৫

'সর্বলোক নিস্তারিতে গৌর-অবতার।' নিস্তার কী? মায়া-মোহের বন্ধন মোচন। সংসারসাগর থেকে পার করে দেওয়া।

তিন উপায়ে এই জীবোদ্ধার। সাক্ষাৎ দর্শন, আবেশ আর আবির্ভাব।

সাক্ষাৎ-দর্শন মানে প্রভুকে যারা দেখেছে স্বচক্ষে। কখনো কেউ সামনে এসে দেখেছে, কখনো কেউ, প্রভু যখন যাচ্ছেন পথ দিয়ে, দেখেছে দূরে দাঁড়িয়ে। দেখামাত্রই মায়ামুক্তি। দেখামাত্রই হৃদয়-গ্রন্থির ছেদ, সর্বসংশয়ের শান্তি, সমস্ত কর্মের নিরসন।

আর আবেশ? আবেশ মানে প্রভুর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা। প্রভু ছাড়া আর সমস্ত কিছুর বিস্মৃতি। এমন কি নিজে যে বদ্ধজীব তারও বিস্মৃতি। লোহা আগুনে পুড়ে লাল হয়ে উঠেছে, ভুলে যাচ্ছে সে লোহা, ভাবছে সেও আগুন ছাড়া কিছু নয়।

আবেশ সকলের হয় না। যে যোগ্য তার হয়। যোগ্য কে? যে শুদ্ধসত্ত্ব যে সাধু তার হয়। সাধু কে? যে তিতিক্ষু, কারুণিক, সর্বদেহীর সুহৃদ, অজাতশত্রু, শান্ত, অক্রোধ ও সমচিত্ত সেই সাধু।

আর আবির্ভাব? সমস্ত লোকনিয়ম অগ্রাহ্য করে আত্ম-প্রকাশের নামই আবির্ভাব। লৌকিক উপায় ছাড়াই হঠাৎ এসে উপস্থিত।

'লোক নিস্তারিব—এই ঈশ্বরস্বভাব।'

কৃপাই ঈশ্বরধর্ম। তবে জীবের কেন এত দুর্দশা? দুর্দশার জন্যে দায়ী ঈশ্বর নয়, দায়ী জীব নিজে। ভগবান তো লীলানন্দেই সৃষ্টি করেছিলেন, কাউকে শাস্তি দেবার জন্যে নয়। জীবই নিজ কর্মদোষে যন্ত্রণা ভোগ করছে।

বাঙলা দেশের লোক প্রতি বছর এসে দেখে যাচ্ছে প্রভুকে। কুড়ি বছর এইরকম যাতায়াত করেছে। নীলাচলে প্রভুর চব্বিশ-বছরের মধ্যে কুড়িবছর। চারবছর তারা আসে নি। চারবছরের মধ্যে দু'বছর প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে ছিলেন, একবছর এসেছিলেন গৌড়ে আর একবছর তিনি নিজেই বারণ করে দিয়েছিলেন আসতে। এই চার-বছর। বাকি কুড়িবছর তারা এসে গেছে।

'বিংশতি বৎসর ঐছে করে গতাগতি।
অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥'

অন্যান্য দেশ থেকেও আসছে জনপ্রবাহ। এমন কি মনুষ্যবেশ ধরে গন্ধর্ব কিন্নররাও আসছে। দেবতারাও সুযোগ ছাড়তে রাজি নয়। আর যেই দেখছে সেই 'বৈষ্ণব' হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যারা আসতে পারছে না, যারা সংসারাবদ্ধ, যারা বিত্তে-বৃত্তে আসক্ত, তাদের কী হবে? তারা উদ্ধার পাবে না? তাদের জন্যে প্রভু যোগ্য দেহে আবেশ এনে দিচ্ছেন। সেই আবেশেই নিজ শক্তি প্রকাশ করছেন। আর সেই আবিষ্ট ভক্তকে দেখে সেই দেশের লোক উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে।

কালনার কাছে অম্বিকায় নকুল ব্রহ্মচারীর বাড়ি। উত্তম অধিকারী, পরম বৈষ্ণব। তার দেহে প্রভুর আবেশ হল। গ্রহ-গ্রস্তের মত হয়ে গেল নকুল। প্রেমাবেশে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়, ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়। সাত্ত্বিক বিকার, অশ্রু কম্প স্তম্ভ স্বেদ সমস্ত ফুটে উঠেছে! হুঙ্কার ছাড়ছে সঘনে। ঠিক প্রভুর মতই গৌরকান্তি, প্রভুর মতই প্রেমানন্দ। সমস্ত গৌড়দেশ ভেঙে পড়ল নকুলকে দেখতে। যাকে দেখে তাকেই বলে, কৃষ্ণনাম বলো। যে দেখে সেই প্রেমোদ্দাম হয়ে ওঠে। লোকাপেক্ষা মানে না।

শিবানন্দ সেনের সন্দেহ হল। দেখি পরীক্ষা করে। দেখি কেমন প্রভুর আবেশ হয়েছে!

নকুলের বাড়ি গেল শিবানন্দ। ভিতরে ঢুকল না, বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। কী ভাবে পরীক্ষা করবে ভাবতে লাগল।

বেশ, আমি যে এসেছি তা নকুল জানে না, দেখে নি। আমাকে নাম ধরে ডাকুক তো দেখি। না, শুধু ওটুকু হবে না। গুরু আমাকে যে ইষ্টমন্ত্র দিয়েছিলেন তাও প্রকাশ করুক। সে যদি এখন সত্যিই প্রভু হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই তার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব হবে, যেহেতু প্রভু সর্বজ্ঞের শিরোমণি। আমার

ইষ্টমন্ত্র যদি প্রভুর অজানা না হয়, আবেশধারী নকুলেরও অজানা থাকবে না।

এই বিচার করে শিবানন্দ দূরে রইল প্রচ্ছন্ন হয়ে।

বহু লোকের ভিড় হয়েছে নকুলকে দেখতে, কে শিবানন্দের খোঁজ নেয়।

হঠাৎ নকুল বলে উঠল: 'শিবানন্দ এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এস।'

কোথায় শিবানন্দ? চারদিকে লোক ছোটাছুটি করতে লাগল।

শিবানন্দ কে? কারু কারু মুখে বা এই জিজ্ঞাসা।

আরে, এই তো শিবানন্দ। যারা চিনতো ধরে ফেলল।

নকুলকে নমস্কার করে কাছে গিয়ে বসল শিবানন্দ। নকুল বললে, 'আমার সম্পর্কে তোমার সন্দেহ হয়েছে, তাই না? বেশ, আমি তোমার সন্দেহ দূর করে দিচ্ছি। তোমার ইষ্টমন্ত্র কী, তাই আমার মুখে শুনতে চাও তো? গৌর-গোপালই তোমার ইষ্টমন্ত্র। কী, ঠিক নয়?'

শিবানন্দ মেনে নিল। ঠিক বলেছ। আর সন্দেহ নেই, তোমাতেই প্রভুর আবেশ হয়েছে। শিবানন্দ তখন অনেক সম্মান-ভক্তি দেখাল নকুলকে।

আবির্ভাব দু'রকম। নিত্য আর সাময়িক। প্রভুর নিত্য আবির্ভাব চার জায়গায়। শচীর মন্দিরে, নিত্যানন্দ-নর্তনে, শ্রীবাস কীর্তনে আর রাঘব-ভবনে।

প্রেমাকৃষ্ট হওয়াই প্রভুর সহজ স্বভাব। শচীমাতা নিত্যানন্দ শ্রীবাস আর রাঘব প্রভুর সহজ প্রেমস্থল, তাঁর নিত্যনিকেতন।

আর সাময়িক?

শিবানন্দের ভাগ্নে শ্রীকান্ত। একবার রথযাত্রার আগে একাকী নীলাচলে গিয়েছিল। প্রভু তাকে বললেন, 'এবার যেন রথযাত্রার আগে কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে না আসে, গৌড়ে ফিরে গিয়ে

এ-কথা বোলো সবাইকে। আমিই এবার গৌড়ে গিয়ে সকলকে দেখা দিয়ে আসব। আর তোমার মামা শিবানন্দকে বোলো এই পৌষে হঠাৎ একদিন তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব, আর জগদানন্দ সেখানে আছে, সে আমার জন্যে রান্না করবে।'

গৌড়ে ফিরে এসে খবর দিল শ্রীকান্ত। সকলে যাত্রার আয়োজন বন্ধ করল। পৌষ মাস এলে শিবানন্দ আর জগদানন্দ প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল কবে না জানি প্রভু উদয় হন। দিনের পর দিন যায়, মাসও বুঝি ফুরিয়ে গেল, প্রভুর দেখা নেই। দুঃখে-শোকে ম্লান হয়ে গেল দু'জনে। এমন সময় হঠাৎ একদিন প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—প্রভু তার নাম রেখেছেন নৃসিংহানন্দ—শিবানন্দের বাড়িতে এসে হাজির। কী ব্যাপার, বিমর্ষমুখে বসে আছ কেন?

শুনল সব নৃসিংহ। বললে, 'বেশ, ঠিক আছে, তিন দিনের মধ্যে প্রভুকে এখানে নিয়ে আসব।'

প্রদ্যুম্ন ধ্যানস্থ হল। দু'দিন পরে বললে, 'প্রভু পানিহাটি পর্যন্ত এসেছেন। কাল মধ্যাহ্নে এখানে চলে আসবেন। রান্নার জোগাড় করো।'

পরদিন ভোর থেকে রাঁধতে সুরু করল প্রদ্যুম্ন। রান্না শেষ করে মধ্যাহ্নে ভোগ বাড়ল—তিন থালায় তিন ভোগ। এক ভোগ জগন্নাথের, আরেক ভোগ চৈতন্যপ্রভুর আর তৃতীয় ভোগ প্রদ্যুম্নের ইষ্টদেব নৃসিংহের। তিন জনকে তিন থালা সমর্পণ করে প্রদ্যুম্ন আবার ধ্যানে বসল। প্রদ্যুম্ন দেখল প্রভু এসেছেন। এসে শুধু তাঁর নিজের থালারই নয়, আরো দুই থালার ভোগও নিঃশেষে খেয়ে ফেললেন।

'কী করো কী করো!' চোখে অশ্রু, কণ্ঠে আনন্দ, চেঁচিয়ে উঠল প্রদ্যুম্ন: 'জগন্নাথের ভোগ খাচ্ছ তো খাও, তোমাতে জগন্নাথে ভেদ নেই, কিন্তু তুমি আমার নৃসিংহ ঠাকুরের ভোগ খাও কী করে? হায় হায়, আমার ঠাকুর আজ উপোসী রইল। ঠাকুরকে উপবাসী রেখে আমি বাঁচব কী করে?'

মুখে এ কথা বললে বটে কিন্তু প্রভু নৃসিংহের ভোগও গ্রহণ করেছেন দেখে মনে অগাধ শান্তি পেল প্রদ্যুম্ন। তা'হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে জগন্নাথের যেমন ভেদ নেই তেমনি নৃসিংহেরও কোনো ভেদ নেই। এ-সম্পর্কে প্রদ্যুম্নের মনে বুঝি কোনো সন্দেহ ছিল, প্রভু নিজে এসে তা খণ্ডন করে দিলেন।

পরিপাটি ভোজন করে প্রভু পানিহাটি চলে গেলেন।

'এ কি, তুমি তখন চেঁচিয়ে উঠলে কেন?' শিবানন্দ তো কিছু দেখতে পায় নি, তাই সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল প্রদ্যুম্নকে।

'বা, প্রভু যে একাই তিন ভোগ খেয়ে গেলেন।' বললে, প্রদ্যুম্ন, 'আমার নৃসিংহ যে অনাহারে রইল।'

এ কী বলছে অসম্ভব কথা! দেখলাম না শুনলাম না, অথচ খেয়ে গেল? এ কি স্বপ্ন না আবেশ না সত্য?

প্রদ্যুম্নের আদেশে শিবানন্দ আবার রান্নার জোগাড় করল। আমার উপাস্যকে এবার খাওয়াই, একলা খাওয়াই। সেবার নিয়ম-নিষ্ঠা বজায় রাখি।

পরের বছর শিবানন্দ এসেছে নীলাচল। প্রভু নৃসিংহানন্দের কথা তুললেন, তার গুণের কথা বললেন, গত পৌষ মাসে শিবানন্দের বাড়িতে কী চমৎকার রান্না করে আমাকে খাওয়ালে! এমন অন্নব্যঞ্জন খাই নি কোনো দিন।

তবে শিবানন্দের বিশ্বাস হল।

ভগবান আচার্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সরল বৈষ্ণব। বাবা শতানন্দ খান ঘোর বিষয়ী কিন্তু ভগবান আচার্য বিষয়-বিমুখ বৈরাগ্যপ্রধান। সখ্যভাবে সমাসীন। 'সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত।' ছোট ভাই গোপাল কাশীতে বেদান্ত পড়ে তার কাছে এসেছেন নীলাচলে, ভগবান তাকে প্রভুর কাছে নিয়ে গেল। গোপালকে দেখে প্রভু অন্তরে খুশি হলেন না। কৃষ্ণভক্তি ছাড়া কিছুতেই প্রভুর উল্লাস নেই, কিন্তু শঙ্কর-ভাষ্য পড়ে গোপাল তো জীবে-ব্রহ্মে এক করেছে, কৃষ্ণভক্তির বাষ্প পর্যন্ত

তাতে নেই। তবু ভগবানের ভাই সেই খাতিরে বাইরে ভাবটুকু বজায় রাখলেন।

ভগবান স্বরূপ গোঁসাইকে বললে, 'গোপাল বেদান্ত শিখে এসেছে! এস একদিন আমরা সবাই ওর ব্যাখ্যা শুনি।'

'তার মানে? তোমারও শঙ্কর-ভাষ্যে প্রীতি জন্মেছে নাকি? শঙ্কর-ভাষ্য তো ভক্তির প্রতিকূল, তবে তোমার ওতে আগ্রহ কেন?' স্বরূপদামোদর রেগে উঠল: 'গোপালের সঙ্গে-সঙ্গে তোমারও বুদ্ধিভ্রংশ হল নাকি? বৈষ্ণব যদি শঙ্কর-ভাষ্য শোনে তা হলে তার সেব্য সেবক ভাব দূর হয়ে যেতে পারে, নিজেকেই ভাবতে পারে ঈশ্বর বলে। তখন তার সমস্ত বৈষ্ণবত্বই মাটি।'

ভগবান বললে, 'আমরা কৃষ্ণনিষ্ঠ। কোনো ভাষ্যের সাধ্য নেই আমাদের মন ফেরায়।'

'তবু মায়াবাদ শুনে কোনো লাভ নেই।' বললে স্বরূপদামোদর, 'ঐ ভাষ্যে একবারও কৃষ্ণনাম শোনা যায় না, শোনা যায় কেবল চিৎ ব্রহ্ম মায়া মিথ্যা এইসব শব্দ। শঙ্কর-ভাষ্য বলছে যারা সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের কল্পনা করেছে তারা অজ্ঞ ও অজ্ঞান। এ-সব কথা শুনলে ভক্তের বুক ফেটে যায়।'

ঘোরতর লজ্জা পেল ভগবান। হয় তো বা প্রভুর কৃপা হতে বঞ্চিত হবে সেই ভয়ও ঢুকল। গোপালকে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিল দেশে।

একদিন ভগবান প্রভুকে নিজ গৃহে খাওয়াবে বলে নিমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ঘরে ভাল চাল নেই। প্রভুর কীর্তনিয়া ছোট হরিদাসকে ডেকে বললে, 'শিখি মাহাতীর বোন মাধবী দেবীকে চেন? প্রভুর মতে রাধিকা সেবার সাড়ে তিনজন মাত্র অধিকারী আছেন জগতে—এক স্বরূপ দামোদর, দুই রায় রামানন্দ, তিন শিখি মাহাতী আর আধ মাধবী। মাধবী স্ত্রীলোক বলে অর্ধ। চেন তো সেই মাধবীকে?'

'সেই বৃদ্ধাতপস্বিনী বৈষ্ণবীকে চিনি না? খুব চিনি।' বললে ছোট হরিদাস, 'কী করতে হবে তাই বলুন।'

'তার বাড়ি থেকে কিছু ভালো চাল নিয়ে এস।'

মাধবী দেবীর কাছ থেকে ভালো চাল নিয়ে এল ছোট হরিদাস।

মধ্যাহ্নে প্রভু খেতে এলেন। সরু শালি ধানের চাল দেখে ভগবানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এমন ভালো চাল তুমি কোথায় পেলে?'

ভগবান বললে, 'মাধবী দেবীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

'কে গিয়ে চেয়ে নিয়ে এসেছে?'

'ছোট হরিদাস।'

ভোজনান্তে নিজের ঘরে ফিরে প্রভু সেবক গোবিন্দকে বললে, 'তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি, আজ থেকে ছোট হরিদাসকে আমার এখানে আসতে দেবে না।'

ছোট হরিদাসের দ্বার মানা হয়ে গেল। কেন হল কে জানে। ছোট হরিদাস তো পথে বসল। কী অপরাধ করলাম তা কে জানে। আহার ত্যাগ করে কাঁদতে লাগল নির্জনে।

স্বরূপদামোদর জানতে চাইল কী কারণ। তিনদিন ধরে উপবাসী রয়েছে। কী অপরাধে তার এমন গুরুদণ্ড হল?

'ও বৈরাগী হয়ে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলেছে,' বললেন প্রভু, 'তাই ওর এই শাস্তি। যে বৈরাগী হয়ে প্রকৃতি-সম্ভাষণ করে আমি তার মুখদর্শন করি না। ইন্দ্রিয় দুর্বার, কাঠের স্ত্রীমূর্তি দেখেও মুনিদের মন টলে। বাহ্য বৈরাগ্যে, মর্কট বৈরাগ্যে কোনো ফল নেই। স্ত্রীসম্ভাষণের অপরাধের জন্য আমাকে কঠোর শাসন রাখতেই হবে।'

আর কিছু বলতে কারু সাহস হল না, সবাই চুপ করে গেল।

কিন্তু আবার একদিন গেল প্রভুর কাছে। মিনতি করে বললে, 'এবারের মত মার্জনা করুন। ওর অপরাধ সামান্য।'

'না, প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগীর মুখ আমি দেখি না।' প্রভু বললেন, 'বৃথা কথা ছাড়ো, নিজ-নিজ কাজ করো গে। আর যদি এ বিষয়ে কিছু বলো, আমি অন্যত্র চলে যাব।'

তখন সবাই গিয়ে পরমানন্দ পুরীকে ধরল।

'প্রভুকে প্রসন্ন করুন।'

পরমানন্দ একা-একা প্রভুর কাছে এসে দাঁড়াল।

'কী চাই? কেন এসেছ?' জিগগেস করলেন প্রভু।

'ছোট হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হোন।'

'তোমরা বৈষ্ণবেরা সব এখানে থাকো, আমি আলালনাথে চললাম।' বলে ডাকলেন গোবিন্দকে: 'চলো, এখানকার পাট তুলে ফেল।'

অনেক অনুনয় করে পরমানন্দ প্রভুকে ঘরে এনে বসাল। বললে, 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমার কথার উপরে আর কারু কথা চলে না। তোমার যা কিছু করা সমস্তই লোকহিতের জন্যে, তোমার গূঢ় অভিপ্রায় আমরা কী করে বুঝব বলো। তুমি এখানেই থাকো, আমরা আর কিছু বলতে আসব না।'

তখন তারা সকলে ছোট হরিদাসের কাছে গেল।

বললে, 'দয়াময় প্রভু নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। এখন ক্রুদ্ধ আছেন কিন্তু এই ক্রোধ তাঁর চলে যাবে। তুমি যদি জেদ করে উপবাস চালাও প্রভুরও জেদ বাড়বে। তুমি স্নানাহার করো, তা হলেই প্রভু শান্ত হবেন।'

ছোট হরিদাস আশ্বস্ত হয়ে স্নানাহার করল। কিন্তু কই প্রভু তাকে ডাকছেন কোথায়?

প্রভু যখন জগন্নাথ দর্শনে যান তখন ছোট হরিদাস দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। আগে কত কাছাকাছি বিচরণ করত, কত গান শোনাত, নাচত পায়ে পায়ে। কত চরণস্পর্শ পেত কত নেত্রামৃতস্পর্শ। আজ সে পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত।

উপায় নেই। লোক-শিক্ষার জন্যেই প্রভুর এই ভক্তবর্জন। এক ভক্তকে শাসন করে বহু ভক্তকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

'প্রিয় ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝাইতে।'

সকলেরই ত্রাস উপস্থিত হল। স্বপ্নেও আর কেউ স্ত্রী-সম্ভাষণ করে না।

এক বছর কেটে গেল তবু ছোট হরিদাস পেল না প্রভুর করুণা। একটিবারও তিনি ডেকে পাঠালেন না, পথে যদি পড়ে যায় তবুও তিনি তাকে এড়িয়ে চলে যান, ভ্রূক্ষেপও করেন না।

ছোট হরিদাসের জীবনে ধিক্কার এসে গেল। প্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করে একদিন রাত্রিশেষে একা-একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চলল প্রয়াগের দিকে। প্রভুপদ প্রাপ্তির সঙ্কল্প করে ত্রিবেণীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

মরদেহ ছেড়ে দিল। ধরল দিব্যদেহ। দিব্যদেহে চলে এল প্রভুর কাছে। কোথায় আর দ্বার-মানা? কে আর পথরোধ করে?

সে কী, কে গান গাইছে? কৃষ্ণগান না? হ্যাঁ, কৃষ্ণগানই তো! প্রভুকে শোনাবার জন্যেই এই গান। দেহ ছেড়ে দিলেও তোমার সেবা করা ছাড়ি নি।

প্রভু বলে উঠলেন, 'ছোট হরিদাস কোথায়?' করুণার্দ্র তাঁর কণ্ঠ: 'তাকে এখানে কেউ ডেকে আনো।'

সবাই বললে, 'কোথায় চলে গিয়েছে কেউ বলতে পারে না।'

শুনে প্রভু ঈষৎ হাসলেন। তাকে যে আমার কাছেই ডেকে এনেছি, সে যে আমাকে কীর্তন গেয়ে শোনাচ্ছে এ তোমরা কী করে জানবে? চলে গিয়েছে বৈ কি। কোথায় চলে যাবে?

একদিন সবাই সমুদ্রে স্নান করতে গেছে, জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর আর মুকুন্দ—শুনতে পেল দূরে ছোট হরিদাস গান করছে। হুবহু সেই গলা, সেই পদ! কী আশ্চর্য, লোক নেই, শূন্যে গান হচ্ছে!

গোবিন্দ বললে, 'ছোট হরিদাস নিশ্চয়ই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাই সে এখন ব্রহ্মরাক্ষস হয়েছে। নিরাকারে গান ধরেছে।'

'এ হতে পারে না।' বললে স্বরূপ, 'আজীবন কৃষ্ণকীর্তন করেছে, প্রভুর সেবা করেছে। যে প্রভুর কৃপাপাত্র তার এমন দুর্গতি সম্ভব নয়।'

প্রয়াগ থেকে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে এসে ছোট হরিদাসের কথা বললে সবাইকে। শ্রীবাস ও অন্যান্য সকলেই বিমূঢ় হয়ে গেল। যথারীতি সবাই যখন গিয়েছে নীলাচলে শ্রীবাস জিজ্ঞেস করলে প্রভুকে, 'আমাদের ছোট হরিদাস কই?'

প্রভু বললেন, 'স্বকর্মফলভুক পুমান। যে যেমন কর্ম করে সে তেমনি ফলভোগ করে।'

'শুনেছি সে ত্রিবেণীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।'

'প্রকৃতি দর্শন করলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' বললেন প্রভু, 'কিন্তু দিব্যদেহে এখন সে আমাকে কীর্তন শোনাচ্ছে।'

ত্রিবেণী প্রভাবেই ছোট হরিদাস প্রভুপদ লাভ করল।

এক লীলায় কত কাজ করলেন প্রভু। দেখালেন কারুণ্য, প্রকট করলেন ভক্তের গাঢ়ানুরাগ, প্রতিষ্ঠিত করলেন তীর্থের মহিমা। দিলেন বৈরাগ্য শিক্ষা। সর্বোপরি দেহত্যাগের পরেও ভক্তকে আপনার বলে অঙ্গীকার করলেন। তাকে দিলেন দিব্যদেহে সেবাধিকার। তুমি আমাকে বিরতিবিহীন কৃষ্ণকীর্তন শোনাও।

সাধু ভক্তির অনুষ্ঠান করবে তাতে বাহাদুরি কী, যে সুদুরাচার সে-ও যদি অনন্যভাক হয়ে আমাকে ভজনা করে, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, তা'হলে তাকেও সাধু বলে মনে করবে। কারণ সে আমাকেই শ্রেষ্ঠনিশ্চয় বলে আশ্রয় করেছে। আর চিত্রকেতু তো স্বর্গগত অবস্থায় ভজন করেছিল। ছোট হরিদাস করবে অশরীরী অবস্থায়। স্থলে-জলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র আমি কীর্তন শুনব।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালকদের বলছেন, প্রাণ অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দিয়ে জীবের যে মঙ্গলাচরণ তাই এ জগতে মনুষ্যজন্মের সফলতা। যা ইহকালে ও পরকালে প্রাণীদের উপকারের নিমিত্তভূত হয়, কর্ম, মন ও বাক্য দিয়ে তাই করবে। সর্বপ্রাণীর উপজীব্য বৃক্ষের জন্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুজনের কাছে প্রার্থী কখনো ব্যর্থ হয় না, বৃক্ষের কাছেও বিমুখ হয় না যাচক। ফল না পায় ছায়া তো অন্তত পাবে!

'মালী হৈয়া বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে॥'

আর এ বৃক্ষের ফল তো অবধারিত। এ ফলের নাম প্রেমফল। এ মহামাদক। এত মাদক যে একা খাওয়া যায় না, সবাইকে ডেকে এনে খেতে হয়, খাওয়াতে হয়। এ ফল খেলেই অজর-অমর।

'একলা মালাকার আমি কত ফল খাব?
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥'

৬৬

একটি ব্রাহ্মণকুমার প্রত্যহ আসে প্রভুর কাছে। প্রভুকে ভীষণ ভালোবাসে, প্রভুও তার প্রতি করুণ কোমল স্নেহশীল।

কিন্তু এই মেশামেশি দামোদরের কাছে অসহ্য।

'তুমি রোজ আস কেন?' বালককে দামোদর শাসন করতে চায়।

'প্রভুকে যে আমার খুব ভালো লাগে।'

'তা লাগুক। তবু তুমি আসবে না।' কঠোরকণ্ঠে দামোদর বললে।

'বা, যাকে ভালো লাগে তার কাছে আসব না?' বালক গ্রাহ্য

করল না : 'প্রভুও যে আমাকে খুব ভালোবাসেন, আসতে বলেন। না এসে তাই পারি না থাকতে।'

'না, আসবে না'। দামোদর রূঢ় হয়ে উঠল।

বয়ে গেছে! বালক তা গায়েও মাখে না। পরদিন আবার আসে। এসে বসে প্রভুর পাশটিতে।

'চমৎকার!' বালক চলে গেলে দামোদর প্রভুকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল : 'অন্যকে উপদেশ দিতে তুমি খুব ওস্তাদ, নিজের বেলায় খোঁজ নেই। বেশ, বেরোবে এবার গোঁসাইগিরি, নীলাচলে আর কান পাতা যাবে না।'

'কী হয়েছে? কী বলছ তুমি?' সরল মনে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

'তোমার কী! তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি যা খুশি করতে পারো, তোমাকে কে বাধা দেবে?' দামোদর আহতকণ্ঠে বললে, 'কিন্তু তুমি লোকের মুখ চাপা দেবে কী করে? তুমি তো পণ্ডিতের শিরোমণি, নিজেই বিচার করে দেখ না তোমার এ আচরণ ঠিক হচ্ছে?'

'কেন কী হল?'

'কেন, তুমি জানো না ঐ ব্রাহ্মণ বালকের মা বিধবা ও সুন্দরী?' দামোদরের স্বরে ঘোর বিরক্তি : 'হতে পারে, হ্যাঁ স্বীকার করি, সে সতীসাধ্বী তপস্বিনী। কিন্তু তার প্রধান দোষ সে যুবতী। আর তুমিও যুবক, পরমসুন্দর। এ নিয়ে কানাঘুষো শুরু হবে, এক কথা থেকে নানান কথা। লোককে তুমি কেন কথা বলার অবকাশ দেবে?'

কী শুদ্ধ প্রীতি দামোদরের! দামোদরের মত অন্তরঙ্গ আর হতে নেই। প্রেমে বাক্যদণ্ড দিতে পেছপা হল না। যে সত্যি-সত্যি ভক্ত সে যে তার প্রভুকেও শাসন করতে পারে তাই দেখাল দামোদর। একেই বলে নিরপেক্ষতা।

অন্তরে প্রগাঢ় সন্তোষ, প্রভু হাসলেন।

একদিন নিভৃতে ডাকলেন দামোদরকে। বললেন, 'দামোদর, তুমি নবদ্বীপে যাও। আমার মার কাছে গিয়ে থাকো। সেখানে থেকে সকলের অন্যায় আচরণ শাসন করো।'

দামোদর চুপ করে রইল।

'তুমি যখন আমার ত্রুটির জন্যে আমাকেই দণ্ড দিতে পারো, তুমি আর-সকল অপরাধীকেও সহজেই শাসন করতে পারবে। তোমার মত উচিতবক্তা আর কাউকে দেখি না।' বললেন প্রভু, 'তুমিই নিরপেক্ষ, আর কে না জানে, নিরপেক্ষ না হলে ধর্মরক্ষা অসম্ভব।'

দামোদর কথা বলল না।

'তুমি আমার মায়ের কাছে গিয়ে থাকো, আর তাঁকে বোলো আমি সুখে আছি। আমি সুখে আছি শুনলেই মা সুখী হবেন। আর তোমারই বা দুঃখ কী, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যাবে।'

'যা তুমি বলো, তাই হবে।' দামোদর বললে, 'তোমার মার কাছে গিয়েই থাকব।'

'হ্যাঁ, বলবে, নিমাই তার নিজের কথা শোনাবার জন্যেই তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে। আর সেই সঙ্গে তাঁকে মনে করিয়ে দেবে আমার গুহ্যকথা।'

কী গুহ্যকথা ?

আমি বার-বার তাঁর ঘরে যাই, মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন সব খেয়ে আসি। আমি যে খাচ্ছি মা তা দেখছেন কিন্তু বাহ্যবিরহে তাকে স্বপ্ন বলে ভাবছেন। ভাবছেন আমার নিমাই তো নীলাচলে, সে বাস্তবে এ সব খায় কী করে ? এ তবে আমার স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

মাঘী-সংক্রান্তিতে কী হল ? বিচিত্র পিঠে-পায়েস ক্ষীর-ব্যঞ্জন রান্না করেছেন মা, কৃষ্ণে ভোগ লাগিয়ে বসেছেন ধ্যান করতে। আমার মূর্তিই তখন তাঁর কাছে স্ফূর্ত হল, অশ্রুজলে ভরে গেল

হু'নয়নে দেখলেন আমিই সব খাচ্ছি, দেখে মার সে কী অগাধ পরিতোষ। অশ্রু মুছে চোখ খুলে দেখলেন, পাত্রশূন্য, নিমাই-ই তা হলে সব নিঃশেষ করেছে। কিন্তু ক্ষণপরে বাহ্যবিরহে আবার তাঁর ভ্রান্তি হল। নিমাই তো নীলাচলে, সে এখানে এসে খায় কী করে? তবে বুঝি আমি কৃষ্ণের ভোগই লাগাই নি। অথচ পাকপাত্র অন্নব্যঞ্জনে ভরে আছে। দেখেও দেখছেন না মা। আবার স্থান সংস্কার করে ভোগ লাগালেন।

'মাকে বোলো,' প্রভু আরো বললেন দামোদরকে, 'তাঁর আজ্ঞাতেই আমি নীলাচলে আছি, আর তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমবলেই বারে বারে যাচ্ছি তাঁর কাছটিতে। আমার নাম করে তুমি তাঁকে দণ্ডবৎ কোরো আর বোলো, তাঁর নিমাই ভালো আছে।'

মাকে ও অন্যান্য বৈষ্ণবকে দেবার জন্যে জগন্নাথের প্রসাদ আনালেন আলাদা করে। দিয়ে দিলেন দামোদরের সঙ্গে। দামোদর নদীয়ায় ফিরে চলল।

নদীয়ায় ফিরে এসে শচীমাতাকে সব বললে দামোদর। প্রসাদ দিলে। প্রণাম দিলে। বললে, 'প্রভু আমাকে তোমার কাছে থাকতে বলেছেন, তোমাদের দেখাশোনা করতে—'

সন্ন্যাসী হয়েও নিমাই তাঁদের মঙ্গলচিন্তা করছে ভাবতে শচীমায়ের বুক স্নেহে-প্রেমে উথলে উঠল।

অদ্বৈত ও অন্যান্য বৈষ্ণবের সঙ্গেও দেখা করল দামোদর। প্রভুর পাঠানো প্রসাদ বিতরণ করল। সকলের প্রতি প্রভুর কী অপার করুণা ও স্নেহ, অনুভব করে সবাই অভিভূত হয়ে গেল।

কোনো মর্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করতে পারে না দামোদর, না কোনো স্বৈরাচার। যেখানে যেটুকু সে অবিধি দেখে, তিরস্কার করে, প্রয়োগ করে বাক্যদণ্ড। দামোদরের শাসনের ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত, সঙ্কুচিত, কারুরই আর অসঙ্গত বা অন্যায় কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই।

একদিন হরিদাসের সঙ্গে মিলিত হলেন প্রভু। বললেন, 'যারা

গো-ব্রাহ্মণ হিংসা করে সেই সব তুরাচার যবনদের কী ভাবে নিস্তার হবে? আমি তো কোনো পথ দেখি না।'

'ওদের নামাভাসে মুক্তি হবে।'

'নামাভাসে?'

'হ্যাঁ, অন্য সঙ্কেতে।' বললে হরিদাস, 'ওরা কথায় কথায় ঘৃণাচ্ছলে হারাম বলে—হারামের যাই অর্থ হোক, উচ্চারণে তাই হা-রাম হয়ে যায়। অর্থে যার ঘৃণা উচ্চারণে তার মহাপ্রেম। অজামিলের সেই ছেলের উদ্দেশে·নারায়ণ ডাকার মত। সঙ্কেত যাই হোক নামের তেজ নষ্ট হবার নয়।'

ভগবানের অসংখ্য নাম। তার প্রত্যেকটিরই অশেষ শক্তি। কথাপ্রসঙ্গে রসনায় যদি এসে পড়ে, তা হ'লেই হ'ল। উচ্চারণ নাই বা করলে, যদি কখনো মনে পড়ে বা শুনে ফেল আকস্মিক, তা হলেও যথেষ্ট। সে নাম শুদ্ধবর্ণই হোক বা অশুদ্ধবর্ণই হোক, কিছু আসে-যায় না। সেই নামের অক্ষর গুচ্ছীকৃতই থাক বা পরস্পর-বিচ্ছিন্নই থাক ফল সমান। নামের শেষাংশও যদি অনুচ্চারিত থাকে, তা হলেও কাজ হবে। নাম অঙ্গহীন বলে ফল অঙ্গহীন হবে না। এমনি নামের মহিমা। দেহ-সুখ, বিষয় বা প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যে যদি কেউ নাম ব্যবহার করে তা হলে সদ্য-সদ্য ফল পাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু দেরিতে পাবে। নামাপরাধের ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত ফল করায়ত্ত নয়। দেহবিত্তাদির উদ্দেশ্যে নামকীর্তন নামা-পরাধ। সে ক্ষেত্রেও ফল একেবারে অলভ্য নয়, দেরিতে লভ্য।

ধৃতরাষ্ট্রকে কী বলছে বিদুর? বলছে: 'অকপটে আসক্তচিত্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করো। তিনি পাবনেরও পাবন, উত্তমশ্লোকদের শিরোভূষণ। তাঁর নামভানুর আভাসমাত্র যদি অন্তরকুহরে প্রবেশ করে তা হলে মহাপাতকের অন্ধকারও নিমেষে দূরীভূত হয়।'

নামাভাসেই পাপক্ষয়, সংসারক্ষয়, সর্ববন্ধনবিমোচন।

'কিন্তু স্থাবরজঙ্গমের কী হবে?'

'যদিও তারা বাকশক্তিহীন, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা, তারাও উদ্ধার পাবে।' বললে হরিদাস, 'তুমি সরবে উচ্চকণ্ঠে যখন কৃষ্ণকীর্তন করেছ তখন জঙ্গম তা শুনতে পেয়েছে আর তাতেই তাদের মুক্তি। আর স্থাবরে তোমার ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠেছে, এ ঠিক প্রতিধ্বনি নয়, এ স্থাবরেরই নামকীর্তন। ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবন যাবার সময় তুমি কী ভাবে সকলকে দিয়ে হরিনাম করিয়েছ তা আমাকে বলভদ্র বলেছে।'

'কিন্তু হরিদাস, সব জীবই যদি মুক্তি পায় তা হলে ব্রহ্মাণ্ড তো শূন্য হয়ে যাবে।'

'তুমি যতদিন মর্ত্যলোকে আছ ততদিন স্থাবরজঙ্গম সমস্ত জীব উদ্ধার পেয়ে বৈকুণ্ঠে যাবে।' বললে হরিদাস, 'কিন্তু যারা এখনো ভোগযোগ্য স্থূলদেহ পায় নি, সূক্ষ্মরূপে কারণসমুদ্রে অবস্থান করছে, তাদের কর্মফল উদ্বুদ্ধ হবে আর তারাই এসে নিজ-নিজ কর্মানুসারে স্থাবরজঙ্গম রূপে আবির্ভূত হবে। তারাই আবার ভরে তুলবে পৃথিবী।'

প্রভু যেন ধরা পড়ে গেছেন এমনি ভাবে নীরব রইলেন।

'আগে যেমন ব্রজে অবতীর্ণ হয়ে কৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডজীবের সংসার খণ্ডন করেছেন তেমনি তুমিও নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীবাসী সমস্ত স্থাবরজঙ্গমের উদ্ধার সাধন করবে।'

হরিদাসকে প্রভু আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'তুমি এসব কথা যদি বিশ্বাসও করো, যেন বাইরে রাষ্ট্র করে বেড়িয়ো না।'

কিন্তু এ কী ? হরিদাসের দুয়ারে এ কে উপস্থিত ? সনাতন না ?

মথুরায় আর মন টিকছে না, প্রভুর জন্যে উতলা হয়ে যাত্রা করল পুরীর দিকে। গৌড়ের পথে গেল না, ঝারিখণ্ডের পথ নিলে। একেবারে একলা চলেছে সনাতন, একেবারে নিঃসহায়। অর্ধাশনে-অনশনে, চানা চিবিয়ে কখনো বা শুধু জল খেয়ে পথ ভাঙতে লাগল। ঝারিখণ্ডের জলের দোষে গায়ে চুলকুনি দেখা দিল।

ভাবল, আমি অত্যন্ত অপদার্থ, আমি কৃষ্ণ-ভজনের অযোগ্য। তাই আমার দেহে এ কুৎসিত ব্যাধি উপস্থিত হয়েছে। এ অশুচি শরীর নিয়ে কী করে প্রভুর মুখোমুখি হব? শুনেছি মন্দিরের নিকটেই তাঁর বাসা, সুতরাং মন্দিরে যেতেও আমার অধিকার নেই। যদি জগন্নাথের কোনো সেবকের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় তা হলে আমার পাপের বোঝা আরো ভারী হবে। সুতরাং এ দেহ আর রাখব না। আত্মহত্যা করব।

রথযাত্রার আর দেরি নেই। রথের দিনে প্রভুকে দেখব, জগন্নাথকে দেখব, আর তাঁদের চোখের সামনে রথের চাকার নিচে দেহ ছাড়ব। তাতেই আমার পরম পুরুষার্থ লাভ হবে।

সনাতন এসে হরিদাদকে প্রণাম করল।

'তুমি? সনাতন?'

'হ্যাঁ, আমি। প্রভু কোথায়?' কতক্ষণে প্রভুকে একটু দেখবে তারই আশায় অস্থির সনাতন।

'প্রভু মন্দিরে গিয়েছেন উপলভোগ দেখতে।' বললে হরিদাস, 'এখুনি ফিরবেন।'

বলতে-বলতে প্রভু আবির্ভূত হলেন।

সেই চিরপ্রত্যাশিত প্রিয়মূর্তি। সেই গোবিন্দ-গৌরাঙ্গ।

দর্শনমাত্রই হরিদাস ভূতলে প্রণত হল। সঙ্গে-সঙ্গে সনাতন।

প্রভু হরিদাসকে তুলে আলিঙ্গন করলেন। হরিদাস বললে, 'সনাতনও আপনাকে প্রণাম করছে।'

'সনাতন?' প্রভু চমকে উঠলেন। বাহু প্রসারিত করে অগ্রসর হলেন আলিঙ্গন করতে।

সনাতন পিছু হটল।

'না, না, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে ছুঁয়ো না। আমি নীচ অধম অস্পৃশ্য।' সনাতন কেঁদে উঠল: 'আমার সারা অঙ্গে খোসপাঁচড়া—'

প্রভু নিষেধ শুনলেন না। জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন। সনাতনের কণ্ডুক্লেদ তাঁর গায়ে লাগল।

সনাতন অপরাধীর মত ম্লান হয়ে রইল। কিন্তু প্রভুর মুখে সর্ব-পবিত্র-করা বদান্য হাসি।

ভক্তরা সবাই এসে পড়ল। হরিদাসের ঘরের দাওয়ায় সবাইকে নিয়ে বসলেন প্রভু। সকলের সঙ্গে হরিদাসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'মথুরাবাসী বৈষ্ণবদের সব কুশল তো?'

'সমস্ত কুশল।' বললে সনাতন, 'আর আমার পরমমঙ্গল তোমার ঐ শ্রীচরণে।'

'শ্রীরূপ এতদিন এখানে ছিলেন—প্রায় দশ মাস। দিন দশেক আগে গৌড়ে গিয়েছেন। তাঁর মুখে শুনলাম তোমার ভাই অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।' বললেন প্রভু, 'রঘুনাথে অনুপমের দৃঢ় ভক্তি ছিল।'

অনুপমের দেহত্যাগের কথা এই প্রথম শুনতে পেল সনাতন। কিন্তু শোকে কাতর হল না। যেহেতু প্রভু পরমস্নেহে তাঁর রাম-ভক্তির কথা উল্লেখ করলেন।

'বাল্যকাল থেকেই অনুপমের রামাসক্তি।' বলতে লাগল সনাতন, 'রামনামেই তার পরমস্পৃহা, রামায়ণগান নিজেও যেমন শোনে অন্যকেও তেমনি শোনাতে বলে। রামের ধ্যানে আর কীর্তনেই তার গভীর আবেশ। কিন্তু আমাদের, রূপ আর আমার ইচ্ছে, ও আমাদেরই মত কৃষ্ণভজন করুক। ওকে নিয়ে যাই কৃষ্ণকথার সভায়, পরমকৃষ্ণকথা ভাগবত শোনাই। একদিন আমরা ওকে স্পষ্ট বললাম, দেখ কৃষ্ণনামই পরমমধুর। একমাত্র কৃষ্ণেই সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম আর বিলাস অসীম হয়ে আছে। আমাদের দু'ভায়ের মত তুমিও কৃষ্ণকেই আশ্রয় করো। আমরা তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে দিন কাটাই।'

বার-বার করে বলাতে অনুপমের বুঝি মন টলল। বড় দু' ভাই

সমানে অনুরোধ করছে, কী করে প্রত্যাখ্যান করে? শেষ পর্যন্ত বললে, 'তোমাদের আদেশ কত আর লঙ্ঘন করব, দাও, দীক্ষামন্ত্র দাও, করব কৃষ্ণভজন।'

মুখে বলল বটে কিন্তু মন কিছুতেই রামের চিন্তা থেকে সরিয়ে নিতে পারল না। সারা রাত কেঁদে কাটাল, একবিন্দু ঘুম হল না। যার পায়ে একবার মাথা বেচেছি সে মাথা আর কোথাও রাখতে পারব না। বুক বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

সকালে অনুপম দাদাদের কাছে এসে দাঁড়াল। বললে, 'আমাকে ক্ষমা করুন। কৃপা করে আপনারা আমাকে রঘুনাথেরই চরণসেবা করতে দিন। পারলাম না, কিছুতেই রঘুনাথের পাদপদ্ম পারলাম না ছাড়তে। আপনারা আশীর্বাদ করুন, শুধু এই জন্ম নয়, জন্ম-জন্ম যেন রামভজনেই আমার জীবন যায়।'

আমরা তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, নিজের উপাস্যে তার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা আছে কি না দেখবার জন্যেই আমরা এই প্রস্তাব করেছিলাম। তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রামসেবা করে যাও।

'আমিও মুরারি গুপ্তকে এমনি একবার পরীক্ষা করেছিলাম।' বললেন প্রভু, 'যে ভক্ত স্বরূপ-বিরূপ কোনো অবস্থাতেই তার প্রভুকে, তার উপাস্যকে ত্যাগ করে না সেই ধন্য। আর যে প্রভু সগুণ-বিগুণ কোনো অবস্থাতেই তার ভক্তকে ছাড়ে না, দৈবদুর্বিপাকে ভক্ত বিচলিত হলেও যে প্রভু জোর করে তাকে টেনে নিয়ে আসে, ভক্ত বিচ্যুত হলেও যে নিজে অচ্যুত থাকেন, সে উপাস্য ও ধন্য।'

'সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে।'

হরিদাসের ঘরেই থেকে গেল সনাতন। প্রভু বললেন, 'আর

কথা কী! দু'জনে একসঙ্গে থাকো, কৃষ্ণনাম-আস্বাদ-সমুদ্রে স্নান করো সর্বক্ষণ।'

গোবিন্দই প্রসাদ নিয়ে আসে। সনাতন মন্দিরে যায় না, মন্দিরের চক্র দেখে দূর থেকে প্রণাম করে। হোক প্রসাদ, হোক প্রণাম, তবু দেহত্যাগের সঙ্কল্প ত্যাগ করে নি সনাতন। যে দেহ কণ্ডুতে কলুষিত সে দেহ অযোগ্য, অসার। রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেলেই সে দেহের সদ্‌গতি।

সহসা সেদিন প্রভু চলে এলেন হরিদাসের বাসায়। ডাকলেন সনাতনকে। বললেন, 'শোনো দেহত্যাগে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।'

সনাতন চমকে উঠল। অন্তর্যামী মনের গূঢ় বাসনাটি পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন।

'কৃষ্ণ পাওয়া যায় ভজনে। দেহত্যাগেই যদি কৃষ্ণ পাওয়া যেত, তবে আর ভাবনা কী ছিল, কোটি-কোটি লোক এক মুহূর্তেই আত্মহত্যা করত। কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি। দেহত্যাগে তমোধর্ম, আর তমোরজোধর্মে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। ভক্তি ছাড়া কৃষ্ণে প্রেম হয় না, আর প্রেম ছাড়া কৃষ্ণ কোথায়?'

কিন্তু রুক্মিণী যে অনশনে দেহপাত করতে চেয়েছিল, গোপীরাও যে উন্মুখ হয়েছিল আত্মহত্যায়—তার কী?

সে বাসনা কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যে নয়, কৃষ্ণবিরহযন্ত্রণা থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে। এমনই সে গাঢ়ানুরাগ, মরণ হয় না, কৃষ্ণ আকৃষ্ট হয়ে নিজে এসে দেখা দেন।

'তুমি নীচ জাতি কে বললে? শুধু যবনের সংস্রবে দীর্ঘকাল ছিলে বলে দৈন্যবশত নিজেকে নীচ বলছ। কিন্তু ভক্তের আবার জাতি কী? যে কৃষ্ণ ভজন করে সেই উচ্চ, সেই বৃহৎ। ভক্তিতে সবাই সমজাতি। আর যদি সত্যি দৈন্য ধরো, অভিমান থেকে মুক্ত হও, দেখবে তোমার প্রতিই ভগবানের বেশি দয়া।'

'যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥'

ভগবানের বেশি দয়া! তা কি এখুনি চোখের সামনে প্রতিমূর্ত নয়?

'ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি, আর সেই নয় অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।' বললেন প্রভু, 'নিরপরাধের নাম নিলেই প্রেমধন মিলে যাবে।'

তা হলেই বোঝা যাচ্ছে সনাতনের দেহত্যাগ প্রভুর মনঃপূত নয়।

আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু নেই। যৈছে নাচাও তৈছে নাচি।

কিন্তু জিজ্ঞেস করি, আমাকে বাঁচিয়ে রেখে তোমার কী লাভ হবে?

'যখন তুমি আমাতে আত্মসমর্পণ করেছ তখন তোমার দেহে তোমার আর কোনো স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই।' বললেন প্রভু, 'যা এখন পরের দ্রব্য তা তুমি নষ্ট করবে কোন অধিকারে? তোমার শরীরে আমার ভীষণ দরকার, অনেক প্রয়োজন সাধন করব একে দিয়ে।'

সনাতন হতবাক।

'মায়ের আদেশে আমি নীলাচলবাসী, অন্যত্র গিয়ে ধর্মশিক্ষা দেবার আমার সুযোগ নেই।' বললেন প্রভু, 'জানো তো আমার নিজ প্রিয়স্থান মথুরা আর বৃন্দাবন। আমার ইচ্ছে তোমরা দু'ভাই, রূপ আর তুমি, ব্রজভূমে থেকে সমস্ত লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করো। ভক্ত-ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সর্বতত্ত্বের নির্ধার করো, বৈষ্ণবের কৃত্য আর আচার শেখাও, শেখাও বৈরাগ্য, কৃষ্ণ-অনুরাগ। যে দেহ দিয়ে আমি এত সব কাজ করতে চাই তা তুমি ছাড়বে কোন হিসাবে?'

হরিদাসের দিকে তাকালেন: 'পরের কাছে যে ধন গচ্ছিত আছে তা সনাতন কী করে বিলিয়ে দেয়, কী করে খরচ করে? তুমি ওকে সাবধান করে দিও, আমার ধন যেন ও চুরি করে না পালায়।'

হরিদাস বললে, 'আমরাই সব করি এই অভিমান যে কত মিথ্যা, এই আবার বুঝলাম। সনাতন ঠাকুরও বুঝেছেন।'

সনাতন সহর্ষে বললে, 'কে নিয়ন্তা, কে তাকে নাচাচ্ছে কাঠের পুতুল তা জানে না। যেমন নাচাও তেমনি নাচে। যদি বলো বাঁচতে হবে, করতে হবে তোমার কাজ, রুগ্ন ভগ্ন দেহেও বেঁচে থাকব, পঙ্গু হাতেও তোমার কাজ সম্পূর্ণ করে যাব। তুমিই হৃদয়ে প্রেরণা দেবে, বাহুতে বহুবল, তুমি সৃষ্টি করবে সাধনের অনুকূল পরিবেশ।'

৬৭

'তোমার ভাগ্য অপরিসীম।' সনাতনকে বললে হরিদাস, 'তোমার দেহকে প্রভু তাঁর নিজধন বলেছেন। নিজদেহে মথুরা-মণ্ডলে যে কাজ করতে পারছেন না তাই তোমাকে দিয়ে করাচ্ছেন। বরং আমার দেহই বৃথা গেল। ভারতবর্ষে জন্ম নিলাম অথচ কারু উপকার করতে পারলাম না।'

পরোপকারই ভারতবর্ষের ধর্ম। কী বলছেন প্রভু?

'ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥'

শ্রীকৃষ্ণও বলছেন ব্রজবালকদের, 'প্রাণ অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরহিতাচরণই দেহীদের জন্মের সাফল্য। সর্বপ্রাণীর উপজীব্য-স্বরূপ বৃক্ষের দিকে চেয়ে দেখ। যাচক কখনো এর কাছ থেকে

বিমুখ হয়ে ফিরে যায় না। পত্র পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল অস্থি গন্ধ নির্যাস ভস্ম সমস্ত কিছু দিয়ে সে প্রাণীর উপকার করে।'

'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই।' বললে সনাতন, 'তুমি যে পরোপকার করছ তা অতুলনীয়। প্রভুর অবতারের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে নামপ্রচার। তুমি প্রত্যহ তিন লক্ষ নামকীর্তন করছ, যে শুনছে তারই সংসার-বীজ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ভারতভূমিতে তোমার জন্মই সার্থকতম। তুমি তো শুধু প্রচার কর না তুমি আচরণ কর, তাই তুমিই সকলের গুরু।'

'আচার-প্রচার-নামের কর তুই কার্য।
তুমি সর্বগুরু সর্বজগতের আচার্য॥'

প্রভু যমেশ্বরটোটায় আছেন, পুরীতে খবর পাঠালেন সনাতন যেন মধ্যাহ্ন-ভিক্ষার সময় আসে।

সনাতন আছে হরিদাসের সঙ্গে, সিদ্ধবকুলের স্থানে। প্রভুর ডাক পেয়ে তক্ষুনি সে বেরিয়ে পড়ল।

সিদ্ধবকুল হতে যমেশ্বর যাবার তু'টো রাস্তা। একটি মন্দিরের সিংহদ্বার পেরিয়ে শহরের রাজপথ দিয়ে, অন্যটি সমুদ্রতীর ধরে। প্রথম পথটাই অপেক্ষাকৃত সহজ ও অকষ্টসাধ্য।

দ্বিতীয় পথটা দীর্ঘ, নির্জন, বালুকাপূর্ণ। জ্যৈষ্ঠের বেলা, তবু সনাতন দ্বিতীয় পথই নির্বাচন করল। গাছ-গাছালি নেই, প্রাচীরের অন্তরাল নেই, ছায়ার তন্তুমাত্র সম্ভাবনা নেই, তবু এই রুক্ষ তপ্ত পথেই যাত্রা করল সনাতন। কিন্তু প্রভু ডেকেছেন এই আনন্দে সে এত ভরপূর যে তপ্ত বালিতে তার পা পুড়ছে এ তার খেয়াল নেই। প্রভু-তন্ময়তায় তপ্ত বালিও সুখস্পর্শ হয়ে উঠেছে। তু'পায়ে ফোস্কা পড়েছে—তা পড়ুক।

ভিক্ষাশেষে প্রভু বিশ্রাম করছেন সনাতন এসে পৌঁছুল। ভিক্ষাবশেষ গোবিন্দ নিয়ে এল তার জন্যে। সনাতন প্রসাদ পেল।

প্রসাদান্তে প্রভুর কাছে এলে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'সনাতন, কোন্ পথে এলে ?'

'সমুদ্রতীরের পথ দিয়ে এসেছি।'

'সে কি, সিংহদ্বারের পথ দিয়ে এলে না কেন ? সিংহদ্বারের পথ ঠাণ্ডা, আর সমুদ্রতীরের পথ তপ্তবালিতে দুঃসহ।' প্রভু কাতরমুখে বললেন, 'তোমার পায়ে ফোস্কা পড়ে গিয়েছে, তুমি হাঁটলে কী করে ?'

'পায়ের ফোস্কা টের পাই নি। তা ছাড়া', সনাতন অপরাধীর মত বললে, 'তা ছাড়া সিংহদ্বারের পথে যাবার আমার অধিকার নেই। সে পথে জগন্নাথের কত সেবক যাতায়াত করছে, যদি অতর্কিতে কারু সঙ্গে আমার গাত্রস্পর্শ হয়ে যায় তা হলে আমার অপরাধের শেষ থাকবে না। আমার স্পর্শে দেবসেবার কাজ অপবিত্র হবে এ আমার কাছে অসহ্য।'

সনাতনের দৈন্য ও মর্যাদাবোধ দেখে প্রভু তুষ্ট হলেন। বললেন, 'তুমি অপবিত্র এ তোমাকে কে বলল ? তুমি জগৎ-পাবন, তোমার স্পর্শে মুনি-ঋষিরা পবিত্র হয়। তবু সম্মানীকে উপযুক্ত মর্যাদা করাই ভক্তের স্বভাব। এই মর্যাদা-পালনই সাধুর অলঙ্কার। অভিমানীরাই অন্যের মর্যাদারক্ষণে অনিচ্ছুক। তোমার অন্তরে অভিমানের লেশ নেই, তাই তোমার ঐ ভক্তের ব্যবহার—তোমার মত এমনটি আর কোথায় ?'

সনাতনকে আলিঙ্গন করলেন প্রভু। তার কণ্ডুরস প্রভুর গায়ে লাগল।

কত নিষেধ করছে, তবু প্রভু শোনেন না। ক্ষোভে লজ্জায় শীর্ণ ও মলিন হল সনাতন।

পরে একদিন জগদানন্দকে সে তার দুঃখের কথা জানাল। বললে, 'প্রভুকে দর্শন করে নিজের দুঃখ খণ্ডাতে এলাম নীলাচলে, কিন্তু মনে যা বাসনা ছিল তা প্রভু পূর্ণ করতে দিলেন না। দিলেন না রথের চাকায় দেহত্যাগ করতে। অথচ তাঁর অঙ্গস্পর্শ করে

কত যে অপরাধ হচ্ছে তার কূলকিনারা নেই। হিতের জন্যে এলাম, বিপরীত হয়ে গেল। কী করি বলতে পারো?’

জগদানন্দ বললে, ‘তুমি নীলাচল ত্যাগ করো। বৃন্দাবনই তোমার উপযুক্ত বাসস্থান, রথযাত্রার পর তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও।’

সনাতন আশ্বস্ত হল। ‘ঠিক বলেছ। বৃন্দাবনই আমার প্রভুদত্ত দেশ, আমি নীলাচল ছেড়ে সেখানে গিয়েই বাস করব।’

হরিদাসের স্থানে প্রভুকে দেখে স্পর্শভয়ে সনাতন পিছু হটে যাচ্ছিল প্রভু জোর করে সনাতনকে আলিঙ্গন করে ধরলেন।

সনাতন বললে, ‘প্রভু, আমার দোষ আর বাড়িও না। আমি এমনিতেই নীচ, তাই এখন এই বীভৎস রোগে ভুগছি। তোমার অবশ্য ঘৃণালেশ নেই কিন্তু আমি তো বুঝি কণ্ডুর রসে-রক্তে তোমার পবিত্র গাত্র কলুষিত করে আমি কী ঘোর অপরাধ করছি। তাই, আজ্ঞা করুন, রথ দেখে আমি বৃন্দাবনে চলে যাই। জগদানন্দ পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারও সেই মত।’

‘কালকের ছাত্র জগা, তার কি-না এত অহঙ্কার তোমাকে উপদেশ করে!’ রুষ্ট হলেন প্রভু, বললেন, ‘সর্বব্যাপারে তুমি তার গুরুতুল্য, ওর নিজের দৌড় কতদূর তা বুঝি ওর খেয়াল নেই? তুমি আমার উপদেষ্টা, তুমি প্রামাণিক, তুমি মাননীয় জন, তোমার মূল্য ও কী বুঝবে? ও নিতান্ত অর্বাচীন।’

‘জগদানন্দের কী ভাগ্য!’ সনাতন বললে, ‘আপনি তাকে তিরস্কার করছেন। যে আপনার জন তাকেই তো লোকে তর্জন-তাড়ন করে। আর আমি আপনার অনাত্মীয়। তাই তো আমাকে আপনি গৌরবস্তুতি করছেন। আপনার ভর্ৎসনা মধুর আর প্রশংসা তিক্তের চেয়েও তিক্ত। আমার মত হতভাগা আর কে আছে? আমি আপনার আত্মীয়তা পেলাম না।’

প্রভু বুঝি একটু লজ্জিত হলেন। বললেন, ‘তোমার চেয়ে জগদানন্দ আমার কাছে বেশি প্রিয় নয়, তবে জানো তো আমি

মর্যাদা লঙ্ঘন সহ্য করতে পারি না, সে কেন তোমাকে উপদেশ করতে যাবে? তোমাকে যে আমি প্রশংসা করি তা বহিরঙ্গবুদ্ধিতে নয়, তোমাকে বাইরের লোক মনে করে নয়, তোমার এত গুণ, তোমাকে স্তুতি না করে থাকা যায় না। বহু লোকের প্রতি প্রীতি থাকলেও প্রীতি সর্বক্ষেত্রে সমান নয়। রূপে ও প্রকৃতিতে ও মাত্রায় তাতে তারতম্য থাকা সম্ভব। তোমার দেহ তোমার কাছে বীভৎস কিন্তু আমার কাছে অমৃততুল্য। তোমার দেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময়, অথচ বুদ্ধিদোষে তুমি তা প্রাকৃত মনে করছ। আর, যদি তা প্রাকৃতও হয়, তা হলেও তাকে উপেক্ষা করা চলে না। জ্ঞানযোগীর কাছে আবার ভালো-মন্দ কী, ভদ্রাভদ্র কী! তার কাছে সমস্তই ব্রহ্ম।' 'ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে।'

ভক্তিযোগের চোখে দেখতে গেলে তোমার দেহ চিন্ময় জ্ঞান-যোগের চোখে দেখতে গেলেও তা পবিত্র-অপবিত্রের বাইরে এবং সেই অর্থে অপ্রাকৃত। সুতরাং যে দিক থেকেই দেখ, তোমার দেহ অশ্লাঘ্য নয়, কদর্য নয়, বর্জনীয় নয়।

জ্ঞানযোগের কথা বলছেন প্রভু।

অবস্তুর আবার দ্বৈত কী? ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু আর সমস্তই অসার। পদার্থই যখন মিথ্যে তখন তার সম্বন্ধে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানও মিথ্যে। যে জ্ঞানবাদী সে তো সমদর্শী, সে ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক দেখে, গরু হাতি কুকুরেও কোনো বৈষম্য নেই। লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনও তার কাছে সমান। সমদর্শীই জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা।

'শোনো সনাতন, আমি তো সন্ন্যাসী,' বললেন প্রভু, 'আমার ধর্মও সমদর্শন। চন্দনে ও পঙ্কে আমার সমবুদ্ধি। তাই তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারি না। তোমাকে ত্যাগ করলে আমার নিজ ধর্ম, সন্ন্যাসধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়।'

হরিদাস বললে, 'প্রভু, এ তোমার পরিহাস। তোমার প্রতারণা। জ্ঞানযোগের কথা বাজে কথা। আমি আসল কথাটি জানি।'

'সে আবার কোন কথা ?' প্রভু হরিদাসের দিকে তাকালেন।

'আসল কথা হচ্ছে, আমরা অধম আমরা পতিত আর তুমি দীনের প্রতি পতিতের প্রতি স্বভাবদয়ালু।' বললে হরিদাস, 'তুমি তোমার দীনদয়ালগুণে আমাদের অঙ্গীকার করে নিয়েছ। ঘৃণ্য জেনেও স্থান দিয়েছ পাদপদ্মে।'

'না, তা নয়।' বললেন প্রভু, 'তোমাদের আমি লাল্য মনে করি, আর নিজেকে মনে করি লালনকর্তা। মা যেমন সন্তানের ক্লেদমালিন্য ধুয়ে-মুছে দেন, তেমনি। মার মধ্যে কি ঘৃণা থাকে না দোষজ্ঞান থাকে ? মার মধ্যে যে ভাব তাকে তুমি শুদ্ধ দয়াও বলতে পারো না। মার মধ্যে শুধু স্নেহসুখ, শুধু প্রীতিময়ী পরিচর্যা। সনাতনের প্রতিও আমার সেই মাতৃস্নেহ। শিশু সন্তানের গায়ে যদি কণ্ডুরস থাকে মা কি তাকে কোলে নেয় না, না কি কোলে নিতে তার ঘৃণা হয় ? আমার তো মনে হয় ক্লিন্ন বলেই মার সন্তানকে কোলে নিতে বেশি আনন্দ।'

> 'তোমাকে 'লাল্য' মানি আপনাকে 'লালক' অভিমান।
> লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান ॥
> মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
> ঘৃণা নাহি উপজয়, আরো সুখ পায় ॥
> লাল্যামেধ্য লালকে চন্দনসম ভায়।
> সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায় ॥"

'সে তো একবার বাসুদেবের বেলায় দেখেছি।' বললে হরিদাস, 'তার গলিতকুষ্ঠে কীট পর্যন্ত জন্মেছিল। তোমার আলিঙ্গনে সে কীটমুক্ত কুষ্ঠমুক্ত হয়ে গেল। কন্দর্পের কান্তি জাগল শরীরে। কৃপার তরঙ্গ, তোমার সে আলিঙ্গনের মহিমা কে বুঝতে পারে ?'

'বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত নয়।' বললেন প্রভু, 'বৈষ্ণবদেহ চিদানন্দময়। দীক্ষাকালে ভক্ত যেই কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করল, অমনি সে কৃষ্ণের আত্মসম হয়ে উঠল। ভগবানে সমর্পিত ভক্তদেহ তাই চিন্ময়ত্ব অর্জন

করল। তাই সনাতন, তোমার দেহ নিত্যপবিত্র, তোমাকে আলিঙ্গন করে আমি নিত্যতৃপ্ত নিত্যসুখী।'

বলে আরেকবার আলিঙ্গন করলেন। আর তখুনি সকলে দেখল, সনাতনের শরীরে আর কণ্ডু নেই, সর্ব অঙ্গ মসৃণ সোনার মত ঝলমল করে উঠেছে।

'এই তোমার ভঙ্গি!' উল্লসিত হয়ে উঠল হরিদাস : 'ঝাড়িখণ্ডের জল খাইয়ে সনাতনের দেহে কণ্ডু করালে, তারপর তাকে পরীক্ষা করলে যন্ত্রণায় পড়ে ভগবানে দোষ দেয় কিনা, কর্তব্যে বিমুখ হয় কিনা, পরে নিজেই আবার ব্যাধির নিরাকরণ করলে। তোমার এ লীলারহস্য কে দেখে কে বোঝে।'

'এ বৎসরের শেষে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাব।' সনাতনকে আশ্বস্ত করে বিদায় হলেন প্রভু।

রথযাত্রা হয়ে গেল। গৌড়ীয় ভক্ত যারা এসেছিল বেণু-শিঙা খোল করতাল নিয়ে, ফিরে গেল বাঙলায়। দোলযাত্রার শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করল সনাতন। তারপর যাত্রা করল।

প্রভু যে পথে গেছেন সনাতন সেই পথ ধরল। কোন গ্রামে কোন নদীতে কোন পাহাড়ে প্রভুর কী কী লীলা হয়েছে বলভদ্র ভট্টাচার্যের কাছ থেকে সব জেনে নিল। সেই সব দেখতে দেখতে প্রেমাবেশে পৌঁছুল বৃন্দাবন।

ওদিকে রূপও নিশ্চিন্ত হল। যা বিষয়-সম্পত্তি ছিল কুটুম্ব ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে বণ্টন করে দিল। মনের যত-কিছু গোপন কথা বা ইচ্ছা ছিল তা-ও উগরে দিয়ে এল। কিছুই আর লুকোবার নেই, চিন্তিত করবার নেই। অন্তরে-বাহিরে ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেল।

সে-ও এসে মিলল সনাতনের সঙ্গে।

লুপ্ত তীর্থ প্রকট করবার কাজে লেগে গেল দু'জনে। লেগে গেল বিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়। কৃষ্ণসেবা কৃষ্ণনাম-প্রচারে।

তাদের ভাইপো, বল্লভের ছেলে শ্রীজীবও গৌড় থেকে চলে এল বৃন্দাবন।

রাসকেলিতে প্রভুকে প্রথম দেখে শ্রীজীব। তার অনেক দিন পর একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখে কৃষ্ণ-বলরাম এসেছে। আবার কতক্ষণ পরে দেখে, কৃষ্ণ-বলরাম কোথায়, এ যে গৌর-নিতাই। যুগলমূর্তির পায়ে শ্রীজীব লুটিয়ে পড়ল। দু'জনেই তার মাথায় পা রাখলেন। প্রভু বললেন, তোমাকে নিত্যানন্দের চরণে সমর্পণ করে দিচ্ছি। নিত্যানন্দ বললেন, আমার প্রভুকে দেখ। প্রভুই তোমার সর্বস্ব হোক।

ঘুম ভাঙতেই শ্রীজীব দেখল রাত্রি আর নেই। অধ্যয়নের ছলে সে নবদ্বীপ ছুটল। শ্রীবাস-অঙ্গনে দেখা পেল নিত্যানন্দের। নিত্যানন্দ বললে, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতেই খড়দহ থেকে এখানে এসেছি। বলতে এসেছি, তুমিও বৃন্দাবনে যাও। তোমাদের বংশের সকলেরই বৃন্দাবন-বাস নির্ধারিত হয়েছে।'

'আপনি আমাকে কৃপা করুন।'

নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া ব্রজবাসের ফল মিলবে না। নিত্যানন্দই মূল ভক্ত-তত্ত্ব, তার কৃপা হলেই ভক্তির কৃপা হবে। আর ভক্তির কৃপা না হলে কিসের রাধাকৃষ্ণের করুণা!

তাই 'নিতাইয়ের করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে।'

আবার ঐ তিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রঘুনাথ দাস।

অতি প্রসিদ্ধ ধর্ম সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হলেও কিছু নয় যদি না হরিকথায় রতি হয়! যদি নামানন্দের পথই না উন্মুক্ত হয় তা হলে ধর্মানুষ্ঠানও বৃথা শ্রম।

দৈন্যার্ণবে শ্রীচৈতন্য আমার মহাবৈদ্য। আমি বৈগুণ্যকীটকলিত, আমি পৈশুন্যব্রণপীড়িত, আমি ভক্তিহীন দীন-দরিদ্র, আমি কোথায় যাব? আমার কে আছে? আমি শুধু দীনবন্ধু শ্রীচৈতন্যে শরণ নিলাম।

প্রভুর কাছে কৃষ্ণকথা শুনতে এসেছে প্রদ্যুম্ন মিশ্র, নীলাচলের এক ব্রাহ্মণ। প্রভু বললেন, 'রামানন্দ রায়ের কাছ থেকেই আমার কৃষ্ণকথা শোনা। তুমি তার কাছে যাও। সেই তোমাকে তৃপ্ত করবে।'

রামানন্দের বাড়ি গিয়ে রামানন্দের দেখা পেল না প্রদ্যুম্ন। চাকর বললে, নিভৃত উদ্যানে দু'জন সুন্দরী যুবতী দেবদাসীকে রামানন্দ অভিনয় শিক্ষা দিচ্ছে। নিজের হাতেই স্নান-মার্জন করে সাজসজ্জা পরিয়ে দিচ্ছে। নিজের লেখা নাটক, নাম জগন্নাথবল্লভ, তাই এত সূক্ষ্ম মনোযোগ! তাই নিজের হাতে সমস্ত নিখুঁত করার চেষ্টা।

'স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র-সম্মার্জন॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্বাঙ্গ-মণ্ডন।
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন॥'

প্রদ্যুম্ন বিরক্ত হয়ে ফিরে এল প্রভুর কাছে। রামানন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করল। এই আপনার রামানন্দ? এমন লোক কৃষ্ণকথার অধিকারী?

'হ্যাঁ, সেই প্রকৃত অধিকারী!' বললেন প্রভু, 'চিত্তচাঞ্চল্যের এত কারণ থাকা সত্ত্বেও রামানন্দ বিকারশূন্য।'

'নির্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন॥'

ব্রজেন্দ্রনন্দনকৃষ্ণ ব্রজগোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করছেন। যে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সেই লীলাকথা শোনে ও বর্ণনা করে তার মধ্যে সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণের বিকার আর থাকে না। চিত্তের যত দুর্বাসনা সব ঐ তিনগুণের বিকার থেকে। গুণবিকার লোপ পেলে দুর্বাসনারও নিরসন হয়। দুর্বাসনা গেলেই ভক্তি জাগে। শ্রবণে কীর্তনে সে ভক্তি প্রেম-মাধুর্যে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

'ব্রজবধূসঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদিবিলাস
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বলমধুর প্রেম ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্যে বিহরে সদায়॥'

'রামানন্দের ভজন রাগমার্গে।' বললেন প্রভু, 'তার দেহ সিদ্ধদেহ, তার মন অপ্রাকৃত। সেই তো ঠিক-ঠিক বলবে কৃষ্ণকথা। যাও, তার কাছেই ফিরে যাও। বোলো আমি তোমাকে পাঠিয়েছি।'

প্রত্যুম্ন ফিরে গেল রামানন্দের কাছে। বললে, 'আপনার কাছে কৃষ্ণকথা শোনবার জন্যে প্রভু আমাকে পাঠিয়েছেন।'

শুনে রামানন্দের প্রেমাবেশ হল। সুরু করল কৃষ্ণকথা। রসামৃতসিন্ধুতে মিশ্রকে নিয়ে ডুবল রামানন্দ। দিনের অন্ত হয়ে যায় কিন্তু কথার অন্ত হয় না।

'শোনো, তোমাকে আসল রহস্যটা বলি।'

'কী?'

'আমার মুখে যত কৃষ্ণকথা শুনছ তার বক্তা কিন্তু আমি নই, তার বক্তা গৌরচন্দ্র। যেমন বলাচ্ছেন তেমনি বলছি।'

সেই কথাই প্রভুর কাছে নিবেদন করল মিশ্র।

'কেমন দেখলে রামানন্দকে?'

'মূর্তিমান কৃষ্ণপ্রেম।'

'কেমন শুনলে?'

'অপূর্ব। কিন্তু উনি বললেন, সবই আপনার কথা। উনি বীণা, আপনিই বীণকার।'

'রামানন্দ বিনয়ের খনি।' বললেন প্রভু, 'মহানুভবদের রীতিই এই, নিজের গুণলেশও তারা প্রচার করে না।'

রামানন্দ শূদ্র আর প্রদ্যুম্ন মিশ্র ব্রাহ্মণ। শূদ্রদ্বারে পাঠালেন ব্রাহ্মণকে, তার বর্ণাভিমান চূর্ণ করতে। ভক্তি-সম্পত্তি ব্রাহ্মণেরই একচেটে নয়, শূদ্র যদি ভক্ত হয় তা হলে তার থেকে পাঠ নিতে ব্রাহ্মণের কেন অভিমান থাকবে? গৃহস্থ যদি ভক্ত হয় তবে সন্ন্যাসী-পণ্ডিতও বা কেন কৃষ্ণকথার জন্যে তার শরণ নেবে না? কৃষ্ণকথাবেত্তা যবন হরিদাস কার না গুরু হবার যোগ্য?

'সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে সর্বনাশ।
নীচশূদ্রদ্বারে করে ধর্মের প্রকাশ॥'

বাঙলা দেশ থেকে এক পণ্ডিত এসেছে প্রভুকে স্বরচিত কবিতা শোনাতে। কবিতায় কী আছে? গৌরচন্দ্রের মহিমাবর্ণনা আছে। তবে পড়ো শুনি। ভক্তরা শুনে প্রশংসা করল, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু এ প্রশংসায় কবির মন উঠল না। স্বয়ং প্রভু যদি প্রশংসা করতেন।

ভগবান আচার্যের সঙ্গে চেনা ছিল, কবি তাকে গিয়ে ধরল।

ভগবান বললে, 'দাঁড়াও আগে স্বরূপ দামোদরকে শোনাও। সে যদি অনুমতি করে তবেই প্রভু শুনতে সম্মত হবেন। রসাভাব বা শাস্ত্রবিরোধ সহ্য করতে পারেন না প্রভু, তাই পূর্বাহ্ণেই রচনা যাচাই করে নেওয়া দরকার। স্বরূপের মত রসদক্ষ আর কে আছে? তাকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, প্রভু চান না সে মর্যাদার ব্যতিক্রম হয়।'

স্বরূপের কাছে গিয়ে সুপারিশ করল ভগবান।

'আমি শুনেছি। খুব সুন্দর হয়েছে।'

'তুমি তো সারল্যের অবতার, যা শোনো তাই তোমার কাছে সুন্দর। কিন্তু ব্যাকরণ জানে না, অলঙ্কার বোঝে না, রসবিচারে যার নৈপুণ্য নেই, সে কৃষ্ণলীলা লিখবে কী?' স্বরূপ বিরক্ত হল: চৈতন্যলীলা তো আরো দুরূহ। আর শুধু শাস্ত্রে-ব্যাকরণে অভিজ্ঞতা থাকলেই চলে না, ভগবৎকৃপার প্রয়োজন। যে গৌরগতচিত্ত, গৌরপাদপদ্ম যার প্রিয়ধন, শুধু সেই কৃষ্ণলীলাবর্ণনে সমর্থ।'

'কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণধন ॥'

'সবই ঠিক। তবু তুমি একবার শুনে দেখ না—'

আরো অনেকে অনুরোধ করতে স্বরূপ রাজি হল।

বঙ্গকবি পড়তে সুরু করল। প্রথমে নান্দীশ্লোক।

'বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥'

'অর্থ বলো।'

কবি অর্থ বললে: 'স্বভাবজড় অসংখ্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করবার জন্যে যে স্বর্ণবর্ণকান্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রফুল্লকমলনয়ন জগন্নাথের দেহে ইহলোকে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করুন।'

'তার মানে জগন্নাথ দেহ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আত্মা?' স্বরূপ দামোদর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল: 'তার মানে জগন্নাথ থেকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথক? ঈশ্বরে তুমি দেহ-দেহী ভেদ করলে? ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেহ দুই-ই চিদ্‌ঘন বস্তু। স্বরূপ বা আত্মাও চিদানন্দময়, দেহ বা বিগ্রহও চিদানন্দময়। যিনি পূর্ণানন্দ ষড়ৈশ্বর্য স্বয়ং ভগবান সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তুমি ক্ষুদ্র এক দেহধারী জীব বানালে?'

দামোদরের বিচারে সকলে চমৎকৃত হল। কী করে যে তারা কবির প্রশংসা করেছিল, তাই ভেবে লজ্জায় মিশে গেল মাটির সঙ্গে। আর বঙ্গকবি অধোমুখে কাঁদতে বসল। ছি ছি, কী পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিয়ে কৃষ্ণকথা বলতে বসেছি!

দামোদরের দয়া হল। বললে, 'কোনো বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়ো। চৈতন্যচরণে শরণ নাও। ভক্তসঙ্গ করো।

তা হলেই কৃষ্ণলীলা নির্মল করে বর্ণনা করতে পারবে। তবে অন্য ভাবে তোমার শ্লোকের একটা নির্দোষ ব্যাখ্যা হতে পারে।'

'কী ?' বঙ্গকবি উৎসুক হল।

'কৃষ্ণ এক অদ্বয় তত্ত্ব—স্থাবর-ব্রহ্ম জগন্নাথ আর জঙ্গম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই দুই রূপে সংসারাসক্ত জড়বুদ্ধি জীবকে ত্রাণ করছেন।' বিশদ হল দামোদর : 'শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে এক তত্ত্ব, কিন্তু রূপে দুই। এক গতিশীল গৌরাঙ্গ আর এক স্থিতিশীল বিগ্রহ বা জগন্নাথ। গৌরাঙ্গ নীলাচলের বাইরে দেশে-দেশে গিয়ে বাইরে জঙ্গম-ব্রহ্ম হয়ে ত্রাণ করলেন আর যারা নীলাচলে এল তারা উদ্ধার পেল জগন্নাথদর্শনে। যাই হোক, নিন্দাচ্ছলে কৃষ্ণনাম করলেই যেখানে ভবক্ষয়, সেখানে তোমার অর্থও তোমাকে মুক্তি এনে দেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

'কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥'

৬৮

বাহ্যিক বৈরাগ্য ছেড়ে অনাসক্তভাবে সংসার করছে রঘুনাথ। শান্তিপুরে যখন মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হয়, মহাপ্রভু বলে দিয়েছিলেন মর্কট বৈরাগ্য ছেড়ে নির্লিপ্ত হয়ে বিষয় ভোগ করো। বাইরে এমন কোনো আড়ম্বর দেখাবে না যে লোকে বুঝতে পারে ভিতরে তোমার বৈরাগ্য জন্মেছে। লোক দেখানো বৈরাগ্যই মর্কট বৈরাগ্য। আর, বিষয়ী হয়ো না, 'বিষয়ীর মতন' হয়ো। অর্থাৎ বিষয়ে চোখ রাখো, মন রেখো না। মন শুধু চৈতন্যচরণে।

রঘুনাথের বাবা গোবর্ধন দাস, জেঠা হিরণ্য দাস। বিস্তীর্ণ

সপ্তগ্রাম-মুলুকের জমিদার। নবাবের ঘরে বিপুল রাজস্ব দিয়ে বিরাট উপস্বত্ব ভোগ করছে। আর তাদের দানধ্যান পুণ্যকর্মই বা কত। যে ব্রাহ্মণ তাদের দান পায় নি, মুলুকে প্রবাদ, সে ব্রাহ্মণই নয়। বিষয় যদি না বাড়ে তবে দানই বা বড় হয় কী করে?

সেই বিষয়ীদের ছেলে রঘুনাথ আবার বিষয়কর্মে মন দিয়েছে, তাতে মা বাপ সকলেই খুব খুশি।

ধনী হলেই তার শত্রু থাকবে। এক মুসলমান চৌধুরীর চোখ টাটাল। মুলুক থেকে আদায় বিশ লাখ, বারো লাখ রাজস্ব দিয়ে নীট আট লাখ ঘরে তোলে হিরণ্য-গোবর্ধন—দু' দু'টো হিন্দু—চৌধুরী জ্বলতে পুড়তে লাগল। নবাবের ঘরে গিয়ে নালিশ জানাল। কোনো কিছু খবর রাখেন? মুলুকের আদায় এখন বিশ লাখের অনেক বেশি। কিন্তু রাজস্ব সেই বারো লাখই আছে। আদায় যদি বেড়ে যায় তা হলে রাজার প্রাপ্য রাজস্বও কি বাড়বে না?

ঠিকই তো। তলব করো হিরণ্য-গোবর্ধনকে। ফরমান দিল নবাব।

'রাজাকে কম দিয়ে নিজেরা বেশি খাচ্ছ এ কেমনতরো কথা?' চোখ কষায়িত করল নবাব: 'রাজস্ব দ্বিগুণ করতে হবে।'

এ জুলুম, এ জবরদস্তি। হিরণ্য-গোবর্ধন মানল না ফরমান।

কুমিরের সঙ্গে বাদ করে জলে বাস করা অসম্ভব।

হিরণ্য-গোবর্ধনের জমিদারি নবাব বাজেয়াপ্ত করল আর দু' ভাইকে ধরে নিয়ে এসে জেলে পোরবার হুকুম দিলে।

নবাবের সৈন্য তাদের বাড়ি ঘিরল। কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। দু' ভাই আগে-ভাগেই সরে পড়েছে।

'তবে ছেলেটাকে ধরো।'

হিরণ্য-গোবর্ধনকে না পেয়ে রঘুনাথকে বেঁধে নিয়ে চলল।

'বল তোর বাপ জেঠা কোথায়?' উজির হুমকে উঠল।

'তার আমি কী জানি।' নির্ভীক রঘুনাথ দাঁড়াল মুখোমুখি।

'কোথায় গেলে তাদের ঠিকানা পাওয়া যাবে ?'

'তার আমি কী জানি ?'

আমি শুধু জানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণ।

তর্জনে গর্জনে হবে না, উজির উৎপীড়নের ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছে তার আবার ভয় কী।

না, শুধু কথায় কাজ হবে না, সরাসরি প্রহার দরকার। প্রহারই বশীকরণের একমাত্র ওষুধ। মার খেলেই ছেলেটা অন্ধিসন্ধি সব বলে দেবে।

কিন্তু ছেলেটার মুখে কী জানি কী আছে, মারতে হাত ওঠে না। কেন কে জানে মনের মধ্যে কে ডাক দেয়, মারলে ভালো হবে না পরিণাম।

আর ছেলেটার কী মিষ্টি কথা! কী বিনয়নম্রতা! কণ্ঠস্বরেই মনের কাঠিন্য গলে যায়।

'কেন অপ্রতুল হচ্ছেন? বিষয় তো অতি সামান্য, এ তো নির্বিবাদেই মীমাংসা করে নেওয়া চলে।' অধিপতিকে রঘুনাথ বললে মধুস্বরে, 'আমার বাপ-জেঠা আপনারই ভায়ের মত। ভায়ে-ভায়ে সব জায়গায়ই ঝগড়া হয়, আবার মিটমাট হয়ে যায়। আমি যেমন আমার বাবার ছেলে তেমনি আপনারও ছেলে। আমার বাবা যদি আমার আবদার রাখেন, আপনিও বা রাখবেন না কেন?'

অধিপতির মন আর্দ্র হল। ছেড়ে দিল রঘুনাথকে।

বাপ-জেঠাকে নবাবের কাছে নিয়ে এল রঘুনাথ। কিছু রাজস্ব বেশি নাও আর জমিদারি ফেরৎ দাও।

মীমাংসা এত সহজ ছিল তা কে জানত। হিরণ্য-গোবর্ধন আবার তাদের পুরোনো স্বত্বে অধিষ্ঠিত হল।

কিন্তু এ কী উৎপাত!

রঘুনাথের প্রতি বাড়ির সকলের স্নেহমমতা প্রবলতর হয়ে উঠল।

সন্দেহ কী, রঘুনাথের জন্যেই নবাবের রোষ নিবারিত হয়েছে, ফিরে এসেছে তালুক-মুলুক।

সংসারের সোনার শিকল রঘুনাথের সারা গায়ে কাঁটা হয়ে উঠল।

একদিন রাত্রে চুপি-চুপি পালাল ঘর ছেড়ে।

গোবর্ধন আবার তাকে ধরে আনল।

'ছেলে আমার পাগল হয়ে গিয়েছে,' বললে মা, 'ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখো।'

বিষণ্ণ মুখে গোবর্ধন বললে, 'দড়ির সাধ্য কী ওকে বাঁধে। অপ্সরার মত স্ত্রী, ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্যও ওকে বশ করতে পারল না। আর সত্য কথা বলতে কী, জন্মদাতা পিতাও পুত্রের প্রারব্ধ খণ্ডাতে অসমর্থ। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে ওর যদি সংসারে বৈরাগ্য এসে থাকে, সে ফল কেউ পারবে না হরণ করতে।'

'তাই বলে যে পাগল, তাকে তুমি বেঁধে রাখবে না?'

'যে চৈতন্যচন্দ্রের জন্যে পাগল তাকে বাঁধবার দড়ি কই!'

'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন।
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হৈয়াছে ইহারে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে?'

বারে-বারে পালাই, বারে-বারেই ধরা পড়ি কেন? নিজের চেষ্টায় কি চৈতন্যচন্দ্রের কাছে যেতে পারব না? তবে কি নিত্যানন্দের কৃপা দরকার? সংসারসমুদ্র পার করে চৈতন্যবন্দরে পৌঁছে দেবার ভেলাই কি নিত্যানন্দ?

নিত্যানন্দ পানিহাটিতে আছে, সেইখানে নিত্য নাম-উৎসব চলেছে, তার রঙ্গ একবার দেখে আসি।

'নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সর্ব অঙ্গ, অশ্রু গঙ্গা বয়॥'

বাবার কাছে যাবার অনুমতি চাইল।

'আবার ফিরে আসবে তো?' জিজ্ঞেস করল গোবর্ধন।

'আসব।'

নিত্যানন্দের গায়ে অনেক অলঙ্কার, তার কীর্তনের দলের সঙ্গে এক ডাকাত এসে জুটল। বর্ণে ব্রাহ্মণ কর্মে ডাকাত। মতলব, নিতাইয়ের গায়ের অলঙ্কার চুরি করে নেবে। নামরসে কত সময় বিবশ হয়ে থাকে, আলগোছে তুলে নিতে কতক্ষণ।

নবদ্বীপে হিরণ্যপণ্ডিতের বাড়িতে ভক্তগণ নিয়ে বিহার করছে নিতাই।

'এত দিনে আমাদের দুঃখ ঘুচল।' ব্রাহ্মণ-ডাকাত বললে দলবলকে, 'মা-চণ্ডী এক ভাণ্ডেই সমস্ত অলঙ্কার জমা করে রেখেছেন। লোকজন বিশেষ নেই ধারে-কাছে, রাত একটু ঘন হয়ে এলেই হানা দেব। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকো।'

রাত ঘন হয়ে আসতেই একজন চর পাঠাল, দেখে আয়, অবধূত কী করছে।

চর এসে খবর দিল, অবধূত খাচ্ছে।

আর তার লোকজন?

হৈ হৈ করছে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলছে। কেউ কেউ অট্ট অট্ট হাসছে, কেউ বা সিংহনাদ করছে।

করুক। কতক্ষণ করবে। একসময় না একসময় শোবে। ঘুমুবে। তখন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ততক্ষণ এই ঝোপে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকি। অপেক্ষা করি।

কে কোন্ গয়নাটা নেবে ডাকাতের দল তারই ফিরিস্তি করতে বসল।

আস্তে আস্তে ডাকাতের দলই ঘুমিয়ে পড়ল। কী আশ্চর্য, রাত ভোর হয়ে গেল, তবু কারু চেতন নেই। কাকের ডাকে সবাই যখন জাগল, দেখল রাত কখন ধুয়ে-মুছে গেছে, কোথায় ডাকাতি করবে, কোন্ সাহসে?

ত্রস্তব্যস্ত হয়ে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ঝোপে-জঙ্গলে লুকিয়ে ফেলল ডাকাতেরা। একে-অন্যেকে গালি পাড়তে লাগল। তুই কেন আগে শুতে গেলি? তুই আর তা দেখলি কখন—তুই তো আগেই ঢলে পড়েছিস। যত দোষ তোর।

ব্রাহ্মণ-ডাকাত কলহ নিরস্ত করল। বললে, 'চণ্ডীর ইচ্ছায় হয়েছে। মাকে পুজো দিই নি। মাকে আগে পুজো না দিলে ডাকাতি নিষ্ফল হয়। তা একদিন গেলেই সকল দিন যায় না।'

মদ্য মাংস নিয়ে চণ্ডীর পুজো করল ডাকাতেরা, তারপর মধ্যরাত্রে, নিতাই ও তার সঙ্গীরা যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন বাড়ি ঘেরাও করতে গেল।

কিন্তু ও হরি, এ কী ভয়াবহ ব্যাপার! দেখল সশস্ত্র কতগুলি পাইক বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকের প্রকাণ্ড চেহারা, প্রচণ্ড তেজ। আর আশ্চর্যের আশ্চর্য, সকলে উচ্চকণ্ঠে গাইছে কৃষ্ণনাম।

কী ব্যাপার? একটা সামান্য অবধূত এত সব পাইক বরকন্দাজ জোগাড় করল কোত্থেকে? আগে থেকে কী করে বা বুঝল যে ডাকাতি হবে, প্রহরীর প্রয়োজন? নিশ্চয়ই গুণ জানে।

'ও সব কিছু নয়।' দলপতি ব্রাহ্মণ বললে, 'বড় বড় লোক-লস্কর মাঝে-মাঝে আসে অবধূতকে দেখতে। তেমনি কেউ এসেছে আর ওরা তারই পাইক বরকন্দাজ। ভক্ত-ভাবুকের চাকরি করছে বলে মুখে ঐ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। যাই হোক, আজ আর নয়, দিন দশেক চুপচাপ থাকি, তারপর আবার একদিন দেখা যাবে।'

ক'দিন পর আবার একদিন মধ্যরাত্রে দেখতে গেল।

এবার আর দ্বিধা নয়, আক্রমণ করল সদলে। বাড়ির মধ্যে

ঢুকতে না ঢুকতেই নিদারুণ অন্ধকার আচ্ছন্ন করল সকলকে। এ কী, চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? এ কী, সকলে অন্ধ হয়ে গেলাম নাকি?

চোখে কিছু ঠাহর করতে না পেরে সবাই এদিক-ওদিক ছিটকে পড়তে লাগল। কারু হাত ভাঙল, পা ভাঙল, কারু গায়ে-পায়ে কাঁটা ফুটল। অন্ধকারে কিছু দেখবার উপায় নেই, পোকা-মাকড় কামড়াতে লাগল সর্বাঙ্গে। আর, বিপাকের উপর দুর্বিপাক, তখুনি কি না নামল শিলাবৃষ্টি। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। চোখে দেখতে পায় না, ভেবে পেল না কোথায়, কোন দিকে আশ্রয় নেবে। ত্রাসে মূর্চ্ছা গেল অনেকে। কারু বা শীতে বৃষ্টিতে গায়ে জ্বর এসে পড়ল।

দস্যুপতি ব্রাহ্মণের তখন সম্বিৎ হল, নিত্যানন্দ ছাড়া আর গতি নেই, যার ধন কাড়তে এসেছি তার কৃপাই এখন কাড়তে হবে। আর, আমার মত পতিতজনের পক্ষে মহতের কৃপা ছাড়া আর ধন কী! পতিতজনকে উদ্ধার করবেন, তার দ্রোহকেও ক্ষমা দিয়ে আবৃত করবেন, তারই জন্যেই তো নিত্যানন্দ।

যে মাটিতে আছাড় পড়ে সে মাটিকে ধরেই আবার উঠে দাঁড়ায়। তুমিই ফেলেছ, তুমিই আবার তুলে ধরো।

নিত্যানন্দ-চরণ ধ্যান করলো ব্রাহ্মণ। চোখের দৃষ্টি খুলে গেল। দেখতে পেল পথ। যে পথ নিত্যানন্দ-চরণের দিকেই প্রসারিত।

নিত্যানন্দের পায়ে পড়ে ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগল।

'রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবালগোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্বজীবপাল॥
যে জন আছাড় প্রভু, পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহো তোমার স্মরণে দুঃখ তরে॥

তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ।
পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ ॥'

বললে, 'পরহিংসা ছাড়া আমি আর কিছু জানতাম না, আমাকে দেখে সমস্ত নবদ্বীপ কাঁপত। সেই চণ্ডাল-আচার প্রচণ্ডকে বার বার তিনবার তুমি দস্যুতার থেকে নিবৃত্ত করলে। তবু হিংসা যায় না। শেষবার তুমি অন্ধ করে দিলে। বুঝলাম, সে অন্ধকারের কী যন্ত্রণা! তখন সমস্ত অন্ধের যে সহায় সেই ভক্তিকে স্মরণ করলাম। আর অমনি কিনা মুহূর্তে চোখ খুলে গেল। হল লোচন-বিমোচন। তোমার প্রতি নির্দয় হতে চাইলাম আর তুমিই দয়া করলে। তবে আরো একটু দয়া দেখাও, অনুমতি করো, গঙ্গায় ডুবে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।'

'নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায়।'

নিত্যানন্দ দস্যুপতিকেও চৈতন্য দান করল। বলল, 'তুমি ভাগ্যবন্ত, তোমার উপর পতিতপাবন চৈতন্য গোঁসাইয়ের কৃপা হয়েছে। তোমার সমস্ত পাতক আমিই মাথা পেতে নিলাম। তুমি সমস্ত অনাচার ছেড়ে দিয়ে ধর্মপথে চলে এস, তোমার দলবলকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো, তা হলে আর তোমার ভয় নেই।'

নিতাইয়ের পাদপদ্মে দস্যু তার মাথা রাখল।

নিতাইই চৈতন্যহেতু। নিতাইই চৈতন্যসেতু।

রঘুনাথও বুঝল নিতাই না দরজা খুলে দিলে চৈতন্যগৃহে পৌঁছুনো যাবে না। তাই সে চলল নিতাই-সাক্ষাতে।

গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে উচ্চভূমিতে জ্যোতির্ময় দেহে নিত্যানন্দ ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছে, রঘুনাথ এসে দণ্ডবৎ করল।

নিতাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'চোর! এত দিন পরে ধরা দিলে?'

চোর? চোর নয় তো কী! নিতাইয়ের সম্পত্তি গৌরচরণ যে নিতে চায় লুকিয়ে, যার সম্পত্তি তাকে না জানিয়ে, সে একশোবার

চোর। চুরির যে চেষ্টা করে সেও চোর। কিন্তু চোর হয়েও সে প্রিয়, সে সুজন, সে মনোচোর।

নিজেই রঘুনাথের মাথা কাছে টেনে এনে পা রাখল নিতাই। বললে, 'যখন ধরতে পেরেছি তখন তোমাকে দণ্ড দেব।'

দণ্ড মাথা পেতে নেবার জন্যে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল রঘুনাথ।

'আমাদের সকলকে দই-চিঁড়া খাওয়াও।'

এই দণ্ড!

মহানন্দে বাড়িতে খবর পাঠাল রঘুনাথ। প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার ও লোকজন আনাল। দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিলে পানিহাটিতে মহোৎসবের মেলা বসবে, যে যা পারো চিঁড়ে দই কলা চিনি ক্ষীর সন্দেশ নিয়ে এস, সব রঘুনাথ কিনে নেবে উচিত দামে। আর যেখানে যত ভক্ত আছে, সকলের নিমন্ত্রণ। যে আসবে সেই পরিপূর্ণ প্রসাদ পাবে। সর্বত্র অঢেল, ধনে জনে কুণ্ঠা নেই কোথাও। শুধু চলে এস। উপস্থিত হও।

পার্ষদেরা অনেকে এসেছে। রামদাস, সুন্দরানন্দ, গঙ্গাধর, মুরারি, কমলাকর। আর এই যে সদাশিব কবিরাজ। পুরন্দর পণ্ডিত, ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাসও এসেছে। সবাই নাম-প্রেম-প্রচার-লীলার সঙ্গী। আর এসেছে গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস, মহেশ, উদ্ধারণ দত্ত। আরো কত শত, কে গোণে, কে হিসেব করে?

তিন পঙক্তিতে খেতে বসেছে, বিশজন পরিবেশন করছে, এমন সময় রাঘব পণ্ডিত এল।

রাঘবের বাড়িতেই তো নিতাইয়ের আড্ডা।

আর রাঘবের বিধবা বোন দময়ন্তীই তো প্রভুর জন্যে বারো মাসের ভোগ তৈরি করে ঝালি সাজিয়ে দিচ্ছে। যে সব জিনিস সদ্য নষ্ট হবার নয়, পাকের গুণে এক বছর স্থায়ী হবে সেই সব জিনিস। মকরধ্বজ করের জিম্মায় সে ঝালি প্রতি বছর পৌঁছুচ্ছে নীলাচলে। আর তার নাম 'রাঘবের ঝালি।'

রাঘবকে দেখে নিতাই বললে, 'আমি গোপদের নিয়ে পুলিন-ভোজন করছি। তুমিও বসে যাও।'

এ কি বলরামের ভাবে কথা কইছে নিতাই ? সেই যে রাখালদের নিয়ে কৃষ্ণ-বলরাম যমুনাপুলিনে ভোজন করেছিল এ কি সেই স্মৃতি ? তবে কৃষ্ণ কোথায় ?

নিতাই মহাপ্রভুর ধ্যান করল, আর অমনি মহাপ্রভু আবির্ভূত হলেন।

নিতাই মহাপ্রভুকে নিয়ে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু সবাই নিতাইকেই দেখছে, মহাপ্রভুকে দেখছে না। আর প্রত্যেকের মালসা থেকে এক এক গ্রাস চিঁড়ে নিয়ে তাঁরা যে পরস্পরকে খাইয়ে দিচ্ছেন তাও বা কে দেখে !

নিজের পাশে আসন পাতল নিতাই। সে আসনে নিমাই বসল। দু'ভাই চিঁড়ে খেতে লাগল।

এমন দৃশ্যও দেখে কোন ভাগ্যবান ?

'হরি-হরি ধ্বনি তোলো।' আদেশ করল নিত্যানন্দ।

সন্দেহ কী, রঘুনাথের প্রতি এ নিতাইয়ের অকৃপণ কৃপা। শুধু তার সামগ্রীই অঙ্গীকার করল না, মহাপ্রভুকে উৎসবে টেনে নিয়ে এল। তার অর্থই রঘুনাথকে নিতাই চৈতন্যচরণ দান করলে।

রঘুনাথ কোথায় ? সে বুঝি বসে নি।

না, সে বসবে কেন ? নিত্যানন্দই তাকে বসতে দেয় নি। নিত্যানন্দ যে তাকে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ খাওয়াবে।

রঘুনাথ জানল এ বুঝি নিত্যানন্দের প্রসাদ। নিত্যানন্দের প্রসাদই তো মহাপ্রভুর করুণার আস্বাদ দিয়ে ভরা।

তারপরে দিনশেষে রাঘবমন্দিরে কীর্তন আরম্ভ হল। নিত্যানন্দ নাচতে লাগল। মহাপ্রভু চলে এলেন সেই নাচ দেখতে। কিন্তু নিত্যানন্দ ছাড়া মহাপ্রভুকে কে দেখে ?

না, রাঘবও বুঝি দেখল। যখন নিমাই খেতে বসে তার ডান পাশে আরেকখানা আসন পাতল।

'সে কী, ওখানে কে বসবে?'

রাঘব বিস্ময় বিহ্বল চোখে চেয়ে দেখল এ যে স্বয়ং মহাপ্রভু।

রাঘবের ঘরে রাধারমণ প্রতিষ্ঠিত, আর তার প্রসাদ অমৃতের সার যেহেতু অপ্রকাশ্যে স্বয়ং রাধাঠাকুরাণীই সে-ভোগ রান্না করে। মহাপ্রভু যে বারে বারে সে প্রসাদ খেতে আসবে তাতে আর আশ্চর্য কী। আর যে ভক্ত নিত্য নিয়মিত এমন অমৃত ভোজন করায় তাকে মাঝে-মধ্যে দেখা দিতে দোষ নেই।

দুই ভাইয়ের অবশিষ্ট-পাত্র রঘুনাথকে উপহার দিল রাঘব। বললে, 'তুমি চৈতন্য গোঁসাইয়ের প্রসাদ পেলে, তোমার সর্ব বন্ধন খণ্ডন হল।'

'কোথায় চৈতন্য গোঁসাই?' ব্যাকুল হল রঘুনাথ।

'তিনি নালাচলে। তিনি আবার ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে। তিনি কখনো ব্যক্ত কখনো গুপ্ত। তিনি যে স্বতন্ত্র ভগবান। কখনো মানুষের মত হাঁটেন, কখনো ভগবানের মত আবির্ভূত হন। তিনি সর্বব্যাপী, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর গতি-স্থিতি। সংশয় করতে যেও না, সংশয়েই সর্বনাশ।'

'না, সংশয় করি না, কিন্তু তিনি না আসুন, আমি তাঁর কাছে যাব কী করে?' রঘুনাথ এবার নিতাইয়ের পা আঁকড়ে ধরল। বললে, 'কিন্তু চাঁদ যদি নিজে থেকে নেমে না আসে বামনই বা তাকে ধরে কী করে? যতবার গৃহ ছেড়ে পালাতে যাই ধরা পড়ি, মা-বাবা কঠোর শাসনে বেঁধে রাখে। আমি আর কিচ্ছু চাই না, শুধু চৈতন্য চাই, যেন কেউ আমাকে বাঁধতে না পারে, বন্ধনহীনতার চৈতন্য। তোমার কৃপা ছাড়া চৈতন্য অলভ্য, তুমি আমাকে কৃপা করো। জানি আমি অযোগ্য, কিন্তু অযোগ্য-অকৃতীরই তো কৃপালাভে অধিকার।'

'অযোগ্য মুঞি, নিবেদন করিতে করোঁ ভয়।
মোরে চৈতন্য দেহ গোঁসাই, হইয়া সদয়॥
মোর শিরে পদ ধরি করহ প্রসাদ।
নির্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ, কর আশীর্বাদ॥'

নিতাই ভক্তবৈষ্ণবদের বললে, 'তোমরা সব দেখ, এর ইন্দ্রসুখের মত বিষয়সুখ, কিন্তু চৈতন্যকৃপায় এতে এর রুচি নেই। যে একবার কৃষ্ণপাদপদ্মের গন্ধ পায় ব্রহ্মলোকের সুখও সে অগ্রাহ্য করে।'

'কৃষ্ণ পাদপদ্ম গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তারে নাহি ভায়॥'

তাকাল রঘুনাথের দিকে। সস্নেহে বললে, 'তোমার পুলিন-ভোজনে চৈতন্য এসেছিলেন, খেয়ে গেলেন দই-চিঁড়া। রাত্রে নাচ দেখতে এসে রাধারাণীর রান্না খেয়ে গেলেন। তুমি দুবারই তাঁর প্রসাদ পেলে। এ সব কেন? তোমাকে উদ্ধার করতেই এই আয়োজন। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যাও। গৌরাঙ্গ নেবেন তোমাকে তাঁর অন্তরঙ্গ ভৃত্য করে।'

তবে আর কথা কী। নিত্যানন্দের সেবার জন্যে ভাণ্ডারীর হাতে রঘুনাথ কিছু অর্থ আর সোনা দিল গোপনে। বললে, 'এখন নয়, প্রভু যখন নিজঘরে যাবেন তখন বলবে।' আর শুধু প্রভুকে নয়, প্রভুর ভৃত্য ও আশ্রিত সর্বজনকেই আমি সেবা-প্রণাম জানাতে চাই।

রাঘব প্রকাণ্ড ফর্দ তৈরি করল। আর যাকে যা বলল তাই রঘুনাথ দিল নির্বিচারে।

'আর এই সামান্য আপনার জন্যে।' রঘুনাথ রাঘবকেও দিল টাকা আর সোনা। সকলের আশীর্বাদ মাথায় করে বাড়ি ফিরল রঘুনাথ।

বাবার কাছে দেওয়া কথা রাখল। এখন দেখি নিত্যানন্দ কেমন তাঁর কথা রাখেন। কেমন গৌরহরি তাকে টেনে নেন অন্তরঙ্গ করে।

৬৯

রঘুনাথ আর অন্দরমহলে যায় না, বাইরে দুর্গামণ্ডপে পড়ে থাকে। সেইখানেই প্রহরীরা পাহারা দেয়। আর রঘুনাথ একান্তে ভাবে কবে আসবে সেই সুবর্ণসুযোগ।

গৌড়ের গৌরভক্তরা নীলাচলে চলেছে, তাদের সঙ্গ ধরা কত সহজ হত! কিন্তু তাদের পথ সকলের জানা, প্রহরীরা ঠিক ধরে আনত তাকে। এমন সুযোগ কি আসে না যখন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অজানা পথ দিয়ে চলে যাওয়া যায়?

চারদণ্ড রাত্রি বাকি আছে, একদিন মণ্ডপে যদুনন্দন আচার্য এসে হাজির। যদুনন্দন রঘুনাথদের কুল-পুরোহিত, দীক্ষাগুরু অদ্বৈত প্রভুর মন্ত্রশিষ্য।

রঘুনাথের ঘুম ভেঙে গেল। যদুনাথকে দণ্ডবৎ করে দাঁড়াল নীরবে।

'আমার যে পুজুরী ছিল সে আর পুজো করতে আসছে না।' বললে যদুনন্দন, 'তুমি যদি তাকে বলে-কয়ে পাঠিয়ে দিতে পারো তবে ভালো হয়। সে ছাড়া আর ব্রাহ্মণ নেই।'

রঘুনাথ প্রহরীদের দিকে তাকাল। তারা সুখনিদ্রায় অচেতন।

রঘুনাথ বললে, 'বেশ তো, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যাই।'

যদুনাথ ভাবলে, প্রহরী ছাড়া একাকী যাবারই অনুমতি চাইছে রঘুনাথ। বললে, 'যাও।'

রঘুনাথ গুরু-আজ্ঞায় আবৃত, নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ল। যদুনাথ কল্পনাও করতে পারল না, এই ছলনার সুযোগ নিয়ে রঘুনাথ নীলাচলে পালাবে।

প্রভুই তো শান্তিপুরে রঘুনাথকে বলেছিলেন, 'এখন ঘরে ফিরে যাও, অলিপ্ত হয়ে বিষয়কর্ম করো। আমি ইতিমধ্যে নীলাচল থেকে ফিরে আসি, তারপর কোনো ছলে তুমি আমার কাছে এসে হাজির হও। ভয় নেই, কৃষ্ণই সেই ছল রচনা করে দেবেন।'

ছলে বলে কৌশলে যে করে হোক পৌঁছুনো নিয়ে কথা।

পথ ছেড়ে উপপথ ধরল রঘুনাথ। গ্রাম ছেড়ে বনজঙ্গল। পথ যাই হোক, গন্তব্য চৈতন্যচরণ। গোপন পথ হলেও, পাছে প্রহরীরা ধরে ফেলে, ছুটে চলেছে। ত্বর সয় না, ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

রঘুনাথ পালিয়েছে, রঘুনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না—এদিকে রব উঠেছে বাড়িতে। খবর পেয়ে যতুনন্দন তো হতবাক। গোবর্ধন পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই নীলাচলের পথে গৌড়ের ভক্তদের সঙ্গে ভিড়েছে। শিবানন্দকে পত্র দিয়ে লোক পাঠাল গোবর্ধন। দয়া করো, আমার ছেলেকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

ওদিকে পনেরো ক্রোশ হেঁটে সন্ধ্যাকালে এক গোয়ালার বাথানে এসে পৌঁচেছে রঘুনাথ।

'চোখমুখ শুকনো, সারাদিন কিছু খাও নি মনে হচ্ছে।' জিজ্ঞেস করল গোয়ালা, 'তুধ খাবে ?'

রঘুনাথ হাসল।

গোয়ালা তুধ এনে দিল। তাই খেয়ে সারারাত বাথানে পড়ে রইল রঘুনাথ।

ভোরে উঠে, এতক্ষণ পূব দিকে যাচ্ছিল, রঘুনাথ দক্ষিণ দিকে চলল।

শিবানন্দের কাছে পত্র পৌঁছুল। কোথায় রঘুনাথ! কই আমাদের সঙ্গে আসে নি তো! কাকে ফেরাব ?

গোবর্ধনের লোকই ফিরে চলল।

আর ওদিকে রঘুনাথ সমানে হাঁটছে, হেঁটে চলেছে। কখনো চর্বণ, কখনো রন্ধন, কখনো তুগ্ধপান, কখনো বা নিরম্বু উপবাস।

জীবনের অহোরাত্রের ক্ষুধা—একমাত্র চৈতন্যচরণ। সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে কবে ?

বারো দিন পরে—বারো দিনের মধ্যে তিন দিন শুধু ভোজন হয়েছে—রঘুনাথ পুরুষোত্তমে পৌঁছুল।

'এই যে রঘুনাথ এসেছে।' উছলে উঠল রঘুনাথ।

'এসেছ ? এস।' প্রভু উঠে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'কৃষ্ণকৃপা সবচেয়ে বলিষ্ঠ। তোমাকে বিষয়কূপ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।'

রঘুনাথ বললে, 'আমি কৃষ্ণ জানি না, আমি শুধু তোমাকে জানি। তোমার কৃপাই আমাকে নিয়ে এল এখানে।'

'এর বাপ আর জেঠা', সকলকে লক্ষ্য করে বললেন প্রভু, 'বিষয়বিষকেই সুখসেব্য বলে মনে করে। এদের অনেক দান ধ্যান, কিন্তু এদের কৃষ্ণকামনা নেই, নেই বা অনন্যা কৃষ্ণভক্তি। বিষয়ের এমনি স্বভাব, মানুষকে অন্ধ করে রাখে, এমন কর্ম করায় যাতে ভববন্ধন আরো দৃঢ় হয়। তোমাকে সেই বিষয় থেকে কৃষ্ণ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। কিন্তু দেখেছ, ছেলেটার শরীর কি রকম কৃশ হয়ে গেছে, মুখখানি ম্লান। স্বরূপ, তুমি এর ভার নাও, একে তুমি তোমার ছত্র-ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করো। আজ থেকে এর নাম হল, 'স্বরূপের রঘুনাথ'।' বলে রঘুনাথের হাত ধরে স্বরূপের হাতে তুলে দিলেন।

স্বরূপ বললে, 'তাই হবে।'

প্রভু তারপর গোবিন্দকে বললেন, 'কতদিন উপবাসে থেকেছে, তুমি ভালো করে খাইয়ে এর তৃপ্তিবিধান করো।' রঘুনাথকে লক্ষ্য করলেন : 'তুমি যাও, সমুদ্রস্নান সেরে জগন্নাথকে দর্শন করে এস।'

পাঁচদিন গোবিন্দের তত্ত্বাবধানে রইল রঘুনাথ। প্রভুর অবশেষ-পাত্র খেল পেট ভরে। ভাবল, এও তো সেই বাড়ির মত আদর

যত্নেই আছি, দিব্যি মুখের কাছে অনায়াস খাবার এসে জুটছে। তবে তো সেই আত্মসুখস্পৃহাতেই আবদ্ধ রইলাম। না, ফিরিয়ে দিল গদাধরকে, বললে, 'ভিক্ষে করে খাব।'

ভিক্ষার্থী হয়ে মন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়াল রঘুনাথ। যদি কিছু জোটে খাব, না জোটে তো থাকব উপোস করে। আর সর্বক্ষণ নামকীর্তন করব।

গোবিন্দ প্রভুকে গিয়ে বললে, 'রঘুনাথ আর খাচ্ছে না আমার থেকে। সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছে।'

এই তো নিষ্কিঞ্চন বৈরাগীর লক্ষণ। প্রভু বললে, 'বা, খুব ভালো করছে।'

যে বৈরাগী সে অবিচ্ছেদে নামকীর্তন করবে। আহারের জন্যে উদ্বিগ্ন হবে না, সঞ্চয়-সংস্থান কিছু করবে না। ভিক্ষে করে যেটুকু পায় তা দিয়েই দেহরক্ষা করবে, দেহরক্ষা না হলে ভজনকীর্তন হবে কিসে? ভিক্ষান্নই অহঙ্কারমুক্ত, ভিক্ষান্নেই কৃষ্ণপ্রেমের স্বাদগন্ধ।

'বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীর্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় তার, হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নামসঙ্কীর্তন।
শাকপত্র ফলমূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

একদিন স্বরূপকে ধরল রঘুনাথ। বললে, 'বলুন আমার কী কর্তব্য। প্রভু আমাকে ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন, তাঁর উদ্দেশ্য কী?'

প্রভুকে বিশেষ সম্ভ্রম করে, তাই সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করতে

সঙ্কোচ হয়। স্বরূপকে দিয়ে বলে পাঠাল। স্বরূপ বললে, 'রঘুনাথ জানতে চেয়েছে কী তার করণীয়।'

রঘুনাথকে ডেকে পাঠালেন প্রভু। বললেন, 'স্বরূপকে তোমার উপদেষ্টা করে দিয়েছি, ওর কাছ থেকে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিখে নাও। ও যত জানে আমার তত জানা নেই। তবু আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা থাকে, তোমাকে বলি, কখনো গ্রাম্যবার্তা শুনবে না, কখনো বলবেও না। ভালো খাবার-পরবার লোভ করবে না। অমানীমানদ হয়ে সর্বদা কৃষ্ণনাম নেবে আর মানসব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবে। আমি সংক্ষেপে বললাম, বিশদ-বিশেষ জেনে নেবে স্বরূপের থেকে।'

'গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানীমানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥'

গৌড়ভক্তেরা এসে পড়েছে, পূর্ববৎ সুরু হল আনন্দলীলা।

শিবানন্দ রঘুনাথকে বললে, 'তোমার বাবা তোমার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, রঘুনাথ আমাদের সঙ্গে আসে নি। কোথায় আছে কী করে বলব। তুমি যে আগে থেকেই এখানে চলে এসেছ তা কে জানে?'

উৎসবান্তে, চার মাস পরে, গৌরভক্তেরা গৌড়ে ফিরে এল। তাদের কাছে যদি খবর পাওয়া যায় সেই আশায় শিবানন্দের কাছে লোক পাঠাল গোবর্ধন।

'গোবর্ধনের ছেলে রঘুনাথকে কি নীলাচলে দেখলেন?'

'দেখলাম বৈ কি। প্রভু তাকে স্বরূপের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।'

'সে কি বাড়ি ফিরবে?'

'মনে হয় না।' বললে শিবানন্দ, 'তাকে বৈরাগ্য আচ্ছন্ন

করেছে। তার ভক্ষ্যে পরিধানে দৃষ্টি নেই। দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলির পর সে সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ায়, যদি কেউ ভিক্ষে দেয় তো খায়, না দেয় তো খায় না, উপোস করে থাকে।'

গোবর্ধন শুনল সব বিবরণ। বেঁচে আছে এতে তার আনন্দ কিন্তু আর যে ফিরবে না এটাই দুর্বিষহ যন্ত্রণা।

ছেলের পরিচর্যার জন্যে চাকর আর টাকা পাঠাতে মনস্থ করল গোবর্ধন। শিবানন্দ বললে, 'এখন কোথায় যাবে, কার কাছে পৌঁছুবে ঠিক নেই। এখন থাক, পরের বছর আমি যখন যাব তখন সঙ্গে দিয়ে দেবেন।'

তাই ভালো। পরের বছর গৌড়ভক্তরা যখন যাচ্ছে তখন শিবানন্দের সঙ্গে গোবর্ধন লোক আর টাকা পাঠিয়ে দিল। লোক বলতে দুই চাকর, এক ব্রাহ্মণ, আর টাকা চার শো মুদ্রা।

যথারীতি পৌঁছুল সকলে নীলাচলে। রঘুনাথের সাক্ষাৎ পেল। এই নাও, এই সব আরাম-সম্ভার তোমার বাবা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

রঘুনাথ সমস্ত অগ্রাহ্য করে দিল।

ব্রাহ্মণ আর ভৃত্য দেশে ফিরল না, নীলাচলেই অপেক্ষা করতে লাগল।

রঘুনাথ ভাবল, তবে এক কাজ করি। বাবার দেওয়া টাকা থেকে মহাপ্রভুকে মাসে দু'দিন মহাপ্রসাদ খাওয়াই।

গৌরহরি নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হলেন। মাসে দু'দিন।

দু'দিনের মহাপ্রসাদ কিনতে আটপণ মাত্র কড়ি লাগে। সেই মাত্র আটপণ কড়িই রঘুনাথ বাবার ভৃত্যদের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। কদাচ এক কড়ি বেশি নয়। অর্থাৎ এক কপর্দকও নিজের জন্যে নয়। যেটুকু প্রয়োজন শুধু সেইটুকু, তাও প্রভুর জন্যে। তাও এক মাসে আট গণ্ডা।

টানা দু'বছর এ ভাবে প্রভুর সেবা করল রঘুনাথ।

তারপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ করে দিল।

'কী ব্যাপার?' স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, 'রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করল কেন?'

স্বরূপ বললে, 'রঘুনাথের মনে একটি বিচার উপস্থিত হয়েছে, তাই বন্ধ করেছে নিমন্ত্রণ।'

'কী বিচার?'

'বিষয়ীর দ্রব্য দিয়ে প্রভুকে সেবা করছি এতে প্রভুর মন নিশ্চয়ই প্রসন্ন নয়। এতে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর তো কোনোই ফল দেখছি না। রঘুনাথ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করে মহাপ্রসাদ দিচ্ছে—শুধু এই অহঙ্কার দিয়ে কী হবে? আমার প্রার্থনা না মানলে আমি দুঃখ পাব তারই জন্যে প্রভু নিমন্ত্রণ নিতে রাজি হয়েছিলেন—কিন্তু এতে তাঁরও প্রসন্নতা নেই আর আমার মনও মালিন্যময়।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'বিষয়ীর অন্ন খেলে মন মলিন হয়। আর মলিনচিত্তে কৃষ্ণস্মৃতি স্ফুরিত হয় না। বিষয়ীর হচ্ছে রাজস-নিমন্ত্রণ। দম্ভ আর প্রতিষ্ঠা লোভই এই নিমন্ত্রণের হেতু। এতে দাতা-ভোক্তা দুয়েরই সঙ্কোচ ঘটে। আমি যে এতদিন রঘুনাথের নিমন্ত্রণ নিয়েছি তার কারণ ওকে দুঃখ দিতে চাই নি। ও যে নিজের থেকে বুঝেছে, নিজের ইচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছে, এই আমার আনন্দ।'

রঘুনাথ তারপর সিংহদ্বারও ছেড়ে দিল, ছত্রে গিয়ে ভিক্ষে করতে লাগল।

'হ্যাঁ হে, রঘুনাথ নাকি ভিক্ষের জন্যে আর সিংহদ্বারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে না?' প্রভু জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।

'কে দেবে, কে না দেবে, এই আশা-নিরাশায় চিত্ত চঞ্চল হয়ে থাকে বলে দাঁড়ানো ছেড়ে দিয়েছে।'

'ঠিক করেছে।' প্রভু সমর্থন করলেন: 'সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। ছত্রে যথালাভ উদরভরণ অনেক ভালো।

সেখানে আর মনে-মনে আশায়-নিরাশায় আন্দোলিত হওয়া নেই, তদ্‌গত মনে মুখে কৃষ্ণকীর্তন করতে পারবে। স্বরূপ, এই শিলা আর মালা নিয়ে যাও, রঘুনাথকে দিও।'

শঙ্করারণ্য সরস্বতী গোবর্ধনের শিলা আর গুঞ্জামালা নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবন থেকে। প্রভুকে উপহার দিয়েছিল। লীলাস্মরণের সময়ে ঐ মালা প্রভু গলায় পরতেন আর ঐ শিলা কখনো মাথায় ধরতেন, কখনো বুকে, কখনো তার ঘ্রাণ নিতেন আর কখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে চোখের জলে তাকে স্নান করিয়ে দিতেন। এ তো সামান্য শিলা নয়, এ আমার কৃষ্ণকলেবর। তিন বছর এই শিলা-মালা ধারণ করেছেন, আজ তা রঘুনাথকে দিয়ে দিলেন।

বললেন, 'রঘুনাথ, এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ, এর তুমি সাত্ত্বিক পূজো করো। একপাত্র জল নাও আর নাও আটটি তুলসীমঞ্জরী, তাই দিয়ে তুমি শুদ্ধভাবে, শ্রদ্ধায়, নিবেদন করো শিলাকে, তুমি অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমধন পেয়ে যাবে।'

স্বরূপই সব জোগাড় করে দিল। শিলার বসাবার জন্যে একখানি পিঁড়ি, আচ্ছাদনের আধ হাত বস্ত্র আর জলের জন্যে একটি কুঁজো।

প্রাণ-মন ঢেলে পূজো করতে লাগল রঘুনাথ। এ আর কেউ নয়, প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্ধন-শিলা। যতই প্রভুর এই করুণার কথা ভাবে ততই রঘুনাথ প্রেমাশ্রুতে ভেসে যায়। এই জল-তুলসীর পূজায় যত সুখ তত সুখ তো সাড়ম্বর ষোড়শোপচার পূজায় নেই। আর এ শিলা কোথায়, স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বরূপ বললে, 'আট কড়ির খাজা সন্দেশ নিবেদন করো শিলাকে। যদি শ্রদ্ধা করে দাও সেই খাজা সন্দেশই অমৃতের সমান হয়ে উঠবে।'

স্বরূপের আদেশে গোবিন্দই নিয়ে আসছে সেই খাজা সন্দেশ। রাজৈশ্বর্যে পালিত রঘুনাথ সর্বস্ব-ত্যাগের পরমদৈন্যে সেই খাজা সন্দেশ দিয়েই বিগ্রহের ভোগ দিচ্ছে।

আর শুধু কৃষ্ণ কোথায়? সঙ্গে যে রাধাঠাকুরাণী।

শিলা দিয়ে প্রভু আমাকে গিরিগোবর্ধনের চরণে সমর্পণ করলেন আর গুঞ্জামালা দিয়ে রাধিকার চরণে। প্রভু তাই যুগলকিশোরেরই ভজনা করতে বলছেন।

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ হল। প্রভুই তো আমার যুগলকিশোর!

কী কঠিন নিয়মে বন্দী রঘুনাথ। কোথাও এতটুকু সময়ভঙ্গ নেই, নেই ছন্দচ্যুতি। 'রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।' পাষাণের রেখা যেমন নিটুট তেমনি রঘুনাথের নিয়মনিষ্ঠাও অভঙ্গ। দিন রাত্রির আটপ্রহরের মধ্যে সাড়ে সাত প্রহরই সে ভজন করে, আহার ও ঘুমের জন্যে বরাদ্দ মোটে চারদণ্ড। কোনো কোনো দিন ভজন-আবেশে সে এত তন্ময় হয়ে যায়, আহার-নিদ্রার অবকাশই থাকে না।

জিহ্বাকে কোনো দিন রসস্পর্শ দিল না, ছেঁড়া কাঁথা-কানি ছাড়া কিছু ঠেকাল না গায়ে, আর আহার শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। ভালো না-খাওয়া আর ভালো না-পরার আদেশ রাখল প্রাণপণে। আর সর্বক্ষণই নিজেকে নির্বেদ-বচন শোনাচ্ছে। হায়, আমি দারুণ হতভাগ্য, আমি নিজের স্বরূপ ভুলে দেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করছি। এখনো আমি ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি, এখনো আমার অন্নবস্ত্রের প্রয়োজন! ঘুরে ফিরে আমারও এখন সেই আত্মসেবা!

যে জ্ঞানধূতাশয়, অর্থাৎ জ্ঞানবলে যায় বাসনা নাশ হয়েছে, যে নিজেকে দেহ থেকে ভিন্ন বলে জেনেছে, সে কিসের আশায় কোন অভিসন্ধিতে দেহে আসক্ত হয়ে দেহকে পোষণ করে বেড়াবে?

কয়েকদিন পরে রঘুনাথ ছত্রে গিয়ে মেগে খাওয়াও ছেড়ে দিল। এতেও পরাপেক্ষা আছে। কতক্ষণে ছত্রের মালিক বা মালিকের কর্মচারী ভিক্ষান্ন নিয়ে আসে তারই জন্যে থাকতে হয় উৎকণ্ঠিত হয়ে। সুতরাং সেই চাঞ্চল্যভোগও বিসর্জন দাও।

রঘুনাথ ফেলে-দেওয়া বাসি পচা প্রসাদান্ন খেতে লাগল কুড়িয়ে।

আনন্দবাজারে প্রসাদান্ন সমস্তই রোজ বিক্রি হয় না। বাসি অন্নও থেকে যায় কিছু-কিছু। দু'-তিন দিনের বাসি হয়ে গেলে সে অন্ন আর কেউ কেনে না। তখন সে পচা দুর্গন্ধ অন্ন গরুর সামনে ফেলে দেয়। অনেক সময় অন্নের এমন দুরবস্থা, গরুও তা মুখে তোলে না। সেই গলিত প্রসাদান্নই রঘুনাথ মাটি থেকে ঘরে তুলে নিয়ে আসে, জল দিয়ে ধুয়ে গলিতাংশ বাদ দিয়ে শক্ত-শক্ত ভাত ক'টি নুন মেখে খায়।

প্রসাদ কি কখনো পচে, না, দুর্গন্ধ হয়? প্রসাদ তো চিদবস্তু। সে বাসিও হয় না, বিকৃতও হয় না। সে চিরন্তন অমৃতস্বরূপ হয়ে থাকে। আগুন কি কখনো ঠাণ্ডা হয়? তুষার কি কখনো উষ্ণ হয়? তেমনি প্রসাদও তার ধর্ম ছাড়ে না, সে চিরকাল অবিকৃত থাকে। প্রাকৃত লোকের দৃষ্টিবিচারেই প্রসাদকে বাসি দেখায়, গলিত দেখায়। প্রাকৃত চক্ষুতে চিন্ময় ভগবদ বিগ্রহকেও যেমন দেখায় সামান্য প্রতিমা। চিন্ময় বৃন্দাবনকে সামান্য তীর্থ। তাই প্রাকৃত জনের কাছে যাই হোক, রঘুনাথের কাছে এ প্রসাদ বাসিও নয়, বিকৃতও নয়—অপূর্ব সাত্ত্বিক সম্পদ।

একদিন স্বরূপ দেখতে পেল রঘুনাথের প্রসাদ খাওয়া।

'বা, আমাকে কিছু দাও।' স্বরূপ হাত বাড়াল। খেয়ে বললে, 'তুমি রোজ-রোজ এই অমৃত খাও, আমাদের দাও না কেন? এ তোমার কেমন স্বভাব?'

গোবিন্দের কাছ থেকে প্রভুও জানতে পেলেন।

'সে কী?' নিজেই চলে এলেন রঘুনাথের কাছে: 'নিজেরা লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ, আমাকে ভাগ দিচ্ছ না কেন?' বলেই ত্বরিতে একগ্রাস মুখে পুরলেন।

আরো এক গ্রাস নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছেন, স্বরূপ বাধা দিল। বললে, 'না, এ তোমার যোগ্য নয়।'

প্রভু বললেন, 'কী যে বলো তার অর্থ নেই। কত প্রসাদ খেয়েছি এমন সুস্বাদু প্রসাদ আর কখনো খাই নি।'

রঘুনাথের বৈরাগ্যে প্রভুর অশেষ সন্তোষ।

আমি কুজন, পতিত ও ঘৃণিত, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু গ্রন্থে বলছে রঘুনাথ, তবু আমাকে যিনি ভোগসুখের দাবানল থেকে কৃপা করে উদ্ধার করলেন; নিজের বুকের প্রিয় গুঞ্জাহার আর গোবর্ধনশিলা দিয়ে দিলেন উপহার, সঁপে দিলেন স্বরূপগোস্বামীর হাতে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আনন্দময় হয়ে বিরাজ করুন।

রঘুনাথ আর কী করে? রাত্রিকালে সকলের অগোচরে প্রভুর পদসেবা করে, লীলাবেশে প্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হন তখন করে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ। ষোল বছর সমানে সে এই অন্তরঙ্গ সেবা করে এসেছে। স্বরূপের অন্তর্ধান হলে বৃন্দাবন চলে এল। ঠিক করল রূপ আর সনাতনকে দর্শন করে গোবর্ধন পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে।

রূপ সনাতনের সঙ্গে দেখা হতেই তারা তাকে আটকে রাখল, মরতে দিল না। বললে, তার চেয়ে আমাদের কাছে প্রভুর লীলা-বিহার বর্ণনা করো। এত দিন তাঁর সঙ্গ করলে, শোনাও তাঁর সে-সব চিত্তচমৎকার কাহিনী।

তাই ভালো। তাই বলি।

অন্নজল ত্যাগ করল রঘুনাথ, ত্যাগ করল অন্যকথন। আর গ্রাম্যবার্তা নয়, শুধু গৌরবার্তা। তিন ছটাক মাঠাই তার সারা দিনের আহার। প্রত্যহ নাম করে এক লক্ষ, দণ্ডবৎ এক হাজার। আর বৈষ্ণবদের উদ্দেশে দুই সহস্র প্রণাম। আর রাত্রিদিন রাধা-কৃষ্ণের মানসসেবা। রাধাকুণ্ডে তিনসন্ধ্যা স্নান, আর ব্রজবাসী বৈষ্ণব দেখলেই আলিঙ্গন। দিবারাত্রির আট প্রহরের মধ্যেই সাড়ে সাত প্রহরই ভজন আর চারদণ্ড মাত্র নিদ্রা—তা-ও সব দিন নয়। যেদিন লীলাবেশে মত্ত থাকে সেদিন তার ঘুমই ঘুম যায়।

কিন্তু এবার কে এল নীলাচলে ?

এ যে কাশীর সেই বল্লভ ভট্ট। কী চায় ? কী বলে ?

১০

বল্লভ প্রভুর চরণবন্দনা করলে।

আর প্রভু তাকে ভাগবতবুদ্ধিতে অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তজ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন।

বল্লভ বললে, 'কত দিন থেকে বাসনা তোমাকে আবার দেখি। জগন্নাথ সে বাসনা পূর্ণ করলেন। সন্দেহ কী, তুমিই ব্রজেন্দ্রনন্দন। তোমাকে স্মরণ করলে লোকে পবিত্র হয়। দর্শন করলে যে হবে তা বলাই বাহুল্য। তুমিই সংসারে কৃষ্ণনাম আনলে। কৃষ্ণের নিজের শক্তি ছাড়া কার সাধ্য তার নাম প্রবর্তন করে! সুতরাং তুমি কৃষ্ণশক্তির আধার। তোমাকে যে দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমিক হয়ে ওঠে। কৃষ্ণশক্তি ছাড়া কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ হয় না। একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমদানে সমর্থ, আর কেউ নয়। সুতরাং তুমি যখন সকলের মনে কৃষ্ণপ্রেমের তুফান তুলছ তখন তুমি কৃষ্ণছাড়া আর কী।'

'কলিকালে ধর্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনে নহে তার প্রবর্তন॥
তাহা প্রবর্তাইলে তুমি, এই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলে কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা—শাস্ত্রের প্রমাণে॥'

প্রভু বললেন, 'তোমার ভুল হচ্ছে, আমি কৃষ্ণভক্ত নই, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী। যদি কৃষ্ণভক্ত কেউ থাকে সে হচ্ছে অদ্বৈত আচার্য। তাঁর সঙ্গ করেই আমার মন নির্মল হয়েছে। তাঁর কৃপার এমন শক্তি যে, ম্লেচ্ছকেও কৃষ্ণভক্ত করে দিতে পারে। আর নিত্যানন্দের কথা কী বলব? সে সাক্ষাৎ ঈশ্বর, সর্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা। ভক্তির কথা সে বলতে পারে। আর বলতে পারে সার্বভৌম। ষড়্দর্শনে সে পণ্ডিত, আবার সে ভাগবতোত্তম। সেই আমাকে বোঝাল কৃষ্ণভক্তিই সমস্ত সাধনের সার কথা। আরেক ভক্ত রামানন্দ। সে বোঝাল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান আর প্রেমভক্তিই জীবের পুরুষার্থশিরোমণি। আর এই প্রেমভক্তি শুধু রাগমার্গে। সে আমাকে রাগমার্গের ভজন শেখালে। কিন্তু শিখলাম কই?'

বল্লভ ভট্ট সবিস্ময়ে তাকাল প্রভুর দিকে। মনে মনে বললে, 'শেখবার আর বাকি কী।'

'রামানন্দই বোঝালে,' বললেন প্রভু, 'ঐশ্বর্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং লক্ষ্মী বক্ষোবিলাসিনী হয়েও ব্যর্থ হল। সে তো গয়লার মেয়ে নয় সে যে সম্রাজ্ঞী। কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ প্রেমছাড়া কৃষ্ণকে বাঁধবে কে? শুধু পেয়েছিল যশোদা, পেয়েছিল তার সাথির দল।

'শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন॥'

ঐশ্বর্য দেখলেও, যে শুদ্ধ ভক্ত, সে ঐশ্বর্যে আকৃষ্ট হয় না। তার কেবলা-প্রীতি। আর এই কেবলা-প্রীতিতেই কৃষ্ণ বশীভূত। এই সব নিরৈশ্বর্য প্রেমের কথা রামানন্দ শিখিয়েছে আমাকে। রামানন্দ তো শুধু শাস্ত্রজ্ঞ নয়, সে রসবেত্তা।'

বল্লভ ভট্ট মাথা হেঁট করল। এ বুঝি তারই প্রতি ইঙ্গিত। এর অর্থ বোধ হয় এই যে সে শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানে কিছু হবার নয়, চাই রসানুভূতি। রামানন্দ জ্ঞানে-রসে-তত্ত্বে-প্রেমে অনর্গল।

'আর দামোদর স্বরূপ? সে তো মূর্তিমান প্রেমরস।' প্রভু বললেন বিহ্বলস্বরে, 'ব্রজের মধুর রসের সংবাদ আমি দামোদরের কাছেই জেনেছি। জেনেছি কাকে বলে গোপীপ্রেম। কামগন্ধের লেশমাত্র নেই, কৃষ্ণসুখই একমাত্র উদ্দেশ্য আর কৃষ্ণকে মাননীয় বলতে মর্যাদাবান বলতে তাদের অসম্মতি। এই তো গোপীপ্রেমের লক্ষণ। ভালোবাসার ভৎ'সনা করতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত। এই সর্বাতিশায়ী প্রেমের কথা দামোদর আমাকে বলেছে।'

বল্লভ মুগ্ধের মত তাকাল প্রভুর দিকে।

'আর হরিদাস আমাকে নাম শিখিয়েছে। ভাগবতপ্রধান হরিদাস, দিনে তিন লক্ষ নাম করে। তার প্রসাদেই আমি জানলাম নামের কী মহিমা! তারপরে বৈষ্ণবভক্তের দল—আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি, গদাধর, জগদানন্দ, দামোদর, বক্রেশ্বর, শঙ্কর, কাশীশ্বর, বাসুদেব, মুরারি। এরাই জগতে অকুণ্ঠকণ্ঠে নাম প্রচার করল, এদের থেকেই শিখলাম কৃষ্ণভক্তি।'

বল্লভ ভট্টের মনে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ছিল, বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত আমিই ভালো জানি, ভাগবতের অর্থও আমার মত কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না। নিজের বিদ্যাবত্তা প্রচার করতেই বোধ হয় তার এখানে আসা। প্রভু তা টের পেয়েছেন। কই তাকে তো কোনো বিষয়েই পারঙ্গম বলে তিনি স্বীকার করছেন না। তাঁর পার্ষদদেরই গৌরব দিচ্ছেন। যেন বলছেন, আমি কোন ছার, আমার থেকেও আমার পার্ষদেরা বেশি অভিজ্ঞ, বেশি রসগুণাকর।

'আপনার সে সব বৈষ্ণবেরা থাকে কোথায়?' ক্ষুব্ধস্বরে জিজ্ঞেস করল বল্লভ।

'এখানে যখন এসেছ তখন দেখতে পাবে।'

দেখা পেতে দেরি হল না। প্রভু সকাশে এসে পড়ল বৈষ্ণবেরা। কী তাদের দেহজ্যোতি, বল্লভ বিশীর্ণ হয়ে গেল, ওদের কাছে সে সূর্যের কাছে খদ্যোতের মত।

প্রভু সকলের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তবে প্রসাদ লাগাও।

মহাপ্রসাদের আয়োজন করল বল্লভ। গৌড়ভক্তেরা অঙ্গনে বসল সারি-সারি। প্রভুর এক পাশে অদ্বৈত আরেক পাশে নিত্যানন্দ। বল্লভ নিজেই পরিবেশন করতে লাগল। চতুর্দিকে উঠল হরিধ্বনি। নামানন্দের গর্জন।

রথযাত্রার দিন প্রভু কীর্তন করলেন, আর কীর্তনের সঙ্গে সে কী ভুবনভুলানো নৃত্য! সে কী প্রেমোদয়। বল্লভের মনে আর সন্দেহ রইল না, ইনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।

যাত্রা-অন্তে বল্লভ প্রভুর কাছে গিয়ে নিবেদন করল, 'ভাগবতের কিছু টীকা লিখেছি, আপনাকে শোনাতে চাই।'

প্রভু বললেন, 'ভাগবতের অর্থ বুঝি আমার এমন সামর্থ্য নেই। তা ছাড়া আমি অধিকারীও নই যে, ভাগবতের অর্থ শুনি। আমি শুধু কৃষ্ণনাম নিই, তা-ও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যা পূরণ হয় না।'

সর্বজ্ঞ প্রভু বুঝতে পেরেছিলেন বল্লভের টীকা সারশূন্য। বিদ্যা-বুদ্ধির জোরেই সে টীকা লিখেছে, ভজনান্বিত ভক্তির থেকে নয়। ভক্তিতে চিত্ত যদি নির্মল না হয় তা হলে ভাগবতের অর্থ তাতে স্ফুরিত হবে কী করে?

'আমার টীকায় আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ করেছি।' বল্লভ অনুরোধ করল, 'তুমি একবার শোনো দয়া করে।'

প্রভু বললেন দৃঢ়স্বরে, 'আমি কৃষ্ণনামের বহু অর্থ মানি না। এক অর্থ শুধু মানি। সে হচ্ছে শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন। আর যদি কোনো অর্থ থাকেও তাতে আমার দরকার নেই।'

বিমনা হয়ে বল্লভ ঘরে ফিরে গেল। অভিমান পুঞ্জিত হয়ে রইল হৃদয়ে।

যেহেতু প্রভু উপেক্ষা করেছেন, নীলাচলজন কেউ বল্লভের টীকা শুনতে রাজী হল না।

লজ্জিত ভট্ট দুঃখিত হয়ে গদাধর পণ্ডিতের শরণ নিল। বললে, 'তুমি কৃপা করে আমাকে বাঁচাও। শোনো আমার নামব্যাখ্যা। অন্তত তুমি যদি শোনো তা হলেও আমার এ কলঙ্কের স্খালন হয়।'

গদাধর সঙ্কটে পড়ল। কেউ যখন শুনল না, আমি শুনি কী করে?

কোনো মতামত পাবার আগে বল্লভ নিজের থেকেই পড়তে সুরু করল। দেখি কেমন না শোনো! গায়ের জোরে শোনাব।

গদাধরের সঙ্কট গুরুতর হল। অথচ শালীনতার খাতিরে বাধাও দিতে পারল না বল্লভকে। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে কৃষ্ণ, রক্ষা করো। প্রভুকে আমার ভয় নেই, তিনি, অন্তর্যামী, তিনি বুঝবেন আমার অবস্থা—আমি শুনতে না চাইলেও আমাকে জোর করে শোনাচ্ছে, আমার অনিচ্ছাকে গ্রাহ্য করছে না। আমি বিনয়ী বলেই চুপচাপ আছি।

কেন চুপচাপ থাকবে? পার্ষদরা ক্ষমা করল না। কেন তুমি নিষেধ করবে না? নিষেধ করতে না পারো, স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে কী বাধা ছিল? এ কেমনতরো বিনয়, কেমনতরো চক্ষুলজ্জা?

গদাধর জানে এ তাদের প্রণয়রোষ, সত্যিকারের ক্রোধ নয়। তারা ছাড়া আর কে বেশি জানে গৌরের প্রতি তার কী দারুণ ভালোবাসা!

বল্লভ তবু নিরস্ত হয় না। শুধু শাস্ত্রজ্ঞানই বা মন্দ কী! বেশ, সেই শাস্ত্রজ্ঞানেরই বিচার হোক। তোমরাও তো সকলেই পণ্ডিত, বৈয়াকরণিক। এস, বিদ্যাবিচার করা যাক। ভক্তির কথা পরে দেখা যাবে, আগে যুক্তির কথা হোক।

পার্ষদদের তর্কে আহ্বান করল বল্লভ। দেখি তোমাদের শাস্ত্র-জ্ঞানের দৌড়।

অদ্বৈত আচার্যকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করল: 'জীব তো কৃষ্ণের

প্রকৃতি বা স্ত্রী। তাই জীব কৃষ্ণকে পতি বলে মানে। কী, যথার্থ তো ?'

'যথার্থ।' বললে অদ্বৈত।

'যে স্ত্রী পতিব্রতা সে পতির নাম নেয় না। তোমরা কোন ধর্মে তবে কৃষ্ণের নাম নাও ?'

অদ্বৈত বললে, 'তোমার সামনে যে মূর্তিমান ধর্ম বসে আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করো।' প্রভুর দিকে ইঙ্গিত করল: 'তিনিই সমাধান করে দেবেন।'

প্রভু বললেন, 'পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী-আজ্ঞা পালন করা। এখানে স্ত্রীকে স্বামী আদেশ করেছে, নিরন্তর আমার নাম নাও। পতিব্রতা স্ত্রী সেই আদেশ পালন করছে, লঙ্ঘন করছে না। নাম নিচ্ছে আর তার ফল পাচ্ছে। ফল কী ? ফল হচ্ছে প্রেমফল।'

বল্লভের মুখে আর কথা নেই। দুঃখিত হয়ে সে আবার বাড়ি ফিরল। প্রত্যহই আমি পরাজিত হই, এমন কি একদিনও হবে না যে আমার কথাই প্রবল হবে!

আরেক দিন গেল বল্লভ। দেখি এবার আমাকে কী করে ঠেকায়।

কে না জানে শ্রীধর স্বামীই ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার, ভক্তিপ্রেমের প্রচারক। প্রভুও তাই স্বীকার করেন, তাঁর পার্ষদরাও তদ্রূপ। সেই টীকা আমি খণ্ডন করেছি, যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগ করে দেখিয়েছি তাঁর সিদ্ধান্তে দোষ হয়েছে। বেশ তো, বোসো স্থির হয়ে, শোনাচ্ছি এখুনি। তারপর একবার যখন আমার ব্যাখ্যা স্থাপিত হবে তখন দেখব তোমরা কী বলো। আমার প্রাধান্য তখন স্বীকার না করে যাও কোথায় ?

'আমি ভাগবতে শ্রীধর ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছি।' গর্বভরে বললে বল্লভ, 'দেখিয়ে দিচ্ছি তাঁর ব্যাখ্যায় পূর্বাপর সামঞ্জস্য নেই। আমি স্বামী মানি না।'

'ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখান বচন॥
সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি।
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি॥'

প্রভু উপেক্ষার হাসি হাসলেন। বললেন, 'যে স্বামী মানে না, তাকে তো বেশ্যার মধ্যেই গণনা করা হয়।'

'প্রভু হাসি কহে—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥'

অথাৎ যে শ্রীধর স্বামীর টীকা মানে না শাস্ত্রার্থের দিক থেকে সে ব্যভিচারী।

বল্লভ স্তব্ধ হয়ে গেল।

তার গর্ব চূর্ণ করে দিলেন প্রভু। মঙ্গলে-মাধুর্যে জগতের শোধন করবেন বলেই গৌর অবতীর্ণ। তাই নানা অবজ্ঞা-উপেক্ষায় বল্লভের অভিমান নাশ করলেন। গিরি গোবর্ধন ধারণ করে কৃষ্ণও একদিন ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করেছিলেন। গর্বান্ধ জীব প্রথমে বুঝতে পারে না, পরে যখন অন্ধতা ঘুচে যায়, চোখ খোলে, তখন বোঝে কোথায় তার মঙ্গল। বোঝে আঘাতই প্রভুর হিতস্পর্শ।

বল্লভ বুঝল। আগে প্রয়াগে প্রভু আমাকে কত কৃপা করলেন, এখন আমার প্রতি কেন তাঁর বৈরূপ্য? প্রভুর সভায় বিদ্যা বিচার করবো, আমি জয়ী হবো, এই গর্বেই আমি ভরপুর ছিলাম, আমার প্রতি প্রভুর যে উপেক্ষা তা শুধু এই ঔদ্ধত্যকে শাসন করবার জন্যে। সকলের হিত করাই ঈশ্বরের প্রভাব, আমি মূর্খ, তাই আমি তাঁর হিতৈষণাকে সম্মান করি নি। ঠিক হয়েছে, আমাকে তিনি অপমান করেছেন।

'অপমান করি সর্ব গর্ব খণ্ডাইলা।'

এই অপমানই আমার মঙ্গল মহৌষধ।

প্রভুর চরণে এসে পড়ল বল্লভ। বললে, 'আমি অজ্ঞ, তোমার

সামনে আমি পাণ্ডিত্য প্রকট করতে চেয়েছিলাম। তোমার কৃপাঞ্জনে আমার গর্বান্ধতার মোচন হল। কৃপা করে আমার মাথায় তোমার চরণ রাখো।'

প্রভু কোমলার্দ্রনয়নে দৃষ্টিপাত করলেন। বললেন, 'তুমি একাধারে পণ্ডিত ও মহাভাগবত। পাণ্ডিত্য আর ভাগবততা এই দুই গুণ যার মধ্যে বর্তমান, সে গর্বিত হয় কী করে? শ্রীধর স্বামীর টীকার আনুগত্য স্বীকার করেই ভাগবত-ব্যাখ্যা সম্ভব। তুমি তাঁকে নিন্দা কোরো না, অতিক্রমও কোরো না। অভিমান ছেড়ে কৃষ্ণভজন করো, নিরপরাধে করো কৃষ্ণকীর্তন।'

'যদি আমার উপর প্রসন্ন হলে', বললে বল্লভ, 'তবে আরেক দিন আমার নিমন্ত্রণ নাও। স্বগণসহ এস আমার কুটিরে।'

তাই গেলেন প্রভু।

প্রণয়স্থলে গদাধরের প্রতি রোষ প্রকাশ করলেন। কেন সে সেদিন বল্লভ ভট্টের টীকা শুনেছিল? ভেবেছিলেন উত্তরে গদাধরও বোধ হয় রোষ প্রকাশ করবে। বলবে, আমি কী করব, জোর করে শোনালে আমার কী করবার আছে? কিন্তু গদাধরের রুক্মিণী-প্রভাব, সরল প্রভাব, তার রোষ না হয়ে ত্রাস হল।

রুক্মিণীরও তাই হয়েছিল। কৃষ্ণ বললে, 'তুমি কী ভেবে যে আমাকে মনোনীত করলে বুঝতে পাচ্ছি না। কত বিভূতিশালী রাজা তোমাকে প্রার্থনা করেছিল—শিশুপাল, শাল্ব আর জরাসন্ধ। কত তারা ধনী-মানী, রূপে-বলে সুসমৃদ্ধ। আমি তো নিতান্ত গুণহীন। রাজাদের ভয়ে আমি সমুদ্রে আশ্রয় নিয়েছি, বল-বুদ্ধি বলতে আমার কিছু নেই। আমি নিষ্কিঞ্চনেরও নিষ্কিঞ্চন। তুমি রূপোত্তমা, উত্তমে-অধমে মিত্রতা হয় না, পরিণয় তো দূরের কথা। বিদর্ভনন্দিনী, তুমি দূরদর্শিনী নও, তাই আমার মতন অভাজনকে বরণ করছ। আমি গৃহে-দেহে উদাসীন, স্ত্রী-পুত্রে আমার কামনা নেই, আমি আত্মলাভেই পরিপূর্ণ। সুতরাং কোনো

ক্ষত্রিয় বীরকে ভজনা করো। আমাকে ভজনা করলে তোমার সুখ কোথায় ?'

রুক্মিণী কৃষ্ণের পরিহাস বুঝল না। সে ভয় পেল। তার হাতের বালা শিথিল হল, তার হাতের ব্যজন খসে পড়ল মাটিতে।

বালগোপালের উপাসনা করত বল্লভ, গদাধরের সঙ্গপ্রভাবে কিশোর-গোপালের উপাসনা করতে ইচ্ছে হল। গদাধরকে বললে, 'আমাকে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা দিন।'

গদাধর বললে, 'আমি পরতন্ত্র, প্রভুর অধীন। আমার প্রভু গৌরচন্দ্রের আদেশ ছাড়া দীক্ষা দিতে পারব না। তুমি যে আমার এখানে আস তাইতেই তিনি অসন্তোষ দেখান।'

স্বরূপ বললে, 'তোমার প্রতি প্রভুর যে রোষ সেটা কৃত্রিম। শুধু তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই তাঁর এই পরিহাস। তিনি দেখতে চান তুমিও ক্রুদ্ধ হও কি না।'

'আমি তাঁর সঙ্গে বিবাদ করব ? তাঁকে দেখাব আমার ক্রোধ ?' গদাধর বিমর্ষ হয়ে গেল। বললে, 'তিনি যা দেন, প্রেম বা উপেক্ষা, ক্রোধ বা অনুরাগ, সবই শিরোধার্য করি। তিনি সর্বজ্ঞের শিরোমণি, তিনি জানেন আমার অন্তরে কী আছে।'

শুধু এতে হল না, গদাধর কাঁদতে-কাঁদতে প্রভুর চরণে গিয়ে পড়ল।

প্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'আমি তোমাকে খেপাতে চেষ্টা করলাম, তা, তুমি একটুও খেপলে না। কিছু বললেও না রাগ করে। সরল ভাবেই কিনে নিলে আমাকে।'

গদাধরের ভাবমুদ্রা প্রভুর বড়ই রুচিকর। প্রভুই আমার জীবনসর্বস্ব, গদাধরের ভাবে-ব্যবহারে তাই পরিস্ফুট। তারই জন্যে প্রভুর এক নাম 'গদাধর-প্রাণনাথ'। আরেক নাম 'গদাইয়ের গৌরাঙ্গ'।

এক ভুবনপাবনী গঙ্গা থেকে যেমন শত ধারা প্রবাহিত, তেমনি প্রভুর এক লীলায় বহুতত্ত্বের প্রকাশ। সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা, দৃঢ়প্রেমমুদ্রা, অভিমান-প্রক্ষালন। বল্লভ যখন জোর করে তার টীকা পড়ছে, সৌজন্যবশতই গদাধর তাকে নিরস্ত করতে পারে নি। আর ব্রাহ্মণের প্রতি যথার্থ মর্যাদাবোধের থেকেই এই সৌজন্যের উৎপত্তি। নিষেধ করলেই বরং ব্রাহ্মণকে অসম্মান করা হত। তৃতীয়ত প্রভুর উপেক্ষাতেও গদাধরের প্রেম ম্লান হল না, শিথিল হল না। আর সবচেয়ে বড় শিক্ষা, উপেক্ষাতেই বল্লভের অভিমান-পঙ্ক ধৌত হয়ে গেল।

বাইরের উপেক্ষাতে কী এসে যায় যদি প্রভুর অন্তরে অনুগ্রহ থাকে।

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা কে বোঝে? গৌরে যার দৃঢ় ভক্তি তার কাছেই সমস্ত অর্থ পরিচ্ছন্ন।

প্রভুর সম্মতি মিলে গেল। বল্লভ গদাধরের কাছ থেকে কিশোর গোপালের মন্ত্র নিলে।

এ আবার কে এল নীলাচলে?

এ যে দেখি রামচন্দ্র পুরী। পরমানন্দ পুরী তো আগেই এসেছে, সে-ও দেখি এখন উপস্থিত।

রামচন্দ্র আর পরমানন্দ দু'জনেই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। রামচন্দ্র আগেই দীক্ষা নিয়েছিল বলে জ্যেষ্ঠবুদ্ধিতে পরমানন্দ তাকে প্রণাম করলে। প্রভুও তাকে দণ্ডবৎ করলেন।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ। তিনজনে তারপরে কতক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করলে, কৃষ্ণকথার আলাপন করলে।

জগদানন্দ এসে নিমন্ত্রণ করলে। জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে এল, প্রচুর প্রসাদ। এদেরকে নিন্দা করবার উদ্দেশে রামচন্দ্র অত্যধিক ভোজন করলে। অবশেষ-প্রসাদ জগদানন্দকে খেতে দিলে, জগদানন্দও খেল পেট ভরে।

তারপরে রামচন্দ্র নিন্দা সুরু করলে—অতিভোজনের নিন্দা। শুনেছি চৈতন্যের লোকেরা বেশি খায়, তাই অতিথি-সন্ন্যাসীদেরও বেশি খাওয়ায়। স্বচক্ষে তাই দেখলাম এখন। বেশি খেয়ে ও বেশি খাইয়ে নিজের ও অন্যের দু'জনেরই ধর্মনাশ করে।

যে বেশি খায় তার বৈরাগ্য কোথায়? তাতে বৈরাগ্যের আভাসও নেই। বেশি খেলে শরীরে অবসাদ আসে, ব্যাধি আসে। আর দেহ যদি অবসন্ন বা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে তা হলে বৈরাগ্য হবে কী দিয়ে?

'বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম সঙ্কীর্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ।'

নিজে আগ্রহ করে অত্যধিক খেল, অত্যধিক খাওয়াল, দোষ চাপাল জগদানন্দের উপর।

এমনি নিন্দক-স্বভাব রামচন্দ্রের।

মাধবেন্দ্রের অন্তকালে শিষ্য রামচন্দ্র এসেছিল। 'মথুরা পেলাম না—মথুরা কোথায়' বলে আক্ষেপ করছেন মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র তাঁকে উপদেশ করতে লাগল। শিষ্য হয়ে গুরুকে উপদেশ—কত বড় ঔদ্ধত্য। রামচন্দ্র ও-সব চিন্তা করেও দেখল না, বললে, 'তুমি কেন কাঁদছ? তুমি তো নিজেই পূর্ণব্রহ্মানন্দ, তোমার কিসের অভাব? যে চিদব্রহ্ম সে কি কখনো কাঁদে?'

শুনে মাধবেন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ভগবানের দাস, ভক্ত, তাঁকে কি-না অভেদ জ্ঞান করতে বলছে? 'দূর হ পাপিষ্ঠ।' মাধবেন্দ্র তিরস্কার করে উঠলেন: 'কৃষ্ণ পেলাম না, মথুরা পেলাম না বলে আমি আপন দুঃখে মরছি, এ কোথা থেকে জ্বালা বাড়াতে এল? আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে এসেছে। আমার দৃষ্টির থেকে বার হয়ে যা।'

রামচন্দ্রের দুর্বাসনা জাগল। আমি ব্রহ্ম—এই জ্ঞান লাভ করব তবে ছাড়ব। শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেল। কৃষ্ণের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখল না। আর অবিমিশ্র নিন্দুক হয়ে উঠল।

আরেক শিষ্য ঈশ্বরপুরীকে দেখ। অহোরাত্র মাধবেন্দ্রের সেবা করছে, মলমূত্র মার্জন করছে স্বহস্তে। নিরন্তর কৃষ্ণ-কথা বলছে, কৃষ্ণ-শ্লোক পড়ছে, কৃষ্ণ-স্মরণ-সমুদ্রে নিমগ্ন করে রাখছে। পরম পরিতুষ্ট হয়ে মাধবেন্দ্র তাকে বর দিলে, 'কৃষ্ণে তোমার প্রেমধন হোক।'

মহতের নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কী ফল তাই রামে-ঈশ্বরে দেখালেন মাধবেন্দ্র। রামচন্দ্র নিন্দার সাগর আর ঈশ্বর প্রেমের সাগর হয়ে উঠল।

পৃথিবীতে প্রথম প্রেমাঙ্কুর রোপণ করে চলে গেলেন মাধবেন্দ্র। সে অঙ্কুর পুষ্ট হল ঈশ্বর-পুরীরূপে। তারপরে ঈশ্বরপুরী থেকে দীক্ষা নিয়ে চৈতন্য ঠাকুর হয়ে দাঁড়ালেন পরিণত বৃক্ষ।

আর রামচন্দ্র কী করছে? সে শুধু পরের ছিদ্র সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। এদিকে নিজের থাকা-খাওয়া সম্বন্ধে স্থিরতা নেই, সন্ধান করে ফিরছে কে কোথায় থাকে বা কী খায়? বিশেষ করে প্রভুর স্থিতি-গতি ভোজন-ভ্রমণই তার লক্ষ্যের বস্তু।

আর কিছু দোষ পেল না, একদিন প্রাতে গিয়ে দেখল প্রভুর ঘরে পিঁপড়ে হাঁটছে। আর যায় কোথা! রামচন্দ্র তখুনি সিদ্ধান্ত করল, কাল রাত্রে এ-বাড়িতে মিষ্টান্ন আনা হয়েছিল, তাই এই পিপীলিকার সার। মিষ্টান্ন আর কার জন্যে আনা হবে? নিশ্চয়ই কৃষ্ণচৈতন্যের জন্যে। কৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খাচ্ছে! মিষ্টান্ন খেলে ইন্দ্রিয় দমন হবে কী করে?

ঢাক পিটতে লাগল রামচন্দ্র। সন্ন্যাসী হয়েও মিষ্টান্ন খায়!

নিন্দে করে বেড়াচ্ছে, আবার কী নির্লজ্জ, নিত্য আসছে প্রভুর কাছে। আর প্রভু তাকে গুরুবুদ্ধিতে সম্ভ্রমসম্মান করছেন। প্রভু জানেন রামের কী ব্যবহার, তবু তাকে আদর করতে তাঁর কার্পণ্য নেই।

একদিন তো রাম মুখের উপর সরাসরিই বলে বসল। ঘরে

যখন পিঁপড়ে হাঁটে তখন নিশ্চয়ই তুমি মিষ্টান্ন খাও। বিরক্ত সন্ন্যাসীর এ-কী ইন্দ্রিয়লালসা!

পিঁপড়ে স্বভাবতই যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, তা নিয়ে আবার তর্ক কী। আর যে নিন্দা ভিত্তিহীন তাকে কেই বা মূল্য দেয়? কিন্তু, না, তবুও, প্রভুর মন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। গোবিন্দকে ডাকিয়ে বললেন, 'আজ থেকে আমার ভিক্ষে হবে পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি মাত্র, আর ব্যঞ্জন পাঁচ গণ্ডার। এর একতিল বেশি আনবে না। বেশি এনেছ দেখলেই আমি নীলাচল ছেড়ে চলে যাব।'

শুনে বৈষ্ণবেরা সকলে মাথায় হাত দিয়ে বসল। পিণ্ডাভোগ তো নিতান্ত ক্ষুদ্র অন্নের পাত্র। এত অল্পে প্রভুর জীবনধারণ হবে কী করে? সকলে রামচন্দ্র পুরীকে তিরস্কার করতে লাগল। কিন্তু উপায় কী?

তারপরে বরাদ্দ যেটুকু আনা হল, তারও অর্ধেক মাত্র প্রভু গ্রহণ করলেন। বাকি অর্ধেক গোবিন্দের জন্যে।

প্রভু অর্ধাশনে রইলেন। গোবিন্দও অর্ধাশনে। ভক্তবৃন্দ বললে, আমরাও তবে কোন সুখে পেট ভরে খাই!

গোবিন্দ আর কাশীশ্বরকে প্রভু বললেন, 'তোমরা অন্যত্র ভিক্ষে করে খিদে মেটাও।'

'তোমাকে ক্ষীণ দেখছি, অর্ধাশনে আছ না কি?' রামচন্দ্র প্রভুসকাশে এসে বিদ্রূপ করল: 'অর্ধাশনে থাকাও সন্ন্যাসীর ধর্ম নয়। অর্ধাশনে থাকলে শুষ্কবৈরাগ্য দেখা দেয় আর শুষ্কবৈরাগ্য তো ভজনে বিঘ্ন ঘটায়। যথাযোগ্য আহার না পেলে শরীর রক্ষা হবে কী করে, ক্ষুধারই বা কিসে নিবৃত্তি হবে? আহারে-বিহারে নিদ্রায়-জাগরণে সমস্ত কর্মচেষ্টায় নিয়মিত হওয়াই তো যোগীর কাজ।'

'আমি অজ্ঞ।' বললেন প্রভু, 'আপনি যে আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তাই আমি ভাগ্য বলে মানছি।'

পরমানন্দ পুরী এসে বসল। বললে, 'রামচন্দ্রের কথায় আপনি

অন্ন ছাড়বেন কেন? ও নিন্দুক, ওর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান নেই। খাইয়ে ও খাওয়ার নিন্দে করে, খেয়ে করে খাওয়ানোর নিন্দে। গুণের মধ্যে মিথ্যে করে দোষের আরোপ করে।'

'তোমরা কেন তাঁর দোষ ধরছ?' বললেন প্রভু, 'যতি হয়ে জিহ্বালম্পট হওয়া অন্যায়। প্রাণধারণের জন্যে যেটুকু দরকার সেটুকু মাত্রই সে গ্রহণ করে।'

'হ্যাঁ, তাই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।' বললে ভক্তদল, 'রামের শাসনে তুমি যে সঙ্কোচ ঘটিয়েছ তা দেহরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়।'

ভক্তেরা পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিল। আমাদের বাড়িতে-বাড়িতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করছি, আমরা তোমার ভক্ত, আমাদের ইচ্ছামতই তোমাকে খেতে হবে! ভক্তদের আনন্দিত করতেই তো তোমার অবতরণ।

৭১

রামচন্দ্র নীলাচল ছেড়ে চলে গেল।

এদিকে গোপীনাথ সম্বন্ধে ঘোর দুঃসংবাদ এসে পৌঁছুল। রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তাকে 'চাঙ্গে' চড়িয়েছে।

তার মানেই গোপীনাথকে রাজাদেশে হত্যা করা হবে।

'চাঙ্গে চড়ানো' মানে মঞ্চে তোলা। মঞ্চের নিচে ধারালো খড়্গ পাতা আছে, তার উপরে গোপীনাথকে ফেলা হবে মঞ্চের থেকে। গোপীনাথ দু'-টুকরো হয়ে যাবে।

রায়-ভবানন্দের ছেলে আর রায়-রামানন্দের ভাই, গোপীনাথ কী অপরাধ করেছে?

প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠা প্রদেশের শাসনকর্তা গোপীনাথ।

প্রজাদের কাছ থেকে যথারীতি খাজনা আদায় করছে, কিন্তু রাজার প্রাপ্য কর ষোল আনা জমা দিচ্ছে না। বাকি পড়ে-পড়ে দু'লক্ষ কাহনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হুকুম হলো বকেয়া বাকি শোধ করে দাও। কোত্থেকে দেবে? গোপীনাথ বললে, নগদ নেই, যদি সময় পাই জিনিসপত্র বেচে দিয়ে দেখতে পারি। দশ-বারোটা ঘোড়া আছে, আপাতত তাই নিতে পারো।

তাই সই, কিন্তু ঘোড়াগুলোর দাম কত হবে?

রাজপুত্র নিজে এল দাম কষতে। তার মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলতে ঘাড় বাঁকায়। থেকে-থেকে মুখ উঁচু করে।

সে একটা অকথ্য দাম বললে।

'এত কম?' দারুণ বিরক্ত হল গোপীনাথ। ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললে, 'আমার ঘোড়া তো ঘাড় বাঁকায় না, ঊর্ধ্বমুখেও থাকে না। তাই মাপ করুন, পারব না বেচতে।'

রাজপুত্র ভীষণ ক্রুদ্ধ হল। রাজার কাছে গিয়ে লাগাল অনেকখানি করে।

'ছল করে টাকা দিচ্ছে না। রাজকোষের প্রাপ্য অর্থ আত্মসাৎ করেছে।' বললে রাজপুত্র, 'অনুমতি করুন ব্যাটাকে চাঙ্গে চড়াই।'

রাজা বললে, 'প্রাপ্য আদায় করতে যা ভালো মনে করো তাই করো।'

আর কথা নেই, মঞ্চে তুলেছে গোপীনাথকে। মঞ্চের নীচে খড়্গ পাতা।

সবাই প্রভুকে ধরল, 'এখন আপনি যদি রক্ষা করেন তবেই গোপীনাথ বাঁচে।'

'রাজার ন্যায্য প্রাপ্য দেয় নি, রাজা যদি শাস্তি দেয় তা হলে তাকে মন্দ বলতে পারো না।' প্রণয়রোষে বললেন প্রভু, 'রাজার জিনিস নিজে খেল, নৃত্য-গীতে অপব্যয় করল, এ তার কেমন দায়িত্ববোধ? একে তোমরা সমর্থন করো কী করে?'

এমন সময় একটা লোক ছুটতে-ছুটতে এসে বললে, 'শুধু গোপীনাথকে নয়, তার ভাই বাণীনাথকেও চাঙ্গে তুলেছে।'

প্রভু উদাসীন রইলেন। বললেন, 'রাজা সর্তমত তার নিজের প্রাপ্য আদায় করে নেবে, আমি নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী, তাতে আমার কী করবার আছে?'

স্বরূপ দামোদর ও অন্যান্য পার্ষদেরা কাকুতি করে বললে, 'রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠীবর্গ সকলেই আপনার অনুগত। তাদের এই সঙ্কটে আপনার এ ঔদাস্য উচিত নয়।'

'তবে তোমরা কি বলতে চাও আমি রাজার কাছে গিয়ে গোপীনাথের জন্য দয়া ভিক্ষা করব।' ক্রুদ্ধ হলেন প্রভু: 'আঁচল পেতে কাহন মেগে নেব? আর রাজার কাছে সন্ন্যাসীর দাম কী? পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসীর প্রার্থনায় দু'লক্ষ কাহন ছেড়ে দেবে?'

আরো একজন ছুটে এল।

'এক্ষুনি—এক্ষুনি গোপীনাথকে খড়োর উপর ছুঁড়ে ফেলবে। প্রভু, তাকে বাঁচান।'

প্রভু বললেন, 'আমি ভিক্ষুক, আমার থেকে কিছু হবার নয়। তবে যদি তাকে বাঁচাবার ইচ্ছে তোমাদের সত্যিই হয়ে থাকে, তবে তোমরা সকলে মিলে জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করো। জগন্নাথই ইচ্ছাময়, করণ-অকরণের নিয়ন্তা তিনি।'

'ঈশ্বর জগন্নাথ—যাঁর হাতে সর্ব অর্থ।
কর্তুমকর্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥'

তক্ষুনি জগন্নাথ মন্দিরের সেবক হরিচন্দন পাত্র এসে হাজির। সে নিজের থেকেই চলল রাজার কাছে। গিয়ে বললে, 'গোপীনাথ তোমার সেবক, তার প্রাণদণ্ড নেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। প্রাণ নিলে কি দেনা শোধ হয়ে যাবে? রাজকোষের ঘাটতি মিটবে? বরং ন্যায্য দামে ঘোড়া কিনে নাও, দেখ কতটা উঠে এল। বাকিটা না হয় আস্তে আস্তে দিয়ে দেবে। প্রাণ নিলে সুরাহাটা কোথায়?'

'সত্যি প্রাণ নিয়ে কী হবে?' রাজাও যুক্তির পথে এল: 'আমার ধনের প্রয়োজন। বেশ তো যাতে প্রাপ্যটা পাই তুমি তার ব্যবস্থা করো।'

হরিচন্দন ছুটে এল রাজপুত্রের কাছে। রাজার কথাটা বললে বুঝিয়ে। বেশ তবে তাই হোক, যথার্থ মূল্যে ঘোড়া দাও আর বাকি টাকা মেয়াদি কিস্তিতে পরিশোধ করো।

এদিকে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ বাণীনাথকে যখন বেঁধে নিয়ে গেল তখন সে কী করল, কী বলল?'

যে দেখেছে সে বললে, 'বাণীনাথ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলতে লাগল। দুই হাতের আঙুলে সংখ্যা রাখছে, সহস্র পূর্ণ হলে দাগ কাটছে গায়ে।'

প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

কাশী মিশ্র এলে বললেন, 'আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ভবানন্দ রায়ের বৃহৎ গোষ্ঠী, প্রায় সবাই রাজকার্য করে। কে কখন অন্যায় করে রাজার বিত্ত আত্মসাৎ করবে, রাজা দণ্ড দেবে, আর আমাকে তখন ডাকবে সেই দণ্ড মকুবের সুপারিশের জন্যে, সে অসহ্য। আমি তাই ভাবছি আলালনাথে যাব। এখানে বিষয়ীদের বচসা শুনতে আমার প্রবৃত্তি নেই।'

'তুমি এতে ক্ষুব্ধ হচ্ছ কেন?' বললে কাশী মিশ্র, 'যে বিষয়ের জন্যে তোমার কাছে আসে সে মহামূর্খ। তোমার জন্যে রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ করল, সনাতন বিষয় ছাড়ল, রঘুনাথ পথের ভিখিরি হল। গোপীনাথও তোমার কাছে বিষয়বাঞ্ছা করে নি, সে তোমার কাছে চায় নি প্রাণভিক্ষা। ভক্তরা নিজের প্রেরণাতেই এসেছে, তোমাকে এসে বলেছে। যে শুদ্ধ-ভক্ত সে তোমার জন্যেই তোমাকে ভজনা করে, সুখ-দুঃখ যা আসে তাই মাথা পেতে নেয়। তুমি এখানেই থাকো। কেউ আর তোমাকে বিষয়কথা বলবে না।'

প্রতাপরুদ্র এল। যতদিন সে নীলাচলে থাকে ততদিন প্রত্যহ

এসে সে কাশী মিশ্রের পা টিপে দেয়। সেদিনও টিপছে, কাশী মিশ্র সমস্ত প্রকাশ করল। বললে, 'প্রভু গোপীনাথের উপর ভীষণ রুষ্ট হয়েছেন। বললেন, রাজার থেকে মাইনে পায়, আবার কি না রাজার ধনই চুরি করে। রাজার দ্রব্য আত্মসাৎ করে আমার কাছে কি না রাজার বিচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। আমি আর এই বিষয়ীসঙ্গে থাকব না, আলালনাথে চলে যাব। এখন বলো, প্রভুকে কী করে ঠেকাই ?'

প্রতাপরুদ্র মরমে মরে গেল। বললে, 'সমস্ত প্রাপ্য আমি ছেড়ে দেব, প্রভু শুধু নীলাচলে থাকুন।'

কাশী মিশ্র বললে, 'প্রাপ্য ছেড়ে দেওয়ায় প্রভুর সমর্থন নেই।'

'না, না, আমি প্রভুর দিকে তাকিয়ে ছাড়ব না, ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য, তার ছেলেরা আমার প্রীতিভাজন সেই জ্ঞানেই ছাড়ব। তুমি প্রভুকে আটকাও।'

গোপীনাথকে ডাকল রাজা। তাকে সম্মানের শিরোপা পরিয়ে দিল, বললে, 'তোমার সমস্ত ঋণ মকুব করে দিলাম। মালজাঠার শাসনভার তোমার উপরেই রইল। আর রাজার ভাণ্ডার যাতে না লুঠতে হয় তোমার মাইনে দ্বিগুণ করে দিলাম।'

কোথায় মঞ্চে তুলে খড়্গো ফেলে প্রাণ নিচ্ছে, তা নয়, উল্টে সমস্ত প্রাপ্য ছেড়ে দিল। শুধু তাই নয়, মাইনে দ্বিগুণ করল, পরিয়ে দিল সম্মানের শিরবস্ত্র।

কাশী মিশ্র এসে নিবেদন করতেই প্রভু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এ কী করলে ? রাজার নিকট থেকে আমাকে দান গ্রহণ করালে ?'

কাশী মিশ্র হকচকিয়ে গেল।

'গোপীনাথ আমার সেবক, তাকে কৃপা না দেখালে আমি অসন্তুষ্ট হব, তারই জন্যে রাজার এই অনুগ্রহ! তা হলে এ প্রকারান্তরে আমাকেই দান করা হল!'

'তোমার মুখ চেয়ে গোপীনাথকে কৃপা করে নি রাজা,' বললে কাশী মিশ্র, 'ভবানন্দের পুত্ররা তারা প্রিয়পাত্র এই জ্ঞানেই সে বদান্য হয়েছে। সুতরাং তোমাকে রাজদান গ্রহণ করতে হয় নি।'

রাজার আন্তরিকতায় প্রভু আনন্দিত হলেন।

পঞ্চ পুত্র সহ ভবানন্দ প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ হল। বললে, 'আপনার কৃপাতেই গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়েছে। শুধু প্রাণরক্ষা নয়, পদোন্নতি হয়েছে। রামানন্দ আর বাণীনাথ আপনার চরণ আশ্রয় করে নির্বিষয় হয়েছে, বাকি ছেলেগুলোকেও আপনার পদপ্রান্তে রেখে যাব।'

প্রভু ঈষৎ হেসে বললেন, 'সবাই বৈরাগী হলে তোমার বহু কুটুম্বকে খাওয়াবে কে?' উপদেশ করলেন: 'রাজার প্রাপ্য ধনকে নিজের প্রাপ্য ধন বলে বিবেচনা কোরো না। আর অসদ্ব্যয় কদাচ নয়।'

বর্ষান্তরে গৌড়ীয় ভক্তের দল আবার আসে প্রভুকে দেখে যেতে। অদ্বৈত আচার্য, আচার্যরত্ন, আচার্যনিধি তো বটেই, নিত্যানন্দ পর্যন্ত, যাকে কি না বলা আছে, এসো না, গৌড়ে থেকেই প্রেমভক্তি প্রচার করো। কিন্তু অনুরাগ অনুরোধ মানে না, প্রাণের টানে সমস্ত বিধি-বন্ধন ছিঁড়ে যায়। কতদিন গৌরকে দেখি নি, কতদিন পাই নি তার সঙ্গসুধা, তাকে ভালোবেসেই তার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি।

অনুরাগ কাকে বলে? যাকে সর্বদা অনুভব করা সত্ত্বেও মনে হয় আগে আর কখনো অনুভব করি নি, যাকে প্রতিমুহূর্তেই নবীন হতে নবীনতর মনে হয় তাই অনুরাগ।

'অনুরাগের লক্ষণ এই বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে॥'

যেমন গোপীরা করেছিল। রাস-রাত্রে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পাগলের মত বেরিয়ে এলে কৃষ্ণ তাদের আদেশ করল ঘরে ফিরে গিয়ে পতিসেবা করতে। কৃষ্ণানুরাগে সে আদেশ তারা

অগ্রাহ্য করলে। বললে, যা হবার হোক, আমরা তোমার সেবা-সঙ্গ ত্যাগ করব না।

কৃষ্ণের আদেশ যে তারা অমান্য করল তাতে কৃষ্ণ কি সুখী না বিরক্ত? সুখী, যেহেতু আজ্ঞাভঙ্গের পিছনে যে অধিকতর অনুরাগ। কৃষ্ণ যে অনুরাগের বশীভূত।

'আজ্ঞা পালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ॥'

ভক্তদলের মধ্যে আছে রাঘব পণ্ডিত, সে আবার ঝালি সাজিয়ে নিয়ে আসছে। তার বোন দময়ন্তী দিয়েছে ঝালি সাজিয়ে। আমসি, আচার, কাসুন্দি, শুক্‌নো কুল, রুখা-শুখা কত কী খাদ্যদ্রব্য, চিঁড়ে মুড়ি খৈ থেকে সুরু করে নাড়ু, গঙ্গাজল, কর্পূর-এলাচ পর্যন্ত। ঝালির উপরে মোহরের ছাপ দিয়ে দেওয়া। প্রকাণ্ড ভার, 'বোঝারি' বা মুটে তিনজন। মৌসিন বা মুনসিব বা ঝালির রক্ষক মকরধ্বজ।

ভক্তরা নরেন্দ্রসরোবরে মিলিত হয়ে প্রভুর সঙ্গে জলকেলি করল। আরেকদিন জগন্নাথের শয্যোত্থানের সময় বেড়াকীর্তন চালাল। সে কী হুঙ্কার-গর্জন-নর্তন-লম্ফন।

'কীর্তন-আটোপে ধরা করে টলমল।'

সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য হচ্ছে—অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, অচ্যুত, শ্রীবাস, সত্যরাজ আর নরহরি এই সাতজনে সাত সম্প্রদায়। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই ভ্রমণ করছেন অথচ প্রতি সম্প্রদায়ই ভাবছে প্রভু শুধু আমার দলেই আবদ্ধ আছেন।

'হে সর্বচিত্তবিমোহন জগন্নাথ, তোমার নির্মঞ্ছন যাই, তোমার চন্দ্রবদন দেখে মন প্রমত্ত হয়েছে।' ওড়িয়া পদকর্তার এই কথা কয়টি প্রভুর মনে পড়ল, স্বরূপকে বললেন তা গেয়ে শোনাতে।

আনন্দসাগর উথলে উঠেছে। যারা দেখছে-শুনছে, ভুলে গেছে দেহ-গেহের কথা। বেলা তৃতীয় প্রহর হল তবু নৃত্যের শেষ নেই। ভক্তদল শ্রান্ত হয়ে পড়ল। তখন ভক্তশ্রমের কথা শুনে প্রভু নিবৃত্ত হলেন।

স্নানাহার শেষ করে প্রভু গম্ভীরার দ্বার জুড়ে শুয়ে রইলেন। প্রভু শুলে গোবিন্দ প্রভুর পদসেবা করে এই নিয়মই চলে আসছে। এখন দ্বারজোড়া হয়ে পড়ে থাকলে গোবিন্দ ঢোকে কী করে? গোবিন্দ বললে, 'একপাশ হও, আমি ভিতরে যাই।'

প্রভু বললেন, 'আমার নড়বার শক্তি নেই।'

'তোমার পা টিপব যে।'

'তার আমি কী জানি!'

গোবিন্দ তখন তার বহির্বাস প্রভুর গায়ের উপর বিছিয়ে দিল, যেন তার পায়ের ধুলো না তাঁর গায়ে পড়ে। তারপর প্রভুকে লঙ্ঘন করে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে প্রভুর, কটি পিঠ টিপে দিতে লাগল। মধুর মর্দনে শ্রান্তি দূর হল, প্রভুর নিদ্রাকর্ষণ হল।

দণ্ড দুই পরে জেগে উঠে প্রভু দেখলেন গোবিন্দ তখনো বসে আছে। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'এখনো বসে আছ কী। খেতে যাও নি?'

'কী করে যাই?' গোবিন্দ বললে কাতরমুখে, 'দরজায় শুয়ে আছ, পথ কই?'

'ভেতরে এসেছিল কী করে? সেই ভাবেই যেতে পারতে না?'

'যাব তো খাবার জন্যে।' গোবিন্দ মনে-মনে বললে, 'তোমার সেবার জন্যে শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন—অপরাধ করেছি, শাস্তি যদি কিছু থাকে সহ্য করব হাসিমুখে। কিন্তু নিজের উদরপূর্তির জন্য সে অপরাধ করব এ আমার ধারণার অতীত।'

বাইরে স্তব্ধ হয়ে রইল গোবিন্দ। ভগবৎসেবী ভক্তের মনের কথা প্রভু নিজেই বুঝবেন ঠিক-ঠিক।

গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে প্রভু আবার গুণ্ডিচা-গৃহের ক্ষালন-মার্জন করলেন, বাগানে বন্যভোজন করলেন, রথের সামনে নৃত্য করলেন, দেখলেন কৃষ্ণজন্মযাত্রা।

ভক্তদের ইচ্ছে হল প্রভুকে খাওয়াই।

'গোবিন্দ, এ প্রসাদটুকু রাখো, প্রভুকে খেতে দিও।' কেউ পেঁড়া দিয়ে গেল, কেউ নাড়ু, কেউ পিঠে।

'অমুকে এটা দিয়ে গেলেন।' প্রভুকে জানায় গোবিন্দ।

প্রভু বলেন, 'ধরে রাখো।'

কত আর ধরবে! ধরতে-ধরতে ঘরের কোণ ভরে গেল। প্রায় শতজনের ভক্ষ্য স্তূপীকৃত হয়ে উঠল।

'আমার প্রসাদ প্রভুকে খাইয়েছ তো?' ভক্তের দল আবার খোঁজ করতে আসে।

'আমার মণ্ডা? সরভাজা?'

এটা-ওটা অন্য কথা বলে পাশ কাটায় গোবিন্দ।

'ভক্তদের আর কত বঞ্চনা করব?' গোবিন্দ একদিন প্রভুর কাছে গিয়ে দুঃখ জানাল: 'খাচ্ছ না অথচ খাদ্য সঞ্চিত হয়ে আছে, এ-কথা গোপন করে রেখে আর কত আমার অপরাধের বোঝা ভারী করব?'

'তোমার আবার অপরাধ কী!' প্রভু হাসলেন: 'তুমি তো আদিবশ্য, অনাদিকাল থেকে আমার বশীভূত। নিয়ে এস কে কী খাবার দিয়ে গেছে! নাম ধরে ধরে নিবেদন করো।'

একে একে সকলের দেওয়া খাবার প্রভুর সামনে জড়ো করতে লাগল গোবিন্দ। বাসি-বিস্বাদ মানলেন না, শতজনের ভক্ষ্য প্রভু একদণ্ডে খেয়ে ফেললেন। জড়বস্তুই পচে, চিন্ময়বস্তু পচে না। মহাপ্রভুর প্রসাদ চিন্ময়বস্তু।

'আর কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

গোবিন্দ বললে, 'রাঘবের ঝালি আছে।'

'আজ থাক। পরে একদিন দেখা যাবে।'

পরে একদিন খোলা হল রাঘবের ঝালি। সমস্ত দ্রব্যেরই কিছু-কিছু প্রভু উপভোগ করলেন এবং তা প্রায়ই এবেলা ওবেলা। ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য উপভোগ না করে উপায় কী। তারপরে ঘরে রান্না করেও অন্নব্যঞ্জন খাওয়াতে লাগল ভক্তেরা।

শিবানন্দ সেনও নিমন্ত্রণ করল।

বড় ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দেশ থেকে, প্রভুর কাছে আনতেই প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম ?'

'চৈতন্যদাস।' ছেলে উত্তর করল।

'এ আবার একটা কী নাম রেখেছ !'

'যে বোঝবার সে বুঝবে।'

গুরুভোজন করাল শিবানন্দ। গুরুভোজনে প্রভু বিশেষ প্রসন্ন হলেন না।

যে বোঝবার সে বুঝেছে। চৈতন্যদাস বুঝেছে। সে আরেকদিন নিমন্ত্রণ করল প্রভুকে। আর প্রভুর কী রুচিকর তা বুঝে নিয়ে তেমনিধারা ব্যবস্থা করল। শাক শুকতো ফুলবড়া দধি নেবু।

প্রভুর পরিপূর্ণ সন্তোষ হল। ভুক্তাবশেষ চৈতন্নদাসকে দান করলেন।

হরিদাসকে রোজ মহাপ্রসাদ পেঁাছিয়ে দেয় গোবিন্দ। একদিন গিয়ে দেখে হরিদাস শুয়ে-শুয়ে নাম করছে। বললে, 'ওঠো, প্রসাদ এনেছি।'

হরিদাস বললে, 'আজ আমি উপবাস করব।'

'সে কি ?'

'জানো আজ আমার সংখ্যাপূরণ হয় নি। সংখ্যাপূরণ না হলে কী করে ভোজন করি ?' হরিদাস অস্থির হয়ে উঠল : 'এদিকে মহাপ্রসাদকেও বা কী করে প্রত্যাখ্যান করি ?' মহাপ্রসাদকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তার এককণা গ্রহণ করল হরিদাস।

এই ভাবে নিজের ভজননিষ্ঠা ও মহাপ্রসাদ দুয়েরই মান রাখল।

পরদিন প্রভু নিজে এসে উপস্থিত হলেন।

'কেমন আছ হরিদাস ? সুস্থ তো ?'

'শরীর সুস্থ আছে, মন-বুদ্ধিই অসুস্থ।' বললে হরিদাস।

'কেন, কী ব্যাধি হল ?'

'নামসংখ্যা পূর্ণ হচ্ছে না প্রভু।'

প্রভু মমতামাখানো স্বরে বললেন, 'এখন বৃদ্ধ হয়েছ, নামসংখ্যা কমিয়ে দাও। তা ছাড়া তুমি সিদ্ধভক্ত, তোমার আর সাধনের প্রয়োজন কী! মায়াবদ্ধ জীবকে হরিনাম দিয়ে উদ্ধার করার জন্যেই তোমার আসা, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জগতে নামের মহিমা তুমি যথেষ্ট প্রচার করেছ। এখন বার্ধক্যের দরুন নামসংখ্যা কমে গেলে কী আসে-যায়।'

হরিদাস বললে, 'প্রভু, আমি সিদ্ধদেহ ভগবৎ-পরিকর নই। আমি সাধারণ জীব, হীন জাতিতে আমার জন্ম, আমার এ দেহও নিন্দনীয়। আমার দ্বারা কিসের লোক-নিস্তার কিসের নাম-প্রচার! রৌরব নরক থেকে তুমিই আমাকে বৈকুণ্ঠে তুললে। তুমিই স্বেচ্ছাময় ঈশ্বর, তুমিই জগৎ নাচাচ্ছ। তাই তুমি আমাকেও নাচালে, ম্লেচ্ছ হয়ে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র খেলাম। আমার শুধু এক সাধ, যেন তোমার আগে আমার শরীর পড়ে। বুকে তোমার পাদপদ্ম ধরব, নয়নে চাঁদমুখ দেখব আর জিহ্বায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম উচ্চারণ করতে-করতে চলে যাব। তোমার কৃপা হলেই আমার এ বাঞ্ছাসিদ্ধি ঘটে।'

প্রভু বললেন, 'তোমার প্রার্থনা কি কৃষ্ণ অপূর্ণ রাখতে পারেন ? কিন্তু তোমাকে নিয়েই আমার সমস্ত সুখ, আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া কি তোমার উপযুক্ত হবে ?'

'তুমি কী যে বলো! আমার মত একটা পিপীলিকা মরে গেলে এ পৃথিবীর কী ক্ষতি! তুমি ভক্তবৎসল। কিন্তু আমি কি ভক্ত ? না, আমি ভক্তাভাস। আমার বাহ্যিক আচরণ ভক্তের মত কিন্তু আমার অন্তরে কোথায় ভক্তি ? তবু তুমি কৃপা করলে অধমের অধম ইচ্ছারও পূরণ হতে পারে। আজ যাও, বেলা অনেক হয়েছে, কাল প্রাতে জগন্নাথদর্শনের পর আবার এসো।'

হরিদাসকে আলিঙ্গন করে প্রভু মধ্যাহ্নকৃত্য করতে চলে গেলেন।

পরদিন ভোর হতেই ভক্তদের নিয়ে তাড়াতাড়ি হরিদাসের কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। শুধোলেন, 'সংবাদ কী?'

হরিদাস বললে, 'এখন তোমার কৃপা।'

হরিদাসকে মাঝখানে রেখে মহাসঙ্কীর্তন আরম্ভ হল। প্রভু পঞ্চমুখে হরিদাসের গুণবর্ণনা করতে লাগলেন, সকলে গুণসৌরভে মোহিত হয়ে গেল।

তুমি আমার সামনে এসে বোস। তোমার বদন-পদ্মে আমার নেত্রভৃঙ্গ দু'টি স্থাপন করি। আর তুমি তোমার পা দু'খানি আমার হৃদয়ের উপর রাখো। আর বৈষ্ণবভক্তদের পদরেণু আমার শিরোভূষণ হোক।

অঙ্গন থেকে বৈষ্ণবচরণের ধূলি হরিদাস মাথায় তুলে নিল। 'বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি।' প্রভুর চরণ বুকে ধরে বারে বারে বলতে লাগল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলতে-বলতেই পড়ল শেষনিশ্বাস।

এ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। মহাযোগেশ্বরের নির্য্যাণ। মন-প্রাণ কৃষ্ণে নিবিষ্ট করে নিষ্পলকচোখে কৃষ্ণকে দেখতে দেখতে ভীষ্ম যেমন মহাপ্রয়াণ করেছিল এ-ও সেই তিরোধান।

হরিদাসের দেহ কোলে তুলে নিলেন প্রভু। প্রেমাবিষ্ট হয়ে নাচতে লাগলেন অঙ্গনে। আর-আর ভক্তরাও নাচতে লাগল। নামকীর্তনের তুফান ছুটল।

রথে করে হরিদাসের দেহ নিয়ে যাওয়া হল সমুদ্রে। স্নান করিয়ে তাতে প্রসাদচন্দন মাখানো হল। ভক্তরা পাদোদক খেল।

প্রভু বললেন, 'সমুদ্র মহাতীর্থ হয়ে গেল।'

প্রসাদী বস্ত্রে ঢেকে হরিদাসের দেহকে সমুদ্রতীরে বালুকা-গর্ভে সমাধি দেওয়া হল। হরি বোল, হরি বোল বলে প্রভু শ্রীহস্তে

বালি তুলে দিতে লাগলেন। সমাধির উপর বেদী বাঁধিয়ে দেওয়া হল। এবার হরিধ্বনি-কোলাহলে গগন-ভুবন পরিপূর্ণ করে দাও।

সিংহদ্বারে প্রভু নিজে এসে আঁচল পেতে দাঁড়ালেন। হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব-উৎসবের জন্য প্রসাদ দাও পসারীরা।

অঢেল আসতে লাগল। যে দেখে সেই পাঠায়, যে শোনে সে-ও।

ভক্ত ভক্ত। তার জাতি-কুল নেই, গণ্ডি-বেড়া নেই, তার দেহ পরমপাবন, তা সমস্ত স্থানকেই তীর্থান্বিত করে। আর যা আগের থেকেই তীর্থ হয়ে আছে তাকে মহাতীর্থে পরিণত করে।

সবাই আকণ্ঠ ভোজন করলে। প্রভু দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়ালেন। আর বললেন, নাম-মহিমার প্রকাশক ও প্রচারক হরিদাসের জয় দাও সকলে।

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি শিরোমণি॥
শেষকালে দিল তারে দর্শন-স্পর্শন।
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্তন॥
আপন শ্রীহস্তে তারে কৃপায় বালু দিল।
আপন প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল পয়ান॥

৭২

হরিদাসের তিরোধানের পর থেকেই প্রভুর চিত্ত বিষণ্ণ! কৃষ্ণবিরহস্ফূর্তিতেই এই বিষণ্ণতা। অহরহ প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের জন্যে কাতরতা।

'হাহাকৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ মুরলীবদন॥'

মনে স্বস্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, স্বরূপ আর রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা বলে রাত কাটান। সমস্ত রাত্রিই এখন কৃষ্ণরাত্রি।

এদিকে গৌড়ে ভক্তদের আয়োজন চলেছে আবার প্রভুদর্শনে নীলাচল যাত্রা করবে। নিত্যানন্দের প্রতি আদেশ যেন নবদ্বীপ না ছাড়ে, তবু আদেশ অমান্য করে সে চলেছে। চার ভাই আর স্ত্রী মালিনীকে নিয়ে চলেছে শ্রীবাস। সস্ত্রীক শিবানন্দ, সঙ্গে তাদের তিন ছেলে। বাসুদেব মুরারি পুণ্ডরীক তো আছেই, ঝালি সাজিয়ে রঘুনাথ। আরো অনেকে। শচীমাতা সকলকে আশীর্বাদ করে দিলেন।

দলের নেতা শিবানন্দ, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সেই পাকা লোক। ঘাটিয়ালকে পথকর দিয়ে ছাড় নিতে সেই ভালো পারবে।

একদিন ঘাটিয়াল সকলকে আটক করল। ঠিকঠাক কর দাও।

'ওদের ছেড়ে দাও। সকলের হয়ে আমি দেব।' শিবানন্দ হুমকে উঠল: 'নাও, হিসেব করো।'

আর সকলকে ছেড়ে দিল ঘাটিয়াল। তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকে গাছতলায় অপেক্ষা করতে লাগল। শিবানন্দ হিসেব চুকিয়ে ফিরে এলে পর থাকবার জায়গা ঠিক হবে।

ঘাঁটি থেকে ফিরতে শিবানন্দের দেরি হচ্ছে।

খিদের জ্বালায় নিত্যানন্দ অস্থির হয়ে উঠেছে। শিবানন্দই খাবার বন্দোবস্ত করবে অথচ তার এখনো ফেরবার নাম নেই। কী এত হিসেব যে এতক্ষণ দেরি হবে! তার জন্যে এতগুলি লোক না খেয়ে মরবে নাকি?

অসহ্য। নিত্যানন্দ শাপ দিয়ে বসল। বললে, 'ও এখনো ফিরছে না? ওর তিন ছেলেই মারা যাবে।'

শিবানন্দের স্ত্রী কাঁদতে বসল। এ কী অকরুণ।

তখুনিই ফিরল শিবানন্দ।

স্ত্রী কেঁদে পড়ল : 'কেন ফিরতে দেরি করলে? থাকবার খাবার জায়গা এখনো ঠিক হয় নি দেখে গোঁসাই শাপ দিয়েছে, তোমার তিন পুত্রই মারা যাক।'

'তুমি তার জন্যে কাঁদছ কেন? মরুক, আমার তিন পুত্রই মরুক,' শান্তমুখে বললে শিবানন্দ, 'গোঁসাইয়ের সব বালাই নিয়ে তারা চলে যাক।'

শিবানন্দ নিত্যানন্দের কাছে এসে দাঁড়াল। আর তক্ষুনি নিত্যানন্দ তাকে লাথি মারল।

পদপ্রহার না আশীর্বাদ! আনন্দে বিহ্বল হল শিবানন্দ। গ্রামের মধ্যে গিয়ে তখুনি বাসস্থান ঠিক করে এল। চলুন সকলে। অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর নয়।

বাসায় সকলকে নিয়ে গিয়ে শিবানন্দ নিত্যানন্দকে বললে, 'আমার মত ভাগ্য কার, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বলে স্বীকার করে নিলেন। শাস্তির ছলে করুণা করলেন আমাকে। আপনার চরণরেণুর স্পর্শে আমার অধম দেহ পবিত্র হল, মনে জাগল কৃষ্ণভক্তি। আমার জন্ম-কুল-কর্ম সার্থক হল।'

নিত্যানন্দ শিবানন্দকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করল।

সবাই ভাবলে এ কী বিচিত্র ব্যবহার। যার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন তাকেই আবার কৃপা করলেন। লাথি দিয়ে পরে আলিঙ্গন।

শিবানন্দের ভাগনে শ্রীকান্তের সহ্য হল না। সে বলে ফেললে, 'মহাপ্রভুর পার্ষদ আমার মামা, তাকে লাথি মারা গোঁসাইয়ের উচিত হয় নি। আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি নালিশ করতে।'

সটান গিয়ে প্রভুর পায়ে দণ্ডবৎ করল শ্রীকান্ত।

গোবিন্দ বললে, 'গায়ের জামা খোলো, খালিগায়ে দণ্ডবৎ করো। বস্ত্রাবৃত দেহে ভগবৎপ্রণাম অপরাধ।'

'আহা-হা, থাক, ওকে বাধা দিও না।' প্রভু গোবিন্দকে বাধা

দিলেন : 'এ বালক মনে দুঃখ নিয়ে এসেছে, ওর যেমন খুশি তেমনি করুক।'

প্রভু তা হলে সমস্তই জানতে পেরেছেন! বালক অবাক হল। তা হলে সবিস্তার নালিশ করবার আর দরকার কী!

সবাই এসে পড়ল, দর্শন করল প্রভুকে। থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত পলকে ঠিক হয়ে গেল, কারু কোনো অভিযোগ রইল না।

তিন ছেলে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল শিবানন্দ।

'তোমার এই ছোট ছেলেটির নাম কী?' জিজ্ঞেস করলেন প্রভু।

'পরমানন্দ দাস!' বললে শিবানন্দ।

'ও! এই আমার পুরীদাস?' প্রভু আনন্দ করে উঠলেন।

আগে কোনো এক বছর শিবানন্দ যখন নীলাচলে সস্ত্রীক অবস্থান করছিল তখন প্রভু বলেছিলেন, তোমার এবার যে ছেলেটি হবে তার নাম পুরীদাস রেখো।

নীলাচলেই মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয়েছিল বলেই তার নাম পুরীদাস। পোশাকী নাম পরমানন্দ দাস।

এই পুরীদাসই কবি-কর্ণপূর।

বালকের মুখে প্রভু তাঁর পদাঙ্গুষ্ঠ ঢুকিয়ে দিলেন। ওর মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হোক।

গোবিন্দকে বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত শিবানন্দের প্রকৃতি আর পুত্র এখানে থাকবেন আমার ভুক্তাবশেষ পাবেন।'

স্ত্রী-শব্দ উচ্চারণ করেন না প্রভু। বলেন, প্রকৃতি।

নবদ্বীপ থেকে পরমেশ্বর মোদক এসেছে। প্রভুর গৃহের কাছেই তার ঘর, কত মোয়া-নাড়ু খাইয়েছে প্রভুকে, বাল্যকাল থেকেই প্রভুর প্রতি অনির্বাণ স্নেহ। এবার সেও চলে এসেছে। সেই নয়নমণিকে একবার দেখে আসি।

'আমি পরমেশ্বর।' মোদক দণ্ডবৎ করল।

'তুমি—তুমি এসেছ?' প্রভু প্রীত হলেন: 'বা, এসে ভালো করেছ। সব কুশল তো?'

'মুকুন্দের মা-ও এসেছে।'

পরমেশ্বর ভেবেছিল তার স্ত্রী, মুকুন্দের মাকে দেখেও প্রভু খুশি হবেন। ছেলেবেলায় প্রভু কত আদর আপ্যায়ন পেয়েছেন এই মুকুন্দের মার কাছে। সে কি আর ভোলবার?

কিন্তু প্রভু সঙ্কুচিত হলেন। কোনোক্রমেই যে তাঁর কাছে স্ত্রীপ্রসঙ্গ তোলা ঠিক নয় তা মোদক কী করে জানবে? সে সরল, চাতুর্যের ধার ধারে না। তারই জন্যে স্ত্রীপ্রসঙ্গে তার অপরাধ হলেও প্রভু তা উপেক্ষা করলেন! মুকুন্দের মা মালিনীর মতই দূর থেকেই প্রভুকে দেখে গেল।

প্রতিবারের মত এবারও যথারীতি গুণ্ডিচামার্জন হল, হল রথাগ্রনর্তন। সেই চাতুর্মাস্য, সেই সব যাত্রা, উৎসবলীলা। প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জনে প্রভুকে ভিক্ষে দেওয়া। সর্বত্রই শুধু ভক্তি-প্রীতির ঢেউ।

'প্রতি বৎসর কত কষ্ট করে তোমরা আস।' প্রভু গৌড়-ভক্তদের উদ্দেশ করে বললেন, 'আসতে-যেতে কত ক্লেশ। তবু তোমাদের বারণ করতে পারি না। তোমাদের সঙ্গলাভে যে আমার সুখ হয়। আর বারণ করলেও নিত্যানন্দ শুনছে কই? অদ্বৈতেরই বা আমার প্রতি কত কৃপা, কত দুর্গম পথ লঙ্ঘন করেছেন প্রতিবার। স্ত্রী-পুত্র-গৃহসুখ সব ছেড়ে এমনি চলে আসা সহজ কথা নয়। আমার কোনো পরিশ্রম নেই, আমি তো নীলাচলেই বসে আছি। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার কোনো ধন নেই, কী দিয়ে তোমাদের ঋণ আমি শোধ করব? শুধু আছে আমার এই দেহ তাই তোমাদের সমর্পণ করে দিলাম। কে চায় বলো, তাকেই আমি আমার দেহ বেচে দিতে পারি। আমার এ দেহ তোমাদেরই জিনিস, তোমাদেরই সম্পত্তি।'

প্রভুর কথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগল সকলে।

কেউ আর ছেড়ে যেতে চায় না। ফেরবার দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, তবু কারু বাড়ি যাবার নাম নেই। তুমি বিকোবে কী, তোমার গুণে সমস্ত জগৎ যে তোমাতেই বিকিয়ে আছে।

প্রবোধবাক্যে সবাইকে সুস্থ করলেন প্রভু। নিত্যানন্দকে বললেন, 'তুমি বার বার এসো না, আমিই ওখানে তোমার সঙ্গ নেব। অনেক দিন হয়ে গেল, এবার সকলে ফিরে যাও।'

কেন ফিরিয়ে দিলেন কে বলবে। ঈশ্বরের আচরণ জীব কী করে বুঝবে? তাই সবাই শান্তমুখে ফিরে চলল।

'ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥'

প্রভুর কথামত জগদানন্দ নবদ্বীপে শচীমাতার সঙ্গে দেখা করল।

'তোমাকে এ সব প্রসাদী বস্ত্র মালা চন্দন আর মহাপ্রসাদ পাঠিয়েছেন। পাঠিয়েছেন প্রণাম আর বিনয়স্তুতি।' প্রভুর হয়ে জগদানন্দই দণ্ডবৎ করল।

শচীমাতার আনন্দ দেখে কে। 'বলো আমার নিমাইয়ের কথা বলো।'

প্রভু যে এখানে খেতে আসেন, আর শচীমাতা যে সেটাকে স্বপ্ন বলে ভাবে সেইসব কথা অনেক বললে জগদানন্দ। আরো আরো কত কথা। 'চৈতন্যের সুখকথা।'

সেই কথাই বিলোতে লাগল ঘরে-ঘরে। ঘরে-ঘরে শুধু নয়, জনে-জনে বিলোতে লাগল চৈতন্য।

শেষ পর্যন্ত শিবানন্দের বাড়িতে এসে উঠল, প্রভুর জন্যে বহু যত্নে চন্দনাদি তেল তৈরি করাল। এ তেলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, পিত্তের দোষ কাটে। প্রভু কীর্তনে মত্ত থাকেন, কৃষ্ণবিরহক্লেশে রাত জাগেন, আহারে অসময় হয়ে যায়, জগদানন্দের ধারণা হল এ তেলে তাঁর উপকার হবে।

মনোহরণ গন্ধ মিশিয়ে সে তেল কলসীতে করে নীলাচলে নিয়ে চলল।

গোবিন্দকে বললে, 'এ তেল প্রভুর অঙ্গে মাখিয়ে দাও।'

গোবিন্দ প্রভুর সমীপস্থ হল। বললে, 'জগদানন্দ চন্দনাদি তেল তৈরি করে এনেছে। তার ইচ্ছা সে তেল আপনি একটু মাথায় দেন। তাতে পিত্ত আর বায়ু শান্ত হবে। এক কলস নিয়ে এসেছে। গন্ধ কী সুন্দর!'

প্রভু বললেন, 'তেলে সন্ন্যাসীর অধিকার নেই। তারপরে সুগন্ধ! সে অত্যন্ত লজ্জার কথা। এ তেল জগন্নাথকে দাও—সে তেলে তাঁর দীপ জলবে আর তাইতে জগদানন্দেরও পরিশ্রম সার্থক হবে।'

জগদানন্দ জানতে পেল প্রভুর প্রত্যাখ্যানের কথা। অভিমানে মুখ ভার করে রইল।

জগদানন্দের তুঃখ গোবিন্দের মনে গিয়ে বাজল। দিন দশ বাদে আবার সে প্রভুর কাছে নিবেদন করল: 'একটু তেল মাখলে পণ্ডিতের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাই বলছিলাম—'

প্রভু ক্রুদ্ধ হলেন: 'তা হলে মর্দন করতে একজন পালোয়ান ডেকে নিয়ে এস। এই সুখের জন্যেই তো আমি সন্ন্যাস করেছি! এ তেল মাথায় মেখে আমি রাস্তায় বের হই আর সকলে বলাবলি করুক, আমি প্রকৃতির মনোরঞ্জন করবার জন্যে গন্ধ মেখেছি। আমার সর্বনাশ নিয়ে তোমরা পরিহাস করতে চাও?'

গোবিন্দ চুপ করে গেল।

পরদিন এল জগদানন্দ। প্রভু তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'আমি তো সন্ন্যাসী এ তুমি ভুলে গেলে? তবে তুমি এ গন্ধতেল গৌড় থেকে নিয়ে এলে কেন? আমাকে কি তা ব্যবহার করা সাজে? এ তেল জগন্নাথকে দাও, তাঁর প্রদীপে এ দগ্ধ হোক।'

'কে তোমাকে বললে যে এ তেল আমি গৌড় থেকে এনেছি? মিথ্যেকথা। জগদানন্দ অভিমানে রুষে উঠল: 'এ আমি আনি নি।

কখনো না।' বলে ঘরের ভিতর থেকে তেলের কলসী নিয়ে এসে আঙিনায় প্রভুর সামনে আছাড় মারল।

কলসী চৌচির, সমস্ত আঙিনা ভেসে গেল। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল নিজ ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে রইল।

পরদিন প্রভু এসে হাজির। অনেক ডাকাডাকিতেও উঠল না জগদানন্দ। খুলল না দরজা।

'শোনো, আজ মধ্যাহ্নে আমি তোমার এখানে ভিক্ষে নেব।' প্রভু বললেন বাইরে থেকে: 'তুমি নিজে রান্না করে দেবে। আমি যাই স্নান-দর্শন করে আসি।'

তখন জগদানন্দ না উঠে করে কী। প্রিয়তমকে কি উপবাসী রাখা যায়!

মধ্যাহ্নকৃত্য সাঙ্গ করে প্রভু এসে দেখলেন বিচিত্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছে জগদানন্দ।

কিন্তু আহারে বসেও প্রভু হাত লাগাচ্ছেন না।

'আরেক পাত্রে তোমার জন্যে অন্নব্যঞ্জন নাও।' বললেন প্রভু, 'তুমি-আমি আজ একত্র ভোজন করব।'

তার খাবার জন্যে প্রভুর আগ্রহ দেখে জগদানন্দ প্রেমাভিভূত হ'ল। তেলের জন্যে আর তিলমাত্রও দুঃখ রইল না! গাঢ়স্বরে বললে, 'তুমি আগে খেয়ে নাও, আমি পরে খাব। তুমি যখন বলছ তখন আমি কি আর না খেয়ে থাকতে পারি?'

'বেশ, তবে তাই, পরে খেয়ো। প্রভু খেতে সুরু করলেন, বললেন, 'রান্না কী অপূর্ব হয়েছে! ক্রোধাবেশে রান্না করেও ব্যঞ্জনে অমৃত ফলিয়েছে। এ কৃষ্ণের প্রসাদ ছাড়া আর কিছু নয়। কৃষ্ণ আজ তোমার হাতে খাবেন বলেই তোমাকে দিয়ে এত ভালো রাঁধিয়েছেন।'

জগদানন্দ বললে, 'যে খাবে সেই নিজে রেঁধেছে। আমি শুধু রান্নার জিনিস জোগাড় করে দিয়েছি।'

'পণ্ডিত কহে, যে খাইবে সেই পাক কর্তা।
আমি সব কেবলমাত্র সামগ্রী আহর্তা॥'

বেশি-বেশি করে পরিবেশন করছে পণ্ডিত। পাছে আবার অভিমান করে বসে তাই ভয়ে-ভয়ে সব খেলেন প্রভু, অন্য দিনের প্রায় দশগুণ। যে ভগবান প্রেমের বশীভূত সে ভক্তকে ভয় করবে না তো কী।

'কিন্তু আর নয়, অনেক হয়েছে।' প্রভু বলতে ক্ষান্ত হ'ল পণ্ডিত।

আচমন করে মুখশুদ্ধি নিয়ে বসলেন প্রভু। বললেন, 'এবার তুমি খাও, আমি দেখি।'

জগদানন্দ বললে, 'খাব'খন। আগে আপনি বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করুন।'

'তাই যাচ্ছি।' প্রভু উঠলেন, গোবিন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি এখানে থাকো। পণ্ডিতের ভোজন হয়ে গেলে আমাকে খবর দেবে।'

প্রভু চলে যেতেই জগদানন্দ গোবিন্দকে বললেন, 'তুমি যাও, গিয়ে প্রভুর পদসেবা করো। আর বলো, পণ্ডিত এই ভোজনে বসেছে। ভয় নেই তোমার জন্যে প্রভুর ভুক্তাবশেষ রেখে দেব। উনি ঘুমিয়ে পড়লে এস।'

গোবিন্দ প্রভুর কাছে এসে হাজির হল।

'পণ্ডিত ভোজনে বসেছে।'

'ভোজনে বসলে কী হয়? দেখে এস ভোজন শেষ হ'ল কিনা।' প্রভু গোবিন্দকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

আর সকলেরটা বেড়ে রেখে প্রভুর স্বস্তির জন্যে থালা নিয়ে বসে পড়ল পণ্ডিত। ভোজন শেষ করল। গোবিন্দ সেই সংবাদ পৌঁছে দেবার পর প্রভু স্বস্তিতে শুলেন।

প্রভুর শয়ন কী? কলার শরলা প্রভুর শয়ন। আস্ত কলাপাতার

মধ্যের ডাঁটিটার নাম শরলা। সে শয়ন সুখকর নয়। প্রভুর শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে গেছে, ও বন্য শয়নে শুতে তাঁর হাড়ে ব্যথা লাগে। কৃষ্ণের বিরহ-আর্তিতেই তাঁর কৃশতা, তারপর ঐ শয্যা যদি মেঝের উপর বিছানো থাকে তা হলে দেহক্লেশের আর অবধি থাকে না। তবুও মাঝে মাঝে তাঁকে প্রফুল্ল দেখায়, হয়তো যখন রাধাভাবে তাঁর পূর্ব মিলনকথা মনে পড়ে।

আবার জগদানন্দের বুকে বাজল সেই কলার শরলা। প্রতিকারের জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সূক্ষ্মবস্ত্র নিয়ে এসে গৈরিকে রাঙাল, শিমুল তূলো ভরে দিব্যি তা দিয়ে তোশক আর বালিশ তৈরি করল। গোবিন্দকে বললে, 'নিয়ে যাও। এতে প্রভুকে শুতে বলো।'

গোবিন্দ বুঝি একটু দ্বিধা করল নেয় কি না নেয়।

সামনে স্বরূপ দাঁড়িয়ে। 'আপনি যান।' জগদানন্দ স্বরূপকে ধরল : 'আপনি গিয়ে প্রভুকে এ শয্যায় শুইয়ে আসুন।'

তোশক-বালিশের শয্যা দেখে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হলেন। গোবিন্দকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এ কে করালো ?'

'জগদানন্দ পণ্ডিত।'

জগদানন্দের নাম শুনে প্রভুর সঙ্কোচ হল যদি আবার রাগ করে অনাহারে পড়ে থাকে। তাই রূঢ় কথা বললেন না। তোশক-বালিশ সরিয়ে রেখে কলার শরলার উপরই যথাবিধি শয়ন করলেন।

স্বরূপ বললে, 'এ শয্যা উপেক্ষা করলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে।'

'তা হলে একটা খাট নিয়ে এস।' প্রভু রোষ পরিহাস করলেন : 'জগদানন্দ কি চায় আমি বিষয়-ভোগ করি ? মাটিতে শোয়াই তো সন্ন্যাসীর কর্তব্য, সেই ক্ষেত্রে তোশক-বালিশের শয্যা ব্যবহার অর্থ ই আমার জাতিচ্যুতি।'

স্বরূপ জগদানন্দকে জানাল প্রভুর বিতৃষ্ণার কথা।

জগদানন্দ প্রশ্ন করল : 'এর তবে প্রতিকার কী ?'

স্বরূপ উপায় বের করল। বিস্তর কলাপাতা সংগ্রহ করল। নখে চিরে চিরে রাশি-রাশি তন্তু বের করে প্রভুর দু'খানি বহির্বাসের মধ্যে পুরল। বেশ একটা লেপের মত জিনিস হল। এই তবে তাঁর শয্যা হোক। তাঁর কৃশ দেহ কিছুটা আরাম পাক।

প্রভু এও স্বীকার করতে চান না।

স্বরূপ অনুনয় করতে লাগল। তোমার সেই কলাপাতাই তো আছে, আর তোমারই নিজের বহির্বাসে তোমার আপত্তি কী। তোমার কষ্ট দেখাটা যে ভক্তের পক্ষে কষ্টকর এটা তো তুমি মানবে।

শেষ পর্যন্ত এ শয্যা অঙ্গীকার করলেন প্রভু।

কিন্তু জগদানন্দ শান্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। প্রভুর এত ক্লেশ স্বচক্ষে দেখা যায় না। এর চেয়ে বৃন্দাবন চলে যাই।

'অনুমতি করুন আমি বৃন্দাবনে যাই।' প্রভুর কাছে অনুমতি চাইল পণ্ডিত।

'তার অর্থ আমার উপর রাগ করে চলে যাচ্ছ? আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তুমি ভিখারি হবে?'

'বা, তা কেন? কতদিন থেকেই আমার বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছে।'

'তা হোক। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হবে না? আমার কষ্ট তো খুব বোঝো—এ কষ্টটা বোঝো না?' প্রভু অনুমতি দিলেন না।

তখন জগদানন্দ স্বরূপকে গিয়ে ধরল। দয়া করে প্রভুর মত করিয়ে দিন। আমার বিচ্ছেদে তাঁর আবার কী কষ্ট।

স্বরূপ প্রভুকে বোঝাতে বসল। পণ্ডিত গৌড়ে তো যায় শচীমাতাকে দেখতে, তেমনি একবার বৃন্দাবন দেখে আসতে বাধা কিসের!

'তবে যাক।' প্রভু শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন।

পথের উপদেশ দিতে বসলেন। বললেন, 'বারাণসী পর্যন্ত কোনো ভয় নেই, স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। বারাণসীর পর থেকেই ভয়। তখন কখনো একা চলবে না, স্থানীয় ক্ষত্রিয়দের কারু সঙ্গ নেবে। একলা বাঙালি দেখলে বাটপাড়েরা অত্যাচার করবে, সব লুটপাট করে বেঁধে রাখবে, খেতে দেবে না। সঙ্গে ক্ষত্রিয় কাউকে দেখলে এগুতে সাহস পাবে না। আর মথুরায় সনাতনের ওখানে উঠবে। মথুরায় যত স্থায়ী ভক্ত আছেন তাঁদের চরণবন্দনা করবে। দূর থেকেই তাঁদের ভক্তি করা ভালো। কদাচ তাঁদের সঙ্গে থাকবে না যেহেতু তাঁদের সহজ আচরণের মর্মগ্রহণ করা তোমার পক্ষে কঠিন হবে। সনাতনের সঙ্গে ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বন দেখবে, কিন্তু গোবর্ধন পর্বতের উপর যে গোপাল আছে, তাকে দেখতে পাহাড়ে উঠো না, কৃষ্ণ-কলেবরে পা ঠেকালে অপরাধ হবে। দেখো, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। সেখানেই থেকে যেয়ো না। আর সনাতনকে বোলো, আমি শিগগিরই বৃন্দাবনে যাচ্ছি, আমার জন্যে যেন একটি জায়গা ঠিক করে রাখে।'

প্রকটলীলায় প্রভু তো আর যান নি বৃন্দাবন, কিন্তু বিগ্রহমূর্তিতে গিয়েছেন। দ্বাদশাদিত্য টিলার কাছে সনাতন প্রভুর শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেছে।

প্রভুর আশীর্বাদ নিয়ে জগদানন্দ রওনা হল। তার জন্যে প্রভুর কত স্নেহব্যাকুলতা। প্রভু যদি আমার প্রতি মনোযোগী থাকেন তা হলেই তো আমি নির্বিঘ্ন-নির্ভয়।

'ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাঁহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার॥'

যে অমিতাহারী বা যে অনাহারী, যে অত্যন্ত নিদ্রাশীল বা যে অত্যন্ত জাগরণশীল তাদের কারুই যোগানুষ্ঠান হয় না। যার আহার বিহার কর্মচেষ্টা নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত তারই যোগসিদ্ধি সম্ভব।

ঐ কথা গীতায় অর্জুনকে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। আবার ভাগবতে বলছেন উদ্ধবকে: আমার প্রতি উর্জিতা ভক্তি যেমন আমাকে বশীভূত করে, যোগ বা সাংখ্য ধর্ম বা তপস্যা বা বেদাধ্যয়ন বা সন্ন্যাস তেমন পারে না।

ভগবান শুধু শুদ্ধ ভক্তের অধীন। বলছেন গোপিনীদের : 'আমার প্রতি ভক্তিই প্রাণিগণের সংসারমোচনের উপায়। আমার প্রতি তোমাদের যে মদাকর্ষক স্নেহ জন্মেছে এ আমারই ভাগ্য।'

ভাগ্য তো বটেই। ভক্ত না থাকলে ভগবান যায় কোথায়? বাঁচে কী করে? ভক্ত সরস বলেই তো ভগবান স্নিগ্ধ হতে পাচ্ছেন।

আবার ভক্তই তো ভগবৎ-অস্তিত্বের প্রমাণ।

৭৩

বনপথ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে জগদানন্দ বারাণসী এল। মিলল তপন মিশ্র আর চন্দ্রশেখরের সঙ্গে। তাদের কাছে বললে সব নীলাচলের কথা।

সেখান থেকে চলে এল মথুরায়। মিলল সনাতনের সঙ্গে। এ বলে, আমার কী সুখ, তোমাকে পেলাম। ও বলে, আমার কী সুখ, তুমি এলে।

সনাতনের গোফাতেই জগদানন্দ আশ্রয় পেল। সনাতন মাধুকরী করে, তাই গোফায় রান্নার ব্যবস্থা নেই। জগদানন্দ রান্নার ব্যবস্থা করল। একদিন সনাতনকেই নিমন্ত্রণ করল ভিক্ষে নিতে।

রান্না করছে জগদানন্দ, দোরগোড়ায় সনাতন এসে বসল। মাথায় গেরুয়াবস্ত্র বাঁধা।

ঐ গেরুয়া বুঝি মহাপ্রভুর প্রসাদী বস্ত্র! জগদানন্দের প্রেমাবেশ হল। তবু জিজ্ঞেস করল, 'এ বসন তুমি কোথায় পেলে!'

'মুকুন্দ সরস্বতী নামে এখানে যে সন্ন্যাসী আছে সে দিয়েছে।'

সহসা স্থান-কাল-পাত্রের ভুল হয়ে গেল, জগদানন্দ ভাতের হাঁড়ি নিয়ে তেড়ে এল সনাতনকে: 'তুমি আরেক সন্ন্যাসীর কাপড় মাথায় বেঁধেছ?'

লজ্জায় ম্লান হয়ে গেল সনাতন—বৃথাই সে জগদানন্দের প্রভু-প্রীতি পরীক্ষা করতে এসেছে। অতিথি-আতিথ্য সে পলকে বিস্মৃত হল, যাকে নিমন্ত্রণ করেছে তারই প্রতি মারমুখো!

'মহাপ্রভুর প্রধান পার্ষদ হয়ে অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি শিরোধার্য করেছ?' জগদানন্দ উদ্যত হাঁড়ি আবার উনুনের উপরই নামিয়ে রাখল: 'এ দেখে কে সহ্য করবে?'

সনাতন বললে, 'ধন্য তুমি। তোমার চৈতন্যনিষ্ঠাই প্রবলতমা। পণ্ডিত, তুমিই মহাপ্রভুকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছ। এই ভালোবাসা প্রত্যক্ষ করবার জন্যই পর-বস্ত্র মাথায় বেঁধেছিলাম। যে বৈষ্ণব আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন বেশ ধারণ করবে তার গৈরিকে কী প্রয়োজন। এ বস্ত্র আমি কোনো পরদেশীকে দিয়ে দেব।'

রন্ধনশেষে অন্ন চৈতন্যকে সমর্পণ করল। দুই ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করে চৈতন্যকথায় নিমগ্ন হল। শেষে চৈতন্যবিরহদুঃখে কাঁদতে বসল দু'জনে।

দুই মাস বৃন্দাবনে থেকে জগদানন্দ ফিরে চলল। বললে, 'প্রভু বলেছেন শিগগির আসছেন তিনি, তুমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

প্রভুর জন্যে কিছু জিনিস দিয়ে দিল সনাতন। রাসস্থলীর বালি, গোবর্ধনের পাথর, পাকা শুকনো পিলুফল আর গুঞ্জামালা। দ্বাদশাদিত্য টিলায় পুরোনো একটা মঠ পেল, তাই প্রভুর জন্যে সংস্কার করে রাখল। মঠের সামনে লতাপাতা দিয়ে ছোট একটা ছাউনি বেঁধে তাতেই বাস করতে লাগল।

জগদানন্দ প্রভুর চরণবন্দনা করে দাঁড়াল। সনাতনের কুশল জানাল, বললে, 'আপনাকে এই সব দিয়েছেন।'

প্রভু সব রাখলেন, শুধু পিলুফল সকলকে বিতরণ করে দিলেন। এ ফল আঁটিশুদ্ধ গিলে খেতে হয়। যারা তা না জেনে চিবিয়ে খেতে গেল তাদেরই মুখের ছাল গেল। বাঙালিরা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাই পিলু খেতে তাদেরই বেশি দুর্ভোগ।

একদিন যমেশ্বরটোটা যাচ্ছেন, প্রভু দূর হতে গীতগোবিন্দের গান শুনতে পেলেন। গুর্জরীরাগে মধুরকণ্ঠে এ কে গায়? গায়ক পুরুষ না স্ত্রী কিছু অনুসন্ধান করবারও অবকাশ মিলল না, তন্ময় হয়ে ছুটলেন গানের উদ্দেশে। সিজের কাঁটার ঘায়ে অঙ্গ রুধিরাক্ত হল তবু প্রভুর খেয়াল নেই। যে কৃষ্ণের গান করে সে না জানি আমার কত বড় বন্ধু।

গোবিন্দ প্রভুকে ধরে ফেলল। বললে, 'প্রভু এ স্ত্রীলোকের গান। কোনো এক দেবদাসী গাইছে।'

দেবদাসী! প্রভু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল।

'গোবিন্দ, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচালে। স্ত্রীলোকের স্পর্শ হলে আমি আর বাঁচতাম না।'

'আমি বাঁচাবার কে? তোমাকে জগন্নাথ বাঁচিয়েছেন।' বললে গোবিন্দ।

'শোনো, সব সময়ে আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে।' প্রভু বললেন, 'আমাকে বিপথে যেতে দেবে না।'

'সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।' পরমায়ুর আর সাত দিন মাত্র বাকি আছে, অন্তত এই সামান্য সাত দিন হরিকথার শ্রবণে-মননে কথনে-কীর্তনে অতিবাহিত করো। সত্যস্বরূপ আনন্দনিধি বিরাট পুরুষের উপাসনা করো, অন্যতর আসক্তিতেই আত্মপাত, অধঃপাত।

যদি এক মুহূর্তও বাকি থেকে থাকে তা হলে তাও অনেক।

জল এল চোখে। কল্পতরু নারায়ণ আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হলেন। দুর্বিষহ প্রেমে আমার অঙ্গ রোমাঞ্চিত হল, কিন্তু কই, সেই একান্তবাঞ্ছিত ভগবৎরূপ আর দেখতে পাচ্ছি না কেন?

আবার মনঃসংযোগ করলাম। প্রাণপণ যত্নে সন্ধান করতে লাগলাম সেই অনির্বচনীয়কে। আর তাঁর দেখা পেলাম না। তখন বাঙ্মনের অগোচর গম্ভীর স্নিগ্ধবাক্যে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, ইহজন্মে তোমাকে আর দেখা দেব না। যাদের কাম দগ্ধ হয় নি তারা আমার দর্শন পায় না। তবে তুমি আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত বলে তোমাকে একবার দেখা দিয়েছি। দীর্ঘকাল সাধুদের সেবা করে তোমার বুদ্ধি আমাতেই দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করো, তা হলেই এই নিরানন্দ লোক পরিত্যাগ করে আমার পার্শ্বচর হতে পারবে। বুদ্ধি একবার আমাতে বদ্ধ হলে তার আর বিচ্ছেদ হবে না। যে আমাকে স্মরণ করে আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তার স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে। এই বলে বেদপ্রসিদ্ধ অশরীরী হরি স্তব্ধ হলেন।

সেই থেকে সমস্ত লজ্জা পরিহার করে অনন্তপুরুষের দুর্বোধ নাম গান ও চরিত্র স্মরণ করে দেশে দেশে ভ্রমণ করতে লাগলাম। নির্লিপ্ত ও বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে কৃষ্ণচিন্তায় কালাতিপাত করছি, আমার মৃত্যুকাল তড়িন্মালার মত সহসা আবির্ভূত হল। ভৌতিক দেহের অবসানে ভগবানের পার্শ্বচরযোগ্য দেহ পেলাম। পরে কল্পাবসানে শ্রীহরি বিশ্বসংহার করে সমুদ্রজলে শয়ন করলে আমি নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হলাম। তারপর সহস্র যুগ অতীত হল। ভগবান সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে নিদ্রোত্থিত হলেন, মরীচি অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষির সঙ্গে আমিও উৎপন্ন হলাম।

তদবধি অখণ্ড ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করে আমি মহাবিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলোকের অন্তর ও বাহ্য সর্বস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দূর-নিকট কোথাও যেতে আমার বাধা নেই, স্বররূপ ব্রহ্মে বিভূষিত এই দেবদত্ত

বীণায় মূর্ছনা তুলে হরিগুণগান করে আমি সর্বত্র বিচরণ করি। সেই গান শুনে হরি আহূতের মত চলে এসে আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন। বিষয়ভোগেচ্ছায় নিপীড়িত অশক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে হরিকথাকীর্তনই ভবসিন্ধুপারের তরণীস্বরূপ। যে ব্যক্তি কামে-লোভে আসক্ত হয়ে যোগপথ অবলম্বন করে সে কিছুতেই শান্তি পায় না, কিন্তু হরিসেবা করলেই আত্মা প্রসন্ন হয়। আমার আর কী কাজ! বীণাস্বরে হরিগুণগান করে নিজে আনন্দিত হয়ে মোহপীড়িত ত্রিলোককে আনন্দিত করছি।'

গৃহহারা রঘুনাথ প্রভুর সঙ্গে আবার আট মাস কাটাল। প্রভু বললেন, 'আদেশ করছি, বৃন্দাবনে যাও, রূপ-সনাতনের সঙ্গে থাকো, ভাগবত পড়ো আর অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম নাও।' রঘুনাথকে আলিঙ্গন করলেন, জগন্নাথের প্রসাদী চোদ্দহাত লম্বা যে তুলসীর মালা পেয়েছিলেন আর যে পানের খিলি, তা তাকে উপহার দিলেন। ইষ্ট-ভক্তিতে নিবিষ্ট হয়ে রইল রঘুনাথ।

বৃন্দাবনে এসে রঘুনাথ রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করল। পড়তে লাগল ভাগবত। প্রেমে অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয় হচ্ছে, অশ্রুতে চোখ আচ্ছন্ন ও কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, পড়ে উঠতে পাচ্ছে না। তারপর যখন কৃষ্ণের সৌন্দর্যের ও মাধুর্যের শ্লোক আসছে, তখন কী যে দেখছে কী যে বলছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বোঝবার দরকারই বা কী! গোবিন্দচরণে আত্মসমর্পণই একমাত্র বস্তু।

এক ধনী-শিষ্যকে বলে রঘুনাথ ভট্ট গোবিন্দের মন্দির করে দিল, সাজিয়ে দিল বিচিত্র অলঙ্কারে, মকরে কুণ্ডলে বংশীতে। গ্রাম্যবার্তা বা বৈষয়িক কথা মুখেও আনে না, কানেও নেয় না, কৃষ্ণকথা-পূজাতেই দিনমান কাটিয়ে দেয়। সকলেই কৃষ্ণভজন করছে এই বিশ্বাসে কোনো বৈষ্ণবের নিন্দাও তার কানে আসে না। প্রভুর দেওয়া তুলসীর মালাটি কণ্ঠে ধরে থাকে।

হে কেশব! হে নাথ! শ্রীকৃষ্ণকে বলছে উদ্ধব, আমি ক্ষণার্ধের

জন্যেও তোমার পাদপদ্ম ত্যাগ করতে সাহস করি না, আমাকেও তোমার স্বধামে নিয়ে চলো। তোমার লীলাচরিত্রের রস-আস্বাদন মানুষের পক্ষে পরমমঙ্গল, তার কর্ণপীযূষ, আর এ রস পেলে মানুষের আর অন্য কামনা থাকে না। আর আমরা যারা তোমার ভক্ত, শয়নে আসনে অটনে অশনে স্নানে গানে তোমার সেবা করেছি প্রিয়তা করেছি, আমরা তোমাকে কি করে ত্যাগ করে থাকব?

এদিকে প্রভুর কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়েছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীদের যে দশা হয়েছিল সেই দশা। উদ্ধবকে দেখে রাধা যেমন বিলাপ করেছিল তেমনি দিব্যোন্মাদ প্রলাপ করছেন।

হে ধূর্তের বন্ধু মধুকর, আমাদের চরণস্পর্শ কোরো না। তোমার মুখে সপত্নীর কুচমণ্ডলে বিলুণ্ঠিত মালার কুঙ্কুম রয়েছে, মধুপতি সেই সব মানিনীরই প্রসাদ বহন করুন। আমাদের প্রসন্ন করে কী হবে? ছি-ছি, এ কি বলবার কথা? তোমার মত দুর্মেধা যেমন ভুক্ত পুষ্প ত্যাগ করে তেমনি। তিনি একবার মাত্র তাঁর মোহিনী অধরসুধা পান করিয়ে আমাদের ত্যাগ করেছেন। পদ্মা কেন তাঁর পাদপদ্ম সেবা করছে? নিশ্চয়ই সেই উত্তমশ্লোকের মিথ্যা কথায় তাঁর চিত্ত অপহৃত হয়েছে। তাঁর গান আমাদের আর শুনিয়ে লাভ কী? আমরা তাঁর দারা নই। যারা সম্প্রতি তাঁর সখী তাদের কাছে গিয়ে তাঁর প্রসঙ্গ গান করো, তারাই তাঁর প্রিয়া, তাঁকে আলিঙ্গন করেই তাদের কুচতাপ শান্ত হয়েছে, তারাই তোমাকে অভীষ্ট পাইয়ে দেবে। যিনি দুঃখীর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করেন, উত্তমশ্লোক আখ্যা তাকেই দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর মত কপটাচারী আর কে আছে? তুমি তো তাঁরই দূত, তাঁরই মতো চাটুকার। তোমার গুণগুঞ্জনে আমরা আর আকৃষ্ট নই।

এমনিতরো বিলাপ, প্রেমবিবশ ব্যাকুলতা।

একদিন প্রভু স্বপ্ন দেখলেন, কৃষ্ণ রাসলীলা করছেন। মণ্ডলাকারে গোপীরা নৃত্য করছে আর মণ্ডলীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিরাজিত।

এখানে এই স্বপ্নে প্রভু না-কৃষ্ণ না-রাধা, তিনি এখানে দর্শক। তিনি এখানে রাধার স্বয়ংরূপে নেই তিনি এখানে রাধার সখীরূপে আবিষ্ট। তাই তিনি দর্শক, রাসলীলার নায়ক-নায়িকা নন।

প্রভুর ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে দেখে গোবিন্দ জাগিয়ে দিল।

নিদ্রায় মনে হয়েছিল রাসস্থলীতে উপস্থিত হয়ে বাস্তব রাসলীলা দেখছেন আর এখন জেগে উঠে জ্ঞান হল স্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ। স্বপ্ন কেন সত্য হল না। তার জন্যে বিষণ্ণ হয়ে রইলেন।

অভ্যাসের বশে যথারীতি নিত্যকৃত্য সমাপন করলেন, গেলেন জগন্নাথদর্শনে।

আজ কেন কে জানে মন্দিরে প্রচণ্ড ভিড়।

প্রভু যথারীতি গরুড়স্তম্ভের পিছে এসে দাঁড়ালেন। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি বরাবর দর্শন করেন জগন্নাথ। আজ সামনে-পিছে আশে-পাশে দারুণ ঠেলাঠেলি। একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক কিছুতেই ভিড় সরিয়ে দেখতে পাচ্ছে না জগন্নাথকে। ব্যাকুল হয়ে এদিক ওদিক উঁকি মারছে কিন্তু চারদিকে মানুষের প্রাচীর। একটু উঁচু হয়ে না দাঁড়ালে তার চোখ জগন্নাথের নাগাল পাচ্ছে না। অনন্যোপায় স্ত্রীলোক ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ধ্যাননিশ্চল প্রভুর কাঁধে পায়ের ভর রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

প্রভুর বাহ্যচেতনা নেই তাঁর কাঁধে এ কী গুরুভার!

গোবিন্দের নজর পড়ল। সে তখুনি সেই স্ত্রীলোককে নেমে দাঁড়াতে বললে।

প্রভু বললেন, 'না, ওকে নিষেধ কোরো না। ও যত খুশি দেখুক জগন্নাথকে। ওর তনু মন প্রাণ জগন্নাথে আবিষ্ট। এত আবিষ্ট যে কারু কাঁধে পা দিয়েছে তারও খেয়াল নেই।'

সেই স্ত্রীলোকটি তখুনি নেমে পড়ল। প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করল।

'আহা, ওর কী আর্তি, কী আনন্দতন্ময়তা! আমার যদি এমন থাকত! ও মহাভাগ্যবতী, ওকে প্রণাম করো। ওর প্রসাদে আমাদের যদি এমন আর্তি জন্মে, যদি এমন তন্ময়তার অধিকারী হই।'

আগের রাত্রের স্বপ্নের আবেশে প্রভু সর্বত্র সেই মুরলীবদনকেই দেখছিলেন, এখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলেন জগন্নাথের সঙ্গে সুভদ্রা বলরামও বিরাজ করছেন।

হঠাৎ আবার মনে হল আমি তো বৃন্দাবনে ছিলাম, কুরুক্ষেত্রে এলাম কি করে! আমার সেই বৃন্দাবন গেল কোথায়? আমার প্রাপ্ত রত্ন আবার হারিয়ে গেল? বৃন্দাবন ছেড়ে আমি এই কুরুক্ষেত্রে এলাম কি করে? এ কুরুক্ষেত্রই বা কোথা থেকে উদয় হল?

বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরে এলেন প্রভু। মাটির উপর বসে নখ দিয়ে রেখা টানতে লাগলেন। দু'-চোখ দিয়ে অজস্রধারে অশ্রু ঝরতে লাগল।

বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, আবার হারালাম কী করে? কে তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কৃষ্ণ ছাড়া আমি এ কোথায় এসে পড়লাম? এ তো কুরুক্ষেত্রও নয়, এ জায়গার নাম কী? এ জায়গাটাই বা কোথায়, এখানে আমাকে কে নিয়ে এল?

দেহের স্বভাবে স্নান-ভোজন করছেন বটে, কিন্তু মন উন্মত্ত হয়ে রয়েছে।

স্বরূপ আর রামানন্দ এলে প্রভু তাদের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

আমার অচ্যুতবিত্ত প্রাপ্ত হয়েও প্রনষ্ট হল। আমার বিষণ্ণ মন দেহ-গেহ ছেড়ে ভিখিরির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ধৈর্য চলে

গিয়েছে, আমি কি করব, যার লোভে বেদধর্ম লোকধর্ম আর্যপথ সমস্ত ছেড়েছি, ছেড়ে বৈরাগী হয়েছি, সেই কৃষ্ণমাধুরী কোথায় লুকোল? সেই বৈরাগী কৃষ্ণলীলাকথার শঙ্খকুণ্ডল কানে পরেছে, কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনের তৃষ্ণাই তার একমাত্র জলপাত্র, আর কৃষ্ণ-প্রাপ্তির আশাই তার কাঁধে ঝুলি হয়ে শোভা পাচ্ছে। চিন্তা-কাঁথাই তার গায়ের চাদর, ধূলিমলিনতাই তার বিভূতি। আর মুখে কৃষ্ণপ্রলাপ। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাই তার দণ্ড। আর লোভই তার শিরোবস্ত্র। দশ ইন্দ্রিয়কে শিষ্য করে মহাবাউল নাম ধরে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে বৃন্দাবনে। স্থাবর প্রজার গৃহে ভিক্ষে করছে, বৃক্ষলতা-কুঞ্জ কুটিরের কাছে। নিচ্ছে ফলমূল। আর জঙ্গমপ্রজা গোপসুন্দরীরা, তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে করছে কৃষ্ণের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ। তমালশ্যামল রূপ, অধররস, গাত্রগন্ধ, অঙ্গস্পর্শ, বাক্যলহর ও বংশীধ্বনি। গোপীদের ভুক্তাবশেষ পেলেও সে পরিতৃপ্ত।

তারপর সে কৃষ্ণধ্যানরূপ যোগাভ্যাস করছে। রাত জাগছে। দেহে অভিনিবেশ নেই, সে এখন ব্যাধি, মোহ আর মূর্চ্ছার কবলে।

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর দশ দশা উপস্থিত হল। চিন্তা জাগরণ উদ্বেগ কৃশতা অঙ্গমালিন্য প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মোহ আর মৃতি।

৭৪

ভিতর-প্রকোষ্ঠে—গম্ভীরায়—প্রভু শুয়েছেন। দ্বারপ্রান্তে শুয়েছে গোবিন্দ আর স্বরূপ দামোদর। রোজ রাত্রে কৃষ্ণনামকীর্তন করে জেগে থাকেন প্রভু, আজ নিঃশব্দ কেন? কী হল?

দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখল, প্রভু নেই। ভিতর দিকের তিন দরজা বন্ধ, প্রভু অন্তর্হিত।

মশাল জ্বেলে খুঁজতে বেরুল সকলে। দেখল জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণের বাইরে সিংহদ্বারের উত্তরে চৈতন্যগোঁসাই পড়ে আছেন।

কিন্তু এ কী বিস্ময়। প্রভুর দেহ পাঁচ-ছ' হাত দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেকটি হাত-পাও প্রায় তিন হাত করে লম্বা। সমস্ত অস্থিগ্রন্থি শিথিল, দু' অস্থির মাঝে প্রায় একবিঘৎ করে ব্যবধান। শুধু গায়ের চামড়াই দুই বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির মাঝে সংযোগ রেখেছে। দেহ নিশ্চেতন, নিশ্বাস পড়ছে না। চোখ শিবনেত্র হয়ে আছে, লালা ঝরছে মুখ দিয়ে।

দেখে সকলেই শোকে-দুঃখে বিমূঢ় হয়ে গেল।

স্বরূপ দামোদর প্রভুর কানে কৃষ্ণ-নাম বলতে লাগল। কৃষ্ণ-কৃষ্ণ —অন্যান্য ভক্তরাও যোগ দিল উচ্চারণে।

ধীরে-ধীরে অনেক পরে কৃষ্ণনাম প্রভুর হৃদয়ে প্রবেশ করল। ফিরে এল বাহ্যজ্ঞান। অমনি 'হরি-বোল' বলে প্রভু গর্জন করে উঠলেন।

কোথায় আর অস্থিসন্ধির ব্যবধান, কোথায় আর অমানুষিক দেহদৈর্ঘ্য? প্রভু স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

'এ আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন স্বরূপকে।

'বাড়ি চলো। সব বলছি তোমাকে।'

প্রভুকে ধরাধরি করে সবাই বাড়ি নিয়ে এল। বললে, তাঁর অন্তর্ধানের কথা, দেহবিস্তারের কথা।

'কী আশ্চর্য, আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না।' বললেন প্রভু, 'শুধু এইটুকু মনে আছে, যেন দেখলাম শ্রীকৃষ্ণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বিদ্যুৎপ্রায় দেখলাম। দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেলেন।'

কৃষ্ণ তো প্রেমবিচ্ছেদ রোগ জানে না, জানে না তার কী যন্ত্রণা! আর প্রেমও এমন, তার স্থানাস্থান জ্ঞান নেই। আমরা যে কত দুর্বল কত ভঙ্গুর তা আবার কন্দর্প জানে না। অপর কি অপরের দুঃখ বোঝে? নিজের জীবনকেই বা বিশ্বাস কী। যৌবনের আয়ু তো দু'তিন রাত্রি। হে বিধাতা, আমার কী গতি হবে?

লোচনদাস ঠাকুর বলছে:

'প্রেম দুরাচার না করে বিচার
স্থানাস্থান নাহি জানে।
সে শঠ লম্পট কুটিল কপট
নিশি দিশি পড়ে মনে॥
হাম কুলবতী নবীনা যুবতী
কানুর পীরিতি কাল।
তাহাতে মদন হইয়া দারুণ
হৃদয়ে হানয়ে শাল॥
আনের বেদন নাহি প্রাণে আন
শুনলো পরাণ সখি।
মোর মনোদুঃখে তুমি নাহি দেখ
আনজনে কাঁহা লখি॥
নারীর যৌবন দিন দুই তিন
যেন পদ্মপত্রের জল।
বিধি মোরে বাম না হেরিল শ্যাম
আমার করম ফল॥'

মন্দিরের প্রভাতশঙ্খ বেজে উঠল। স্নানান্তে প্রভু চললেন মন্দিরে।

প্রভুর এই শাস্ত্রলোকাতীত লীলা সাক্ষাৎদ্রষ্টা ছাড়া আর কে বিশ্বাস করবে? গৌরে যাদের গাঢ় প্রীতি তারা করবে। অন্য লোকে না করুক কী আসে যায়?

নবজাত প্রেমভঙ্গের দুঃখ কৃষ্ণ বুঝবে কী করে? বাইরে ভদ্র, ভিতরে বিপ্রিয়, সে শঠের শিরোমণি। 'পরনারী বধে সাবধান।' বাক্যে-ভঙ্গিতে আর ব্যবহারে খুব মধুর— কিন্তু অন্তরে প্রাতিকূল্য। প্রলুব্ধ করে শেষে প্রত্যাখ্যান করতেই নিপুণ।

সুখের জন্যেই লোকে ভালোবাসে। এ যে বিপরীত হল! প্রেমের গতি স্বভাবকুটিল। সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথই সে বেছে নেয়। সোজা সুখের দিকে না গিয়ে তাই বাঁকা পথে চলল সে দুঃখের দিকে। আর আমার এমন দশা, কৃষ্ণ শঠ কৃষ্ণ নিষ্ঠুর জেনেও তাকে আমি ছাড়তে পারছি না। তার গুণডোরের গ্রন্থি খুলে ফেলে মুক্ত হয়ে যাই তারও সাধ্য নেই। মদন তনুহীন হলে কী হবে, পরদ্রোহে সে প্রবীণ, অন্যকে যন্ত্রণা দিতে পারলেই সে খুশি। দুর্বল জেনেও আমাকে রেহাই দিচ্ছে না। এত দুঃখে ধৈর্য ধরব কী করে, ধরবই বা কতদিন? আমার যৌবনই বা কতক্ষণ থাকবে! নারীর যৌবনধনেই তো কৃষ্ণের আকর্ষণ! তার আয়ু তো দু'চারদিনের। আমার যৌবন চলে যাবার পর যদি কৃষ্ণ আসে তা হলে তাকে আমি কী দিয়ে সেবা করব?

দুঃখের দুয়ার হাট করে দিয়ে প্রভু বিষাদে বিলাপ করছেন।

একদিন প্রভু সমুদ্র-স্নানে যাচ্ছেন, চটক পর্বত তাঁর চোখে পড়ল। চটককে ভাবলেন গোবর্ধন বলে। অমনি চটকের দিকে ছুটলেন প্রেমাবেশে।

গোবিন্দ পিছু নিল। কিন্তু সাধ্য কী প্রভুকে ধরে।

সকলে চিৎকার করে উঠল। ছুটলও সঙ্গে-সঙ্গে। স্বরূপ গদাধর জগদানন্দ, রামাই নন্দাই নীলাই শঙ্কর-পণ্ডিত। খোঁড়া ভগবান আচার্য, সেও চলল।

কতদূর যেতেই প্রভুর 'স্তম্ভ' ভাব উদয় হল, শরীরে জাড্য দেখা দিল, দেখা দিল স্বরভঙ্গ। আর দুই চোখে যেন গঙ্গা যমুনা নেমে এসেছে! গাত্রবর্ণ শঙ্খের মত সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে লাগল

সর্বাঙ্গ। কম্পের ফলে মাটিতে পড়ে গেলেন। গোবিন্দ জল ছিটিয়ে চাইল সুস্থ করতে। প্রভুর অঙ্গে আট-আট সাত্ত্বিক বিকার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। আবার কৃষ্ণনামের ধ্বনি তোলো।

হরিবোল বলে প্রভু আবার আচম্বিতে উঠে বসলেন। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। যা দেখছিলেন এতক্ষণ তা যেন আর পাচ্ছেন না দেখতে।

'গোবর্ধন থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এল কে?' স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন প্রভু, 'কৃষ্ণলীলা দেখছিলাম, কিন্তু সাধ মিটিয়ে দেখা হল কই? কৃষ্ণ আর গোচারণ করে কি না দেখবার জন্যেই আমার গোবর্ধন যাওয়া। গোবর্ধনে গিয়ে দেখি পাহাড়ে চড়ে কৃষ্ণ বেণু বাজাচ্ছে আর চারদিকে ধেনু বিচরণ করছে। বেণুনাদ শুনে রাধাঠাকুরাণী এসে উপস্থিত। সখি, রাধার-রূপ আর ভাব বর্ণনা করতে পারি আমার এমন সাধ্য নেই। রাধাকে নিয়ে কৃষ্ণ গোবর্ধনের নিভৃত গহ্বরে প্রবেশ করল। সখিরা আমাকে বললে কিছু ফুল তুলে নিয়ে এস। রাধাগোবিন্দের সেবার জন্যে ফুল তুলতে যাচ্ছি, তোমরা কোলাহল করে উঠলে, আমাকে ধরে নিয়ে এলে এখানে। অনর্থক দুঃখ দেবার জন্যে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? আমার কৃষ্ণলীলা দেখা শেষ হল না।' কাঁদতে লাগলেন প্রভু।

প্রভু বুঝি এখন গোপীভাবে আবিষ্টা। কিন্তু এই গোপীভাবও রাধাভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রাধাও কখনো কখনো নিজেকে ললিতা ও ললিতাকে রাধা বলে ভেবেছে।

পরমানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী এসে হাজির। তাদের দেখে প্রভুর বাহ্যদশা সম্পূর্ণ ফিরে এল। দু'জনে প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করলে। প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা এতদূরে কেন এসেছ?'

'তোমার লীলা দেখতে। দিব্যোন্মাদলীলা।'

কৃষ্ণের রূপসেবা ছাড়া আমার ইন্দ্রিয়গুলির কাজ কী! কৃষ্ণরূপ আমার চোখ দ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণকথা আমার জিহ্বা দ্বারা সেবনীয়,

কৃষ্ণগাত্রগন্ধ আমার নাসিকাদ্বারা সেবনীয়, কৃষ্ণাঙ্গস্পর্শ আমার ত্বক দ্বারা সেবনীয় আর কৃষ্ণকণ্ঠস্বর ও কৃষ্ণবংশীধ্বনি আমার কান দ্বারা সেবনীয়। এই সেবা ছাড়া আমার ইন্দ্রিয়বর্গ ব্যর্থ। যে পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠে কাজ হয় না তা আমি সারাজীবন বহন করে মরি কেন ?

যে নয়ন কৃষ্ণের মুখখানি না দেখে তার মাথায় বাজ পড়ুক। যে কান কৃষ্ণকথা শোনে না তা সচ্ছিদ্র কানাকড়ির মতই মূল্যহীন। যে নাক কৃষ্ণাঙ্গসুবাস পায় না তার সঙ্গে কামারের হাপরের তফাৎ কী। যে জিহ্বায় কৃষ্ণনাম নেই তা তো ভেকজিহ্বা। আর যে কৃষ্ণকরতল বা কৃষ্ণপদতল স্পর্শ করতে পারল না তার শরীর দগ্ধলৌহ।

যখন স্বপ্নে বা দৈবাৎ কৃষ্ণকে আমি দেখি আমার দুই শত্রু এসে উপস্থিত হয়। এক শত্রু আনন্দ, আরেক শত্রু মদন। হায়, প্রেমানন্দও আমার শত্রু। প্রেমানন্দে যে সেবানন্দে বাধা পড়ে। তারপর মিলনের লালসায় চিত্তে মত্ততা জাগে। দুয়ে মিলে আমার অভিনিবেশ হরণ করে নিল। নয়ন ভরে আর দেখা হল না।

এইভাবে রাত্রিদিন প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে অবস্থান করছেন। কখনো ভাবে মগ্ন, মানে অন্তর্দশা, কখনো অর্ধবাহ্যদশা, কখনো বাহ্যজ্ঞান। দেহস্বভাবে স্নানাহার ও দর্শন চলছে। একদিন মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথকে দেখতে দেখলেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন বসে আছেন। কৃষ্ণের পঞ্চগুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—একসঙ্গে প্রভুর চিত্তে স্ফুরিত হল, পঞ্চ রজ্জু দিয়ে বেঁধে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করল। টানাটানিতে প্রভুর মন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হতে লাগল—কোন দিকে আগে যায় !

স্বরূপ আর দামোদরের কণ্ঠ ধরে বিলাপ করতে লাগলেন প্রভু।

সখি, যিনি সৌন্দর্যামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে ললনাচিত্ত সংপ্লাবিত করেন, যাঁর রম্যবচন পরিহাসসুন্দর ও কর্ণসুখদ, যাঁর অঙ্গ কোটিচন্দ্র থেকেও সুশীতল, যিনি তাঁর গাত্রসৌরভে সমগ্র জগৎকে আমোদিত করেন,

যাঁর দু'টি অধর পীযূষরমণীয়, তিনি বলপ্রয়োগে আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করছেন।

যার মাধুর্য বলে শেষ করা যায় না সেই কৃষ্ণের রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ দেখে আমার পঞ্চজন, মানে পঞ্চেন্দ্রিয়, লুব্ধ হয়ে উঠেছে। আমার মন এক একক অশ্ব, সে একই সঙ্গে পাঁচ দিকে ধাবমান হয়েছে। আমার পঞ্চেন্দ্রিয় মহালম্পট দস্যু, পরধন হরণেই সুদক্ষ। এ-ক্ষেত্রে কৃষ্ণের পঞ্চরস লুটে নিতেই তারা সমুৎসুক। এক মন কোন দিকে যাবে? সবাই যদি একসঙ্গে টানে ঘোড়া বাঁচে কী করে?

কৃষ্ণের অমৃতসিন্ধুর কথা তোমাকে আর কী বলব! সেই সিন্ধুর একবিন্দু তরঙ্গ সমস্ত জগৎ ভাসিয়ে দিতে পারে। কুলকামিনীরা তাদের পাতিব্রত্যের যে উচ্চ গিরিচূড়ায় এসে আশ্রয় নিয়েছে সেই চূড়াকেই এই তরঙ্গ আগে ডোবায়। কৃষ্ণের বচনমাধুরী নানা রসে পরিহাসময়। সে টানছে কানকে। টানাটানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। কৃষ্ণের শীতল অঙ্গ নারীর সশৈলবক্ষকে টেনে বেঁধে আনছে। কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ মৃগমদের অহঙ্কার ম্লান করে দিচ্ছে। তারপর তার অধরামৃতের কথা কে বলে?

'আমাকে উপায় বলে দাও, কী করলে কোথায় গেলে পাবো আমার কৃষ্ণকে?' প্রভু বিলাপ করতে লাগলেন, 'আমার কৃষ্ণ ছাড়া দিন কাটে না।'

আরেকদিন সমুদ্রস্নানে যেতে আচম্বিতে একা-একা একটা ফুলবাগান দেখলেন প্রভু। ফুলবাগান দেখে মনে হল এই বুঝি বৃন্দাবন। বৃন্দাবনের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, কৃষ্ণকে খুঁজতে লাগলেন ব্যাকুল হয়ে। রাসস্থলী থেকে রাধাকে নিয়ে অন্তর্হিত হবার পর গোপবধূরা যেমন বনে বনে ভ্রমণ করেছিল আর তরুলতাকে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞেস করেছিল তেমনি এক কৃষ্ণান্বেষণ ও কৃষ্ণজিজ্ঞাসা পেয়ে বসল প্রভুকে। তিনিও বৃক্ষলতাদের সম্বোধন করে জানতে চাইলেন

তাঁর কৃষ্ণ কোথায়? কোন পথ ধরে কোন দিকে সে চলে গেল তোমরা কি কিছু দেখেছ? আমাকে পথের হদিস দেবে?

হে তরুগণ, তোমরা পরার্থভর, পরোপকারের জন্যেই তোমাদের জন্ম। নিজের ফুলও তোমরা নাও না, ফলও তোমরা খাও না। পরের জন্যে সমস্ত উৎসর্গ করে দাও। তোমার ছায়ায় দাঁড়িয়ে বা তোমারই শাখায় বসে যদি তোমাকে আঘাতও করে তাকেও কিছু বল না, বরং তোমার ডাল যে ছিন্ন করেছে তাকে সেই কাটা ডালটাও অনায়াসে নিয়ে যেতে দাও। তোমরা পুণ্যাত্মা, সত্যবাদী, সুতরাং একবাক্যে বলো আমার কৃষ্ণ কোথায়? পরোপকার সাধন করাই তোমাদের জীবনের ব্রত। সুতরাং কৃপা করে বলো আমার কৃষ্ণ কোথায় হারাল?

বৃক্ষদের নীরব দেখে ক্ষুব্ধ হলেন প্রভু। বললেন, 'এ সব গাছ নিশ্চয়ই পুরুষ, তাই কৃষ্ণের সখাতুল্য। তারা আমাকে সঠিক খবর দেবে কেন? কিন্তু বৃক্ষলগ্ন এই লতাগুলি তো স্ত্রীজাতি, এরা নিশ্চয়ই আমার মনের দুঃখ বুঝবে। তোমরা দেখেছ কৃষ্ণকে, কৃষ্ণকে উদ্দেশ করে তাই বেঁচে থাকো। তোমাদের আর ভয় কী। তোমরা আমার সখিতুল্য। এবার তবে বলে দেবে আমার কৃষ্ণ কোথায়?'

লতারাও নিরুত্তর। তারা বলবে কেন? তারা যে কৃষ্ণের দাসী। তাদের পত্রপুষ্পে যে কৃষ্ণের অঙ্গভূষণ হয়। তারা তাই কৃষ্ণের লোক, কৃষ্ণের ভয়েই তারা স্তব্ধ হয়ে আছে।

দেখ, কৃষ্ণ-অঙ্গের গন্ধ পেয়ে হরিণী এসেছে। দেখ তার চোখ দু'টি কী উজ্জ্বল আর প্রসন্ন। নিশ্চয়ই সে দেখেছে কৃষ্ণকে। এস তাকে জিজ্ঞেস করি।

হে মৃগপত্নী, তোমরা কি দেখেছ আমার কৃষ্ণবক্ষের কুন্দমালা রাধাবক্ষের কুঙ্কুমে লিপ্ত হয়েছে? তার থেকে গন্ধ উঠেছে অপূর্ব! বলো, আমরা রাধার প্রিয়সখী, আমাদের কাছে তোমার সঙ্কোচের কারণ নেই। তোমায় সুখ দিতে কৃষ্ণ কি রাধাসহ এসেছিল এখানে?

ধরেছিল মদনমোহন বেশ ? আমরা জানি, বলে দিতে পারি, রাধার কোন অঙ্গের সঙ্গে কৃষ্ণের কোন অঙ্গের সঙ্গ হয়েছে। হ্যাঁ, দূর থেকেই বলে দিতে পারি, আর তা শুধু বাতাসে ভেসে আসা গন্ধের থেকে। আমরা রাধার কুচকুঙ্কুমের গন্ধ জানি। সেই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে কুন্দগন্ধ আর কুন্দের মালা কৃষ্ণের গলার। তুমি বলে দাও রাধাসহ তিনি কোথায় অদৃশ্য হলেন !

মৃগী নিজেই হয়তো কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল। তাই আমার কথাই সে শুনছে না। উত্তর দেবে কী !

আর এই গাছগুলোর এমন দশা কেন ? ফলপুষ্পভারে নুয়ে পড়ে তারা ভূমি প্রায় স্পর্শ করে আছে। তার মানেই তারা কাউকে নমস্কার করছে। তবে সন্দেহ কী, এখানে এসেছিল কৃষ্ণ, আর তাকে নমস্কার করবার জন্যেই গাছগুলো ফলেপুষ্পে আভূমি নত হয়ে পড়েছে।

বলো, তোমাদের প্রণাম কি কৃষ্ণ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে অঙ্গীকার করেছে ? যখন তোমরা প্রণাম করছিলে তখন হয়তো কৃষ্ণ লীলাপদ্ম সঞ্চালন করে তার প্রেয়সীর মুখ থেকে ভৃঙ্গকে তাড়াবার চেষ্টায় অন্যচিত্ত হয়েছিল, তোমাদের প্রণাম সে দেখতে পায় নি। বলো তোমাদের কি কৃষ্ণ অপমান করেছে ?

গাছের মুখেও কথা নেই। তারা বলবে কী, তারা তো নিজেরাই শোককাতর, যেহেতু তারা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণের তিরোধানে তারা নিজেরাই হতজ্ঞান।

তার পর প্রভু যমুনা ভাবলেন সমুদ্রকে। সেখানে কদম্বের নিচে দেখলেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে—কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন কৃষ্ণ।

আনন্দের আতিশয্যে মূর্ছিত হলেন প্রভু। আবার বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে কাঁদতে বসলেন—এখুনি যে কৃষ্ণকে দেখছিলাম, সে কোথায় গেল ? কোথায় লুকাল তার বাঁশি ?

নবজলধরের চেয়েও সুন্দর দেহকান্তি, নববিদ্যুতের চেয়েও

মনোহর বসন, মুরলীশোভিত মুখখানি যেন অকলঙ্ক শারদ-শশী, কেশকলাপে ময়ূরপুচ্ছ আর তারকার মত উজ্জ্বল মুক্তাহারের শোভা —এমন যে কৃষ্ণ মদনমোহন, সে আমার নেত্রস্পৃহা ক্রমশই বাড়িয়ে চলেছে!

৭৫

রাধাভাবে রামানন্দকে সখী বলে সম্বোধন করছেন প্রভু। বলছেন, 'সখি, বলো, কী করে চোখ ফিরিয়ে নেব? মন কী করে ভাববে আর অন্য কথা? আমার চোখ চাতকপাখি আর কৃষ্ণ জলভরা কালো মেঘ—চাতক কী করে মেঘের থেকে মন ফেরাবে? আর মেঘের মধ্যে দেখছ সৌদামিনীকে? মনে হচ্ছে যেন তমাল-শ্যামল কৃষ্ণ পীতাম্বর পরে রয়েছে। আর দেখছ ঐ বকপাঁতি? মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণের গলায় দুলছে মুক্তাহার। সেই সঙ্গে আবার দু'টো ইন্দ্রধনু উঠেছে। উপরেরটা কৃষ্ণের মাথায় শিখি-পাখা আর নিচেরটা বৈজয়ন্তীমালা।

দেখ দেখ নবীন মেঘের মধুর গর্জন শুনে ময়ূর নৃত্য করতে সুরু করেছে। এ কি বৃন্দাবনে সেই কৃষ্ণের বাঁশির স্বর-শোনা ময়ূরের নাচ নয়? আকাশের চাঁদ তো দেখেছ, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি আছে কিন্তু আমার কৃষ্ণের বদনচাঁদ যে ষোলকলায় ভরা, তা যে চিরন্তন পরিপূর্ণ। আকাশের চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু আমার কৃষ্ণের বদন-চাঁদে কালিমার ছায়াটুকুও নেই, সর্বক্ষণই তা লাবণ্যজ্যোৎস্নায় ঝলমল করছে। আর তোমার আকাশের মেঘ জলের বেশি আর কিছু ঢালতে পারে না, কিন্তু আমার কৃষ্ণমেঘ অমৃত বর্ষণ করে, সেই লীলামৃতে চৌদ্দ ভুবনের ত্রিতাপ-জ্বালার নিবারণ হয়। দুর্দৈব মেঘ

আমার সেই কৃষ্ণমেঘকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল? সেই মাধুর্যবারি ছাড়া এ পিপাসিত চাতকের প্রাণ কী করে থাকে? রাম রায়, তুমি আবার শ্লোক পড়ো, আমার শ্যামসুন্দরের রূপ গুণ বর্ণন করো।'

রামানন্দ পড়তে লাগল।

প্রভু নিজেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। কৃষ্ণের মুখ পদ্ম ও চন্দ্র উভয়কেই জয় করেছে। আর অধরে এমন একটি হাসি এঁকে রেখেছে যার ফাঁদে বন্দী হচ্ছে গোপসুন্দরীর দল আর বলছে, হে পুরুষভূষণ, আমাদের তোমার দাসী করো। কুলধর্ম গৃহধর্ম দেহধর্ম পর্যন্ত মানছে না। বন্ধু, বলো, এ কি কৃষ্ণের ব্যাধের আচার নয়? নইলে কি কেউ নারী-মৃগী-মর্ম ছেদন করে? তার সস্মিত কটাক্ষবাণ কে প্রতিহত করবে, কার সাধ্য? আর নিরীহ নারীবধে তার এতটুকু ভয় নেই? তার মুখই তো সুন্দর নয়, তার বুকও সুন্দর। তার বুক উন্নত ও সুবিস্তার, দক্ষিণে শ্রীবৎস ও বামে স্বর্ণবর্ণ লক্ষ্মীরেখা —কিন্তু আসলে তা ডাকাতে বুক, লক্ষ-লক্ষ ব্রজযুবতীকে হরিদাসী করবার জন্যেই উন্মুখ। বাহুযুগল যেন কৃষ্ণসর্প, যে দেখবে তারই হৃদয়ে গিয়ে দংশন করবে আর সে মরবে কন্দর্পজ্বালায়। কিন্তু কৃষ্ণের করতল পদতল কোটিচন্দ্রের চেয়েও সুশীতল, তার মুখেই আবার স্মরজ্বালার উপশম। তাই কামক্লিষ্ট যুবতীরা সেই করপদতল স্পর্শের জন্য লালায়িত।

রাধা যেমন বিশাখার কাছে কৃষ্ণবিরহের দুঃখ জানাচ্ছে তেমনি রাধাভাবাবিষ্ট প্রভু রামানন্দের কাছে জানাচ্ছেন তাঁর বিরহকাতরতা।

সখি, সেই হরিচন্দনশীতাঙ্গ মদনমোহন আমার বক্ষস্পৃহা বর্ধিত করে কোথায় অদৃশ্য হল? এই তাকে দেখলাম, আবার এই সে হারিয়ে গেল। কৃষ্ণের স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল, এক জায়গায় কখনো স্থির হয়ে থাকে না, দেখা দিয়ে মনোহরণ করেই তিরোহিত হয়।

রাসলীলায় গোপীরা যখন কৃষ্ণকে পেল তখন তাদের সৌভাগ্যগর্ব

হ'ল, রাধিকার হ'ল প্রণয়মান। গোপীদের গর্ব হ'ল কৃষ্ণ সকলের সঙ্গেই সমান বিলাস করছে, কারু প্রতি উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য নেই, কৃষ্ণ সমানস্নেহ, কিন্তু রাধিকার মান হ'ল, সে প্রেয়সীদের মুখ্যতমা, তবু তার প্রতি কৃষ্ণের কোনো বিশেষ আদর নেই। সেই গর্ব ও সেই মান ভাঙবার জন্যেই কৃষ্ণ অন্তর্ধান করল।

কিন্তু রাধিকার মানভঙ্গ হ'ল কী করে? কৃষ্ণ যে একা রাধিকাকে নিয়েই অন্তর্ধান করল। রাসলীলার পরে এ আরেক রহস্যলীলা।

'স্বরূপ, এমন গান গাও যাতে আমার বিরহবেদনার অবসান হয়।' প্রভু স্বরূপকে লক্ষ্য করলেন।

স্বরূপ গীতগোবিন্দের শ্লোক কীর্তন করতে লাগল:

'সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা,
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা।'

গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ সমান ব্যবহার করছে দেখে রাধিকার ঈর্ষা হল। সে লতাকুঞ্জে একাকিনী গিয়ে বসল। অতি দীনার মত সখীকে বলতে লাগল, সখি, এই মহারাসে যে বিবিধরূপে বিলাস করেছিল সেই পরিহাসবিশারদকে আমার এখন মনে পড়ছে। বলতে পারো, সেই প্রাণমনহারী হরিকেই কেন আমি বিরলে বিজনে স্মরণ করছি।

সে কী রকম হরি? তার মোহনবংশী তার অধরসুধামধুর ধ্বনিতে মুখরিত, তার ইতস্তত কটাক্ষ-বিক্ষেপে তার মুকুট চঞ্চল, কপোলে কুণ্ডল দোলায়মান। কেশদাম অর্ধচন্দ্রাকারে বলয়িত, তাতে শোভা পাচ্ছে ময়ূরপুচ্ছ, ইন্দ্রধনু অনুরঞ্জিত নবজলধরের কান্তি তার সর্বাঙ্গে। নিতম্বিনী গোপিনীদের মুখচুম্বনের লোভে সে উদ্দীপ্ত, তার অধরপল্লব মৃদুহাস্যে উল্লসিত, বিহ্বলকোমল ভুজদ্বয়ে বল্লবযুবতীরা আলিঙ্গনাবদ্ধ। তার করচরণ-কিরণচ্ছটায় সমস্ত অন্ধকার বিগলিত। তার কথা ভাবছি। চোখে ভাসছে তার সেই অনঙ্গতরঙ্গিত দৃষ্টি, তার কলহক্লেশনাশন চাটুবাক্য।

শুনতে-শুনতে প্রভুর প্রেমাবেশ হল। অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকট হল, প্রভু নাচতে লাগলেন। ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ, মাদনাখ্য মহাভাব উপস্থিত হল।

প্রভুর শ্রম দেখে থামল স্বরূপ, পদকীর্তন শেষ করল।

'বলো, বলো, আরো বলো।'

ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করে উঠল। রামানন্দ পাখা করতে লাগল, মুছিয়ে দিল গায়ের ঘাম। সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে বাসায় ফিরিয়ে আনল। ভোজন করিয়ে শুইয়ে দিল প্রভুকে।

এমনি ভাবে প্রণয়বিহ্বল হয়ে ভক্তসঙ্গে প্রভু আছেন নীলাচলে।

এবার গৌড়ভক্তদের সঙ্গে কালিদাস এসেছে। রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি খুড়ো, বৈষ্ণবের পদরজে ও উচ্ছিষ্টে এর প্রবল নিষ্ঠা। সরল, উদার, মহাভাগবত, কৃষ্ণনামসঙ্কেতেই লোকব্যবহার করে। কাউকে ডাকতে হলে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে, সম্মতি বোঝাতেও সেই বুলি। সে যে পাশা খেলে তাও হরেকৃষ্ণ বলে ধ্বনিত হয়ে ওঠবার সুযোগ পাবে বলে।

ছোট-বড় বিচার না করে পরিচিত সকল বৈষ্ণবেরই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করে কালিদাস। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে বৈষ্ণববাড়িতে যায়, গিয়ে বলে উচ্ছিষ্ট করে দিন, আমি তাই খাব তৃপ্তি করে। যদি কেউ উচ্ছিষ্ট না দেয় কালিদাস লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে কোথায় এ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ফেলা হয়। তারপর সেই আবর্জনা থেকে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে খায়।

ঝড়ুঠাকুর বৈষ্ণব কিন্তু জতিতে ভুঁইমালি। তার বাড়িতে কতগুলো আম নিয়ে একদিন হাজির হল কালিদাস। ঝড়ুঠাকুর ও তার স্ত্রীকে আম দিয়ে প্রণাম করল, বলল কৃষ্ণকথা। ঝড়ুঠাকুর বললে, 'আমি নীচ জাতি, তুমি সৎকুলোদ্ভব অতিথি, বলো কী দিয়ে তোমার সেবা করব? তুমি আদেশ করো, কোনো ব্রাহ্মণের ঘরে তোমার

আহারের বন্দোবস্ত করি। তুমি যদি প্রসাদ না পাও, অভুক্ত চলে যাও, তা হলে আমি বাঁচব না।'

কালিদাস বললে, 'ঠাকুর, আমি পতিত, আমি পামর, তোমার দর্শনে পবিত্র হবার জন্যে এসেছি। তোমার কাছে আমার শুধু এক প্রার্থনা, আমাকে তোমার পদরজ দাও, আমার মাথায় তোমার শ্রীচরণ রাখো।'

ঝড়ুঠাকুর অস্থির হয়ে উঠল। বললে, 'ছি ছি, ও কী কথা, ও কথা বলতে নেই। আমি নীচ জাতি আর তুমি সুসজ্জন, তুমি অমন অসঙ্গত প্রার্থনা কোরো না।'

'কিন্তু শাস্ত্রে কী বলেছে?' শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাল কালিদাস: 'চতুর্বেদী ব্রাহ্মণও যদি ভক্তিশূন্য হয় সে আমার প্রিয় নয় আর চণ্ডালও যদি আমাতে ভক্তিমান হয় সে আমার প্রিয় হয়। সুতরাং ভক্ত চণ্ডালকেই সৎপাত্র জ্ঞান করে দান করবে আর তার কাছ থেকেই প্রতিগ্রহ করবে। সে যে আমারই মত পূজ্য। আবার শোনো। কৃষ্ণচরণে ভক্তি নেই এমন দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণের চেয়ে কৃষ্ণচরণে মন বাক্য চেষ্টা অর্থ ও প্রাণ অর্পণ করেছেন এমন চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ মনে করি। যেহেতু সেই চণ্ডাল নিজের কুলকে পবিত্র করতে পারেন কিন্তু সেই বহুগর্বিত ভূরিমান ব্রাহ্মণ তা পারে না।'

ঝড়ুঠাকুর বললে, 'হ্যাঁ, শাস্ত্রে তা বলেছে বটে কিন্তু আমার সেই ভক্তি কই? আমি শুধু হেয়কুলেই জন্মেছি, কৃষ্ণভক্তির কানাকড়িও আমাতে নেই।'

কালিদাস আর কি করে, ফিরে চলল। ঝড়ুঠাকুর কয়েক পা এগিয়ে দিল কালিদাসকে।

ঝড়ুঠাকুর চলে গেল ফিরে দাঁড়াল কালিদাস। দেখল পথের ধুলোয় ঝড়ুঠাকুরের পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। সেই ধুলো তুলে নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে।

তারপর ঝোপ-ঝাপের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

ঝড়ুঠাকুর ঘরে ফিরে এসে সেই আম মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রকে নিবেদন করল। তারপর স্বামী-স্ত্রীতে আম খেয়ে আঁঠি আর খোসা ফেলে দিলে আঁস্তাকুড়ে। কালিদাস তা দেখল, পরে চুপি-চুপি সেখান থেকে চোষা আঁঠি কুড়িয়ে নিয়ে চুষতে লাগল। চুষতে-চুষতে তার প্রেমোল্লাস হল।

প্রভু জগন্নাথদর্শনে মন্দিরে যান, জলকরঙ্গ নিয়ে সঙ্গে যায় গোবিন্দ। সিংহদ্বারের উত্তরে বাইশসিঁড়ির নিচে কপাটের আড়ালে একটা গর্ত আছে, সেখানে প্রভু প্রত্যহ পা ধোন। পা-ধুয়ে, পরে সিঁড়ি ভেঙে যান ঈশ্বরদর্শনে। গোবিন্দকে বলে দিয়েছেন, দেখো, আমার পাদোদক যেন কেউ না নেয়।

মন্দিরে যাবার আগে প্রভু সেদিন পা ধুচ্ছেন কালিদাস হাত পেতে এসে দাঁড়াল। একে-একে তিন অঞ্জলি জল নিয়ে সে পান করল। তারপর প্রভু তাকে বারণ করলেন, বললেন, 'আর নয়, তোমার বাসনা এতেই পূর্ণ হয়েছে।'

প্রভু জানেন কালিদাসের বৈষ্ণবশ্রদ্ধা, তাই যে প্রসাদ অন্যের পক্ষে দুর্লভ তাই পাইয়ে দিলেন তাকে। বুঝিয়ে দিলেন শুধু বৈষ্ণব-নিষ্ঠায়ই ভগবানের মহৎ কৃপা লাভ করা যায়।

বাইশসিঁড়ির উপর দক্ষিণ দিকে এক নৃসিংহমূর্তি আছে, প্রভু প্রত্যহ তাকে প্রণাম করেন আর বলেন, 'যিনি প্রহ্লাদের আহ্লাদদাতা, যার পাষাণ-দারণ নখ হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলা ছিন্ন করেছে সেই নরসিংহদেবকে প্রণাম করি। এখানে নৃসিংহ ওখানে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাচ্ছি সর্বত্র নৃসিংহ, অন্তরে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আদিপুরুষ নৃসিংহেই আমি শরণাগত হলাম।'

দর্শনান্তে প্রভু ঘরে এসে আহার করছেন, দেখলেন বহির্দ্বারে কালিদাস প্রত্যাশা করে বসে আছে। প্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করলেন, গোবিন্দ কালিদাসকে প্রভুর ভুক্তাবশেষ খেতে দিল।

যে ঘৃণা লজ্জা ছেড়ে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খেতে পারে সেই চূড়ান্ত কৃপার অধিকারী হয়।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টের নাম মহাপ্রসাদ আর ভক্ত-বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের নাম মহা-মহাপ্রসাদ।

'ভক্ত পদধূলি আর ভক্ত পদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ— তিন মহাবল॥'

এই তিনের সেবা থেকেই কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস। ভক্তপদধূলিতে অভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত যাগযজ্ঞ তপস্যা বা বেদপাঠ দ্বারা ভগবৎতত্ত্বের জ্ঞানোদয় হয় না। সাধুদের চরণধূলির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় ভগবানের পদস্পর্শ।

শিবানন্দ সেন এবার তার শিশুপুত্র পুরীদাসকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সাত বছরের ছেলে প্রভুর চরণ বন্দনা করলে। প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণ বলো।'

শিশু মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

'কৃষ্ণনাম বলো।' প্রভু আবার আদেশ করলেন।

পুরীদাস যেমন নীরব ছিল তেমনি নীরব রইল।

শিবানন্দ অবাক মানল। সে কী, বলো কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

শিশু তখনো নিঃশব্দ। কৃষ্ণনাম বলল না কিছুতেই।

'আমি সর্বজগৎকে কৃষ্ণনাম নেওয়ালাম,' প্রভু বললেন, 'স্থাবর জঙ্গম সকলে কৃষ্ণনাম বলল আর এই এক শিশুর কাছে পরাস্ত হলাম। কিছুতেই পারলাম না কৃষ্ণনাম নেওয়াতে।'

স্বরূপ দামোদর বললে, 'আমি জানি এর কী রহস্য। তুমি যেই শিশুকে কৃষ্ণনাম নিতে বলেছ ও ভেবেছে ঐ 'কৃষ্ণ'ই বুঝি তার দীক্ষামন্ত্র। তাই শিশু তার দীক্ষামন্ত্র কারু কাছে প্রকাশ করছে না। মুখে না বললেও মনে হচ্ছে মনে-মনে সে কৃষ্ণনামই জপ করছে।'

আরেকদিন পুরীদাসকে প্রভু বললেন, 'পুরীদাস, শ্লোক বলো।'

তখুনি সে সাত বছরের ছেলে মুখে মুখে শ্লোক রচনা করে বসল।

'যিনি বৃন্দাবনরমণীদের শ্রবণ যুগলের কুবলয়, চক্ষু যুগলের কজ্জল, বক্ষঃস্থলের মহেন্দ্রমণিমালা, যিনি অখিলমণ্ডল নিখিলভূষণ-স্বরূপ, সেই শ্রীহরির জয় হোক।'

সাত বছরের বালক, লেখাপড়া শেখে নি, তার মুখে এই শ্লোকোচ্চার! সকলে একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। কিন্তু চৈতন্য-প্রভুর কৃপার মহিমাই এমনি! আরো শৈশবে বালকের মুখে প্রভু তাঁর পাদাঙ্গুষ্ঠ দেন নি? তারই জন্যে হয়তো এই কাব্যবিকাশ।

আর এই পুরীদাসই তো কবি কর্ণপূর! আর তারই লেখা তো আনন্দবৃন্দাবনচম্পু।

একদিন প্রভু জগন্নাথদর্শনে গিয়েছেন, সিংহদ্বারে দারোয়ান তাঁকে প্রণাম করল। প্রভু তাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমার কৃষ্ণ আমার প্রাণনাথ কোথায়?'

দারোয়ান অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'কই দেখাও, আমাকে আমার কৃষ্ণকে দেখাও।' বলে প্রভু দারোয়ানের হাত ধরলেন।

দারোয়ান বললে, 'বেশ, এস আমার সঙ্গে, দেখাব তোমাকে। এই মন্দিরে আছেন তোমার ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

'তুমি আমার বন্ধু, দেখাও কোথায় আমার প্রাণনাথ।' রাধাভাব-বিভোর প্রভু বললেন আকুল হয়ে।

'এই দেখ তোমার পুরুষোত্তমকে দেখ। চোখ ভরে দেখ।' বললে দারোয়ান।

প্রভু গরুড়স্তম্ভের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন জগন্নাথ মুরলীবদন হয়েছে।

প্রাণভরে প্রিয়তমকে দর্শন করতে লাগলেন প্রভু।

এমন সময় জগন্নাথের সকালবেলাকার গোপালবল্লভ-ভোগ

লাগল, বাজল আরতির শঙ্খঘণ্টা। ভোগান্তে জগন্নাথের সেবকেরা প্রভুর গলায় প্রসাদী মালা পরিয়ে দিল। হাতে দিল প্রসাদ। আস্বাদ তো পরের কথা, প্রসাদের গন্ধই মনকে মাতিয়ে তোলে। প্রসাদের কিঞ্চিৎ প্রভু মুখে দিলেন, বাকিটা গোবিন্দকে বললেন কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নিতে, ভক্তজনে বিতরণ করতে হবে। প্রসাদের আস্বাদে প্রভুর সর্বাঙ্গে পুলক সঞ্চার হল, নেত্রে নামল অশ্রুধার।

'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কি করে এল?' প্রভু নিজের মনেই বিচার করলেন: 'যেহেতু এতে কৃষ্ণের অধরামৃত লেগেছে।

'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কাঁহা হৈতে আইল?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহাঁ সঞ্চারিল॥'

প্রসাদস্বাদে প্রেমাবিষ্ট হয়ে প্রভু বারে বারে বলতে লাগলেন, 'সুকৃতিলভ্য ফেলালব।'

এ কথার অর্থ কি? সেবকেরা জিজ্ঞেস করল প্রভুকে।

প্রভু বললেন, 'কৃষ্ণের যে ভুক্তাবশেষ তার নাম ফেলা। আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে লব বলে। তাই কৃষ্ণের প্রসাদের ক্ষুদ্র অংশ বা কণিকাই ফেলালব। সুকৃতির অর্থ পুণ্য, কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য। সুতরাং যে ফেলালব পায় সেই ধন্য সেই পুণ্যবান। সামান্য ভাগ্য হতে এ জোটে না, এ জোটে শুধু কৃষ্ণের পরিপূর্ণ করুণায়।'

উপলভোগ দেখে প্রভু বাসায় ফিরলেন। যা কৃত্যই করুন সর্বক্ষণ কৃষ্ণাধরামৃতের কথা অন্তরে স্ফুরিত হচ্ছে।

'কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ।'

মধ্যাহ্নকৃত্য ও অবশেষে সন্ধ্যাকৃত্য করে ভক্তদের নিয়ে নিভৃতে বসলেন প্রভু, নানা কৃষ্ণকথারঙ্গ সুরু করলেন। প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ এনে সকলকে বিতরণ করে দিল। প্রসাদের সৌরভে-মাধুর্যে সকলে চমৎকৃত হল। এ কী অলৌকিক আস্বাদ!

প্রভু বললেন, 'সামান্য বস্তু দিয়ে এ তৈরি। ঘৃত গব্য কর্পূর এলাচ মরিচ লবঙ্গ কাবাবচিনি দারুচিনি। এসব প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ

গন্ধ আমরা সকলেই জানি কিন্তু এই প্রসাদের স্বাদ গন্ধ যা পাচ্ছি তা ভুবনদুর্লভ, তা লোকাতীত।'

কেন?

কৃষ্ণের অধরস্পর্শের গুণে। মহামাদক এই কৃষ্ণস্পর্শ। 'ইতর-রাগবিস্মারণ।' অন্য সমস্ত বস্তুর মাধুর্য ভুলিয়ে দেয়। 'আপনা বিনু অন্য মাধুর্য করায় বিস্মারণ।'

৭৬

কৃষ্ণাধরামৃতের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক ভাগবতের শ্লোকটি পড়ল রামানন্দ।

'সুরতবর্ধন শোকনাশন
স্বরিতবেণুচুম্বিত অধরামৃত।'

মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হলেন। এবার রামানন্দ রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোকটি পড়ল—

'স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম।'

সেই মদনমোদন আমার জিহ্বার স্পৃহাকে বিস্তার করছেন।

দিব্যোন্মাদের ভাবে প্রলাপ বলছেন প্রভু, দুই শ্লোকের ব্যাখ্যা করছেন।

কৃষ্ণের অধরসুধা আমার তনু-মন বিক্ষুব্ধ করছে, বাড়াচ্ছে সম্ভোগেচ্ছা, অপহরণ করে নিচ্ছে সমস্ত সুখ দুঃখ। 'পাসরায় অন্য রস।' অন্য সমস্ত রস ভুলিয়ে দিচ্ছে। সেই অমৃতই একমাত্র আস্বাদচমৎকার। সমস্ত জগৎকে বশীভূত করছে, লজ্জা ধর্ম ধৈর্য কিছুতেই অন্তরায় হতে দিচ্ছে না। কুলবালাদের আর্যপথ থেকে টেনে নিচ্ছে! সেই অমৃত আস্বাদের কাছে কিসের কুলমান,

কিসের লোকধর্ম। কৃষ্ণ সুখী হবে এই অনুভবটিই তো তাদের অমৃত আস্বাদ।

তোমার অধরের আচরণ অদ্ভুত। 'বিচারিতে সব বিপরীত।' আমি নারী, অধররসের লালসা আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু বলতে লজ্জা হয়, হে ধৃষ্টরায়, হে নির্লজ্জের চূড়ামণি, তোমার অধরামৃত পুরুষকেও আকর্ষণ করে। শুধু পুরুষ কী ছাই, বনবিহঙ্গকেও উতলা করে তোলে। আকর্ষণ কী বলছি, তোমার অধর এমন বাজিকর, অচেতনকে সচেতন করে, যে বাঁশের শুকনো জ্বালানি কাঠ হয়ে জ্বলবার কথা সে বাঁশি হয়ে ওঠে। মনে হয় তোমার অধরস্পর্শের শক্তিতে বেণুতে প্রাণ-মন-রসনার উদ্ভব হয়েছে আর সেই বেণু নির্মম পরিহাস করছে গোপিনীদের সঙ্গে।

কী বলছে ?

বলছে, কৃষ্ণের অধররস তোমাদেরই ধন, কিন্তু কী করব, আমিই এখন তা পান করছি। এতে তোমাদের যদি অভিমান হয়, তবে দৃপ্তপায়ে চলে এস, লজ্জা ভয় ধর্ম ছেড়ে চলে এস, লোককথায় জলাঞ্জলি দিয়ে গৃহত্যাগ করে চলে এস, আমি তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের ফিরিয়ে দেব। তোমাদের ভোগদখল কায়েম করো। আর যদি না আস, আমি একাকীই তবে ঐ অধরসুধা পান করব, আমি কাউকে ভয় করি না, অন্যকে তৃণের সমান দেখি।

কিন্তু কী নিদারুণ লাঞ্ছনার মধ্যেই রাখছে গোপিনীদের! রাধাভাবে আবার বিলাপ করছেন প্রভু। যদি ধর্মনাশের ভয়ে ধৈর্য ধরে ঘরে থাকি, তোমার কাছে না আসি, তবে ঐ বেণু, ঐ 'শুষ্ক বাঁশের কাঠিখান' আমাদের নাচিয়ে বেড়ায়। গুরুজনদের সামনেই আমাদের কটিবন্ধন খসিয়ে দেয়, শুধু তাতেই রেহাই দেয় না, চুল ধরে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। শুধু কি তাই ? টানতে-টানতে একেবারে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে আসে। তোমার দাসী করে ছাড়ে।

আমাদের বলবার-কইবারও কোনো উপায় থাকে না। কার কাছে নালিশ করব আর কার বিরুদ্ধে?

'চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাই।'

তোমার অধরের সঙ্গে যাদের সংযোগ হয় সঙ্গদোষে তারাও দাম্ভিক হয়ে ওঠে। যা তুমি পান করো বা ভোজন করো অধরসঙ্গ-হেতু সেই ভক্ষ্য-পানীয়ের কী দর্প! বলে, আমরা আর এখন সামান্য ভোজ্য-পানীয় নই, আমরা এখন প্রসাদ, আমাদের নাম কৃষ্ণ-ফেলা। দেবতারাও আমাদের এই কৃষ্ণ-ফেলার এককণাও পাবার যোগ্য নয়। আর, তোমার চর্বিত-চর্বণের কী স্পর্ধা দেখ! বলে, পানের পিক আমি যেখানে-সেখানে ফেলি না, পিকদানিতে ফেলি, আর গোপিনীদের মুখই আমার পিকদানি।

তুমি এ সমস্ত কুটিলতা ত্যাগ করো। বাঁশি দিয়ে কেন আমাদের প্রাণহরণ করো। বাঁশি তোমার আনন্দ হতে পারে কিন্তু আমাদের কুঠার। তুমি নিজে এস, এসে অধরামৃত দিয়ে আমাদের প্রাণে বাঁচাও। বলতে-বলতে প্রভুর ভাবের পরিবর্তন হল। ক্রোধের পরে দেখা দিল উৎকণ্ঠা।

দেখ, বিচার দেখ। যোগ্য না হয়ে কোথাকার এক বংশখণ্ড অমৃত পান করছে আর আমরা যোগ্য, যোগ্যতম হয়েও ভোগবঞ্চিত। এই লজ্জা রাখবার জায়গা নেই অথচ আমাদের প্রাণ যাচ্ছে না। তবে না জানি ঐ অযোগ্য শুষ্ক কাঠ কখন কী তপস্যা করেছিল, নইলে তার এত সৌভাগ্য কেন? আর আমরা? আমাদের কথা না বলাই ভালো।

কৃষ্ণ তো দামোদর। যশোদা তাকে দাম বা রজ্জু দিয়ে বেঁধেছিলেন বলেই তো তার ঐ নাম। দামোদর তো গোপবালক, গোপিকাতনয়। সুতরাং আমরা গোপবালা, আমাদেরই তো কৃষ্ণাধরামৃতে প্রথম অধিকার, সেই বস্তু অন্যে নেয় কী করে, তা তো অন্যের লভ্য নয়। যাও, তোমরা কেউ গিয়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে

এস, কোন জন্মে এই স্থাবর পুরুষ বাঁশ জপতপ করেছিল কোন তীর্থে কোন সিদ্ধমন্ত্রের শক্তিতে ?

দেখ তার ধৃষ্টতা। আমাদের জিনিস চুরি করে তো খাচ্ছেই, উল্টে আবার আমাদের জানাচ্ছে, তোমাদের ভোগ্যবস্তু কেমন আমি সম্ভোগ করছি। শুধু বেণু কেন, যমুনাই বা কম কী! কৃষ্ণ যখন স্নান করতে নামছে যমুনা তখন বেণুর উচ্ছিষ্ট রসই লুব্ধ হয়ে পান করছে। নদীর রস টেনে নিচ্ছে গাছপালা, তাই তারাও 'নিজাঙ্কুরে পুলকিত। পুষ্পহাস্থ বিকশিত।' আর সেই শক্তিতেই তো তারা পত্রে পুষ্পে ফলে পরোপকার করে চলেছে।

কোন তপস্যায় বেণুর এত বাড়বাড়ন্ত যদি জানতাম, তবে করতাম সেই তপস্যা। যা আমরা এত প্রার্থনা করেও পাচ্ছি না তাই কে এক অযোগ্য বিনায়াসে লাভ করবে এ অসহ্য।

মধ্যরাত্রে মহাপ্রভুকে শয়ন করিয়ে সবাই বিদায় নিয়েছে, গম্ভীরার দরজায় ঘুমিয়েছে গোবিন্দ। সমস্ত রাত প্রভু উচ্চকণ্ঠে সংকীর্তন করেন, সেদিনও করছেন, রাধার আবেশে হঠাৎ শুনতে পেলেন কৃষ্ণবেণুগান হচ্ছে। রাধিকার মত বেরিয়ে পড়লেন অভিসারে। তিন-দুয়ার কপাট পেরিয়ে সিংহদ্বারের বাইরে যেখানে কতগুলো গরু ছিল সেখানে গিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

প্রভুর শব্দ না পেয়ে গোবিন্দ স্বরূপকে ডেকে আনল, তারপর মশাল জ্বেলে খুঁজতে বেরুল। দেখল গাভীদল পরিবৃত হয়ে প্রভু শুয়ে আছেন মাটিতে।

কিন্তু এ তাঁর কী আকৃতি! সমস্ত হাত-পা শরীরের মধ্যে ঢোকানো, কূর্মের আকার হয়ে পড়ে আছেন। মুখে ফেনা, অঙ্গে পুলকরোমাঞ্চ, নয়নে অশ্রুধার।

'অচেতন পড়ি আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।'

গরুগুলো প্রভুর গা শুঁকছে, প্রভুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেও তাঁর সঙ্গ ছাড়ছে না। অনেক যত্নেও প্রভুর চেতনা ফিরে এল না।

তাঁকে ঘরে নিয়ে এসে সকলে কৃষ্ণকীর্তন সুরু করল। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গেই হাত-পা বেরিয়ে এল গা থেকে। যথাযোগ্য শরীর পেয়ে প্রভু ইতি-উতি তাকাতে লাগলেন, স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে এলে? বেণুধ্বনি শুনে আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, দেখলাম গোষ্ঠে ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাচ্ছে। সঙ্কেত শব্দে রাধিকাকে কুঞ্জ ঘরে নিয়ে যাচ্ছে, আমি সখীভাবে তাদের পিছু-পিছু চললাম, শুনতে পেলাম তার ভূষণশিঞ্জন। শুনতে পেলাম তাদের বিহার-হাস-পরিহাস, তাদের কণ্ঠস্বরই আমার কর্ণানন্দ। এমন সময় তোমরা সকলে কোলাহল করে আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এলে। আর শোনা হল না সেই নর্ম-সহাস্য কথা, সেই মুরলী-আলাপ। সেই বা ভূষণশব্দ।'

'আমার কর্ণের তৃষ্ণা দূর করো।' স্বরূপকে উদ্দেশ করে মহাপ্রভু বললেন, 'রসায়ন পড়ে শোনাও।'

ভাগবতের শ্লোক পড়তে লাগল স্বরূপ।

ত্রিলোকে এমন স্ত্রীলোক কে আছে যে তোমার পদামৃতবেণুগানে মুগ্ধ হয়ে নিজধর্ম থেকে না বিচ্যুত হবে। তোমার সকলসৌভগ রূপ দেখে শুধু নারী কেন, সমস্ত পুরুষ, এমন কী গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগ অর্থাৎ গরু পাখি গাছ ও বন্যজন্তুরাও পুলকিত। সমস্ত নারী-পুরুষই যখন তোমাতে আকৃষ্ট তখন আমাদের আর ভয় কী? কে আর আমাদের উপহাস করবে? আমাদের ধর্মত্যাগে সর্বস্বত্যাগেও যে আর কোনো গ্লানি নেই, অশুভ নেই।

প্রভুর এবার গোপীভাবাবেশ উপস্থিত হল। রাসস্থলীতে উপস্থিত হলে গোপীদের কৃষ্ণ বলেছিল, 'তোমরা কুলবধূ, তোমরা এখানে এসেছ কেন? তোমরা ঘরে ফিরে যাও, গিয়ে পতিপুত্রের সেবা করো, তাই তো কুলবতীদের ধর্ম, সে কুলধর্ম কেন অতিক্রম করবে?' সে কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিল গোপীরা, অনেক কিছু শুনিয়েছিল

কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের সেই উপেক্ষা ও গোপীদের সেই ভর্ৎসনা মনে পড়ল প্রভুর।

গোপীদের সেই ভর্ৎসনাই তাঁর কণ্ঠে আবার স্ফুরিত হল :

হে নাগর শ্রীকৃষ্ণ, ত্রিজগতে এমন যোগ্য নারী কে আছে যে তোমার বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হয় না ?

'তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ?'

সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনীরা পর্যন্ত বেণুবাদ্যবশংবদ। আমরা কি নিজের ইচ্ছায় ঘরের বার হয়েছি ? তোমার ঐ বেণুই আমাদের পাগলকরা ডাক দিয়ে ঘর থেকে, আর্যপথ থেকে ছিন্ন করে এনেছে।

এখন তো ভালোমানুষের মত বলছ ঘরে ফিরে যেতে, বাঁশিতে টান দেবার সময় সে কথা মনে ছিল না ? তুমি বাঁশি বাজাবে আর তা শুনেও আমরা গৃহধর্মে স্থির থাকব এই কি তোমার অভিলাষ ছিল ? তোমার বাঁশিতে এত তবে বিষ কেন, বৃক্ষলতা দূরের কথা পর্বতগাত্রে পর্যন্ত রোমাঞ্চ হয়।

'মহোৎকণ্ঠা বাঢ়াইয়া, আর্যপথ ছাড়াইয়া আনি
তোমায় করে সমর্পণ।'

এখন ধার্মিক সেজে ধর্ম না শোনালেই ভালো করবে। তোমার বেণুর তো দূতীর স্বভাব। সরলা অবলা গ্রাম্য গোয়ালিনীদের ছলনা করে নিয়ে এসেছে। দূতীরা যে বশীকরণ বিদ্যা জানে। আমরা কী করে তা অতিক্রম করব ? ও যে আমাদের লজ্জা-ভয়কেও ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

সবই তো তোমার কারসাজি। বেণুধ্বনিতেই তো তোমার কামশর কটাক্ষ এসে আমাদের বিদ্ধ করেছে। সর্বাঙ্গে বিষসঞ্চার করে হিতাহিত ভুলিয়ে দিয়ে এখন ধর্মের কাহিনী শোনাচ্ছ! পতি যদি দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ জড় রোগাক্রান্ত বা নির্ধনও হয় তবু তাকে ত্যাগ করবে না এ কুলধর্ম কে না জানে ? কিন্তু এ কুলধর্ম আমাদের ভোলাল কে ? কে কুলবতীদের কুলত্যাগ করাল ?

সর্বনাশ ঘটিয়ে এখন আর সাধু সেজো না। তোমাকে মানায় না ধর্মকথা।

শঠ-পারিপাট্য ছাড়ো। মনে এক রকম, কথায় আরেক রকম, এ প্রবঞ্চনা কেন? আমাদের সর্বনাশ তোমার পরিহাসের বিষয় হতে পারে না। সুতরাং 'কুটিনাটি' কৃত্রিমতা বর্জন করে সরল সম্ভাষে আমাদের অভ্যর্থনা করো।

এক অমৃত, বেণুনাদের অমৃতেই প্রাণ অস্থির, তার উপর আরো দুই অমৃত—ভূষণধ্বনি আর তোমার কণ্ঠস্বর—এই তিন অমৃতে সমস্ত জগৎ তোলপাড়—আমরা কোথায় যাব, কী করব, আর কোন বিষয়ে চিত্তকে নিক্ষেপ করব? তোমার কণ্ঠের ধ্বনি যেন নবজলদ-নিঃস্বনের মত গম্ভীর, যার মাধুর্যের কাছে কোকিলকণ্ঠও লজ্জিত—সেই ধ্বনির এতটুকু, কণামাত্রও যদি কেউ শোনে, সে আর অন্য শব্দে কান দেয় না, পারে না দিতে। যার কান একবার শুনেছে তার কান সেই স্বরের থেকে আর ফিরে আসে না। কৃষ্ণের থেকে ফিরে এলেও না। তারপর কথার সঙ্গে আবার একটু হাসি মিশিয়েছে। যেন অমৃতে কর্পূর পড়েছে। কথার দুই শক্তি, শব্দশক্তি আর অর্থশক্তি। কৃষ্ণের স্বরে এই দুই শক্তি উদ্ভাসিত। তাতেই বিচিত্র রসের ব্যঞ্জনা। 'প্রত্যক্ষরে নর্ম বিভূষিত।'

আমাদের তুমি বিনামূল্যের দাসী করে ছেড়েছ। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং লক্ষ্মী তোমার ধ্বনি শুনে তোমার সঙ্গলাভের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বৈকুণ্ঠ ছেড়ে চলে এসেছিল। তোমার সঙ্গ না পেয়ে তপস্যা করতে গেল, তাতেও ফল পেল না। সেই লক্ষ্মী-দুর্লভ ফল আমরা কী করে পাব?

তোমার কণ্ঠের তো শুধু স্বর নয়, তাতে আবার কথা আছে। তাই অমৃত তিন নয়, অমৃত চার। বেণুধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণীর শব্দ, কণ্ঠের ধ্বনি তার উপর আবার শ্রীমুখের বচন। এর একটি শব্দও

যে শুনতে না পায় তার কান অসার্থক, বলতে পারো মূল্যহীন কানা-কড়ির সমান।

'ইহা যেই নাহি শুনে,
সে কান জন্মিল কেনে,
কানাকড়ি-সম সেই কান॥'

তোমাকে পাবার আশা করা সুদূরপরাহত। তবে বলো আমি কী করব, কাকে বলব, কোথায়ই বা যাব? তুমি নিষ্ঠুর অথচ তোমার কথা ছাড়া আর কারু কথা, আর কোনো কথা, ভালো লাগে না। তুমিই যে আমার মন ও নয়নের উৎসব, তুমিই তো আমার হৃদয়ে শুয়ে আছ, আর আশ্চর্য, তোমারই জন্যে আমার তৃষ্ণা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

তোমরা সখীরা, তোমরা এর একটা উপায় করো। কিন্তু তোমরাই বা কী উপায় করবে? বিরহবিষাদে তোমরা নিজেরাই তো ম্রিয়মাণ হয়ে আছ। এই দুঃখ নিবারণের একটা মাত্র উপায় আছে। সে হচ্ছে কৃষ্ণের আশা সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া। আশা ছাড়া থাকতে পারলেই মন খুশি হয়। তাই বলছি, অধন্য কৃষ্ণকথা ছাড়ো, অন্য কথা বলো, আনো অন্য প্রসঙ্গ, যাতে কৃষ্ণের নামগন্ধও নেই! আশা ছেড়ে দিলেই উৎকণ্ঠা যাবে, আর উৎকণ্ঠা চলে গেলেই বিস্তীর্ণ উপশম।

কিন্তু যার আশা ছাড়তে বলছি সে যে ছাড়ে না। সে যে হৃদয়ের মধ্যে শয়ন পেতে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। দূরে থেকে যার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না সে এখন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে হৃদয়ে এসে স্থান নিয়েছে। মনের আর সব ভাবকে দমন করতে পারি কিন্তু লালসাই বশ মানে না। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গের লালসা।

মনকে ভর্ৎসনা করছেন। তুমি প্রতিকূল, তুমি দরিদ্র, তুমি কৃষ্ণধনে বঞ্চিত। জল না পেলে যেমন মাছ মরে, তেমনি তুমি, মন, কৃষ্ণহারা হয়ে তুমিও মরে যাবে।

হায় কৃষ্ণ, প্রাণধন, তুমি কোথায়? কোথায় হে আমার পদ্মলোচন শ্যামসুন্দর? আমার গুণসাগর রাসবিলাসী, বলো কোথায় গেলে তোমার দেখা পাব?

স্বরূপ উঠে প্রভুকে কোলে করে তুলে নিয়ে গেল। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে প্রভু স্বরূপকে গাইতে বললেন। স্বরূপ বিদ্যাপতির গান ধরল।

দিব্যোন্মাদেরই কত শত ভাবের বিকার প্রকট করলেন প্রভু।

'অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা॥
অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত বদান্য।
ঐ হে দয়ালু দাতা নাহি শুনি অন্য॥'

রাত্রিদিন কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসছেন প্রভু। কৃষ্ণ বুঝবে কী এই ভক্তের প্রেমবিকার? কী করে বুঝবে সে প্রেমের কত স্তর কত আলো-ছায়া—বুঝতে পারে না বলেই তো কৃষ্ণকে রাধিকার ভক্তভাব অঙ্গীকার করতে হয়। প্রেম কি যে সে বস্তু? সে যেমন ভক্তকে নাচায় তেমনি আবার কৃষ্ণকেও নাচায়। কৃষ্ণ তাই কোথায় আমাদের ঠেলে দেবে? সে তো প্রেমের হাতের পুত্তলিকা।

রাসের শ্লোক শেষ করে জলকেলির শ্লোক পড়তে লাগলেন প্রভু।

মহারাসে রাসনৃত্য করে যে শ্রম হয়েছিল তা দূর করবার জন্যেই কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের সঙ্গে যমুনায় জলকেলি করতে নেমেছিলেন।

একদিন এমনি শ্লোক পড়তে-পড়তে প্রেমাবেশে একটা বাগানে বেড়াচ্ছেন প্রভু, দূর থেকে হঠাৎ সমুদ্র তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল। চন্দ্রালোকে উজ্জ্বল তরঙ্গে ঝলমল করছে। প্রভুর মনে হল ঐ বুঝি যমুনা। যেমনি ভাবা তেমনি আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়া। সবার অলক্ষিতে বেরিয়ে পড়লেন, পৌঁছুলেন গিয়ে একেবারে সমুদ্রের পারে। কে বলে সমুদ্র! এ তো সেই বৃন্দাবনের যমুনা।

যমুনা ভেবে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন প্রভু। ঢেউয়ের টানে ভেসে পড়লেন, চলে গেলেন কোনারকের দিকে।

এদিকে স্বরূপ মাথায় হাত দিয়ে বসল, প্রভু কোথায়? কখন মনোবেগে চলে গিয়েছেন কেউ টের পায় নি। কিন্তু যাবেন কোথায়? জগন্নাথের টানে মন্দিরে গিয়েছেন, না কি অন্য বাগানে? না কি গুণ্ডিচা মন্দিরে, চটক পাহাড়ে, না কি কোনারকে? কে জানে হয়তো বা নরেন্দ্রসরোবরে। চলো বেরিয়ে পড়ি।

নানাদল নানাদিকে যাচ্ছে, একদল এসেছে সমুদ্রপারে। খুঁজতে-খুঁজতে রাত্রি প্রায় শেষ, তবু প্রভুর দেখা নেই। তখন সবাই ঠিক করল নিশ্চয়ই অন্তর্ধান করেছেন।

অনিষ্ট আশঙ্কা করা ছাড়া মন আর কিছুতেই রাজি নয়। যারা সুহৃদ তাদের অন্তরে শুধু অনিষ্ট আশঙ্কাই স্থান পায়।

ভোর হয়ে আসছে, কেউ গেল চটক পর্বতের দিকে। আবার কেউ-কেউ সমুদ্রের জল দেখে দেখে এগুতে লাগল। প্রভুর বিরহে সকলে বিষাদাচ্ছন্ন, তারপরে এই পথক্লান্তি—আর হাঁটতে পারছে না। তবু প্রভুর প্রেমেই সমস্ত সহ্য করে চলেছে।

কতক্ষণ পরে দেখতে পেল কাঁধে জাল ফেলে একটা জেলে এদিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটা হাসছে কেন, কাঁদছে কেন—দেখেছ নাচছে, হরি-হরি বলছে। এমন তো কোনোদিন দেখি নি। চলো এগিয়ে চলো, একে জিজ্ঞেস করলে হয়তো আমাদের প্রভুর খবর পাওয়া যাবে।

আমাদের প্রভু কোথায়? কোথায় আমাদের আনন্দঘনবিগ্রহ মাধুর্যঘনবিগ্রহ রসামৃতবারিধি?

৭৭

'তুমি কি কাউকে দেখেছ এদিকে?' স্বরূপদামোদর এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল জেলেকে।

'কই আর দেখলাম! তবে ধরেছি একজনকে।' বললে জেলে।

'ধরেছ? কে সে?'

'কে জানে কে! মরে পড়ে আছে। কী প্রকাণ্ড শরীর—'

'কী করে ধরলে?'

'আর কী করে! জাল বাই, জালেই ধরেছি।' ভীত-ত্রস্ত চোখে বলতে লাগল জেলে, 'জাল টানতে গিয়ে দেখলাম বেজায় ভারি, ভাবলাম কত বড় মাছ না জানি পড়ল! ও হরি, মাছ কোথায়, এ যে দেখি একটা মরা মানুষ! ওটাকে না ছুঁয়ে তো জাল থেকে ছাড়ানো যায় না, কিন্তু যেমনি ছোঁয়া অমনি সেই মড়ার ভূতটা আমার কাঁধে চেপে বসল! তারই জন্যে দেখছ না কেমন পাগল হয়ে গিয়েছি। শুধু কাঁধে চাপা নয়, ভূতটা একেবারে বুকের মধ্যে গিয়ে বসেছে। এমন ভূতের কথা তো শুনিনি কোনোদিন। এ আমার কী হল?'

'সেই দেহ তুমি কোথায় রেখে এসেছ?' স্বরূপ আকুল হয়ে প্রশ্ন করল।

'ওরে বাবাঃ, সে কী দেহ, পাঁচ-সাত হাত লম্বা হবে। হাড়ের জোড় সব আলগা হয়ে গিয়েছে, চামড়ার সঙ্গে লেগে থেকে নড়বড় করছে, দেখলেই ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। এ কী ধরনের ভূত তা কে বলবে?'

'আছে কোথায়?'

'মাঝে-মাঝে আবার গোঁ-গোঁ শব্দ করছে।'

'এই যে বললে মরে গেছে, তবে আবার শব্দ করছে কী করে?'

'লোকটা মরে গেছে, শব্দ যা হচ্ছে তা ভূতের শব্দ। আমার কী হবে?' জেলে কাঁদতে লাগল: 'আমি মরে গেলে আমার স্ত্রী-পুত্রের কী হবে!'

'আমাকে সেই ভূতের কাছে নিয়ে চলো।'

'কী সর্বনাশ! সেইখানে আবার আমি যাব! চোখ উল্টে পড়ে আছে, আবার মাঝে মাঝে গোঙাচ্ছে। এ ভূত একেবারেই মামুলি নয়—অসাধারণ ভূত! রাত্রে কত নির্জনে মাছ ধরি আর ভূত-প্রেত যাতে না উপদ্রব করে তার জন্যে নৃসিংহের নাম নিই। এই নতুন ভূত নৃসিংহকেও হার মানাল।'

'কী রকম?'

'নৃসিংহের নাম শুনলে অন্য ভূত পালিয়ে যায়, আর এই নতুন ভূতকে শুনিয়ে যত নৃসিংহ-নৃসিংহ বলছি ততই সে আমাকে চেপে ধরছে। ঐ সাতহাতী দেহের তিনহাত লম্বা হাত যদি চেপে ধরে, বাঁচি কী করে?'

'তা তুমি চলেছ কোথায়?'

'ওঝার বাড়িতে। ভূতটা কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিতে। তবে ভূত যা প্রচণ্ড, ওঝা পারে কি না কে জানে।'

'তোমার ঐ ওঝা পারবে না।'

'পারবে না? তা হলে আমি কোথা যাব?' জেলে কাঁদতে লাগল।

'শোনো, আমিও ওঝা। তোমার ওঝার চেয়ে বড় ওঝা। আমি তোমার ভূত ছাড়িয়ে দিচ্ছি। এস এগিয়ে।'

'তুমি ছাড়িয়ে দেবে?' দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে জেলে এগিয়ে এল: 'আমার এ অস্থির ভাব সুস্থ হবে?'

মন্ত্র পড়ে স্বরূপ তার হাত জেলের মাথায় রাখল। রেখে তিনটা চড় মারল। বললে, 'ভূত আর নেই।'

'নেই ?' প্রসন্ন স্বচ্ছতায় হাসল জেলে।

'নেই। তোমার ভয়ের অস্থিরতা চলে গেল।'

'সত্যি, আমার আর ভয় নেই।'

'কিন্তু তোমার আরেক অস্থিরতা থেকে গেল।' স্বরূপ হাসল: 'সে যাবে না। সে যাবার নয়।'

'সে আবার কী!'

'সে প্রেমের অস্থিরতা। শোনো', স্বরূপ গদ্গদগভীর কণ্ঠে বললে, 'তুমি যাঁকে জালে টেনে তুলেছ তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।'

'না, না, তিনি নন।' জেলে জোর গলায় বললে, 'আমি প্রভুকে দেখেছি, তিনি এমন বিকৃত-আকার নন।'

'এ তাঁর প্রেমবিকার। এ বিকারে শরীর দীর্ঘ হয়, অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে যায়। তিনি নিশ্চয়ই প্রেমাবেশে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছেন আর তোমার এমন ভাগ্য—'

'বলেন কী। আমি প্রভুকে স্পর্শ করেছি?'

'তিনিই কৃপা করে এ স্পর্শ ঘটিয়েছেন আর তার ফলে তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয়েছে। এখন চলো প্রভুর কাছে আমাকে নিয়ে চলো।'

'যাবেন?' জেলের আর ভয় নেই, প্রেমে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'তবে আর দেরি করবেন না। সমুদ্রতীরে একা শুয়ে আছেন—চলুন, ছুটে চলুন।'

শুধু স্বরূপ নয়, আরো সকলে ছুটল।

দীর্ঘ শিথিল দেহে উত্তান-নয়নে শুয়ে আছেন প্রভু। অনেকক্ষণ জলে থাকায় দেহ শাদা হয়ে গিয়েছে, বালি লেগে আছে আদ্যোপান্ত। দূরের পথ, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কঠিন। এইখানেই কৃষ্ণনাম কীর্তন সুরু করো।

আর্দ্র কৌপীন ফেলে দিয়ে শুষ্ক কৌপীন পরানো হল। দেহের

বালি ঝেড়ে দিয়ে শোয়ানো হল বহির্বাসে। এবার উচ্চগ্রামে প্রভুকে কৃষ্ণনাম শোনাও।

প্রভুর কানে কিছুক্ষণ কৃষ্ণনাম প্রবেশ করতেই প্রভু হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। উঠতেই তাঁর শরীর স্বাভাবিক হয়ে গেল, হাড়ে হাড়ে সন্ধি লাগল। অর্ধবাহ্যদশায় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন।

প্রভু তিন দশায় থাকেন, হয় অন্তর্দশায়, নয় বাহ্যদশায়, নয় বা অর্ধবাহ্যদশায়। অন্তর্দশায় বাইরের কোনো কিছু জ্ঞান বা স্মৃতি থাকে না। এই দশায় প্রভু কখনো রাধিকা, কখনো বা গোপী, আর যেখানে আছেন তা বৃন্দাবন। বাহ্যদশায় বাইরের বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান থাকে। আধো জাগ্রত আধো ঘুমন্ত ভাবই অর্ধবাহ্যদশা। যেন স্বপ্নের আবহাওয়ায় সমস্ত চলছে-ফিরছে, চিনেও চিনছেন না, শুনেও শুনছেন না এমনি উদাসীন।

অর্ধবাহ্যদশায় প্রভু এখন গোপী হয়েছেন।

'এই শুদ্ধভক্ত লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার॥'

এই বিহারে কামগন্ধলেশ নেই, নেই স্বসুখবাসনা, তাই রাসলীলা প্রবর্তন করা। কৃষ্ণ চায় ব্রজবালাদের সুখ, ব্রজবালারা চায় কৃষ্ণের সুখ। 'কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।' এ প্রেম নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল থেকেই বর্তমান। গোপী কৃষ্ণের কী নয়? সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী শিষ্যসখী পরিচারিকা। সর্বভাবে কৃষ্ণকে সুখী করবার জন্যে প্রস্তুত। আর গোপীদের মধ্যে রাধিকাই অত্যন্তবল্লভা।

'সেই গোপীগণমধ্যে উত্তমা—রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্বাধিকা॥'

শোনো, আমি কী দেখলাম!

দেখলাম যমুনা, যমুনা দেখে চলে গেলাম বৃন্দাবন। দেখলাম রাধিকা ও গোপীদের নিয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন মহারঙ্গে জলকেলি করছেন। আমি তীরে দাঁড়িয়ে সখীদের নিয়ে রঙ্গ দেখছি।

যেসব পট্টবস্ত্র পরে কৃষ্ণ ও তাঁর কান্তারা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন সেসব ছেড়ে সূক্ষ্ম শুভ্র বস্ত্র পরে নিলেন। অলঙ্কারও খুলে রাখলেন। বস্ত্র-অলঙ্কার সখী মঞ্জরীর হেপাজতে রেখে জলে নামলেন।

দেখ দেখ জলকেলিরঙ্গ দেখ। কৃষ্ণ করিবর আর গোপীরা করিণী। হাতিরা শুঁড় দিয়ে জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে, এরা হাত দিয়ে করছে। ফেলাফেলি হুড়াহুড়ি চলেছে। এ এক তুমুল জলযুদ্ধ। কে জেতে কে হারে কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারছে না। গোপীরা বিদ্যুতের মালা আর কৃষ্ণ নবীন মেঘ। কখনো মেঘের জয় কখনো বা বিদ্যুল্লতার। যুদ্ধের প্রথম পর্ব শুধু 'জলাজলি'—শুধু জলছোঁড়াছুঁড়ি, পরে 'করাকরি', হাতাহাতি—এ ওকে ধরতে চায় ও একে ঠেলে সরিয়ে দেয়। পরে যুদ্ধ 'মুখামুখি'—অধরে অধর স্পর্শ। তারপরেই 'হৃদাহৃদি'—আলিঙ্গন।

'যত গোপসুন্দরী কৃষ্ণ তত রূপ ধরি
সভার বস্ত্র করিল হরণে।
যমুনাজল নির্মল অঙ্গ করে ঝলমল
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে॥
পদ্মিনীলতা সখীচয়ে কৈল কারো সহায়ে
তরঙ্গহস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহো মুক্তকেশপাশ আগে কৈল অধোবাস
স্বহস্তে কঞ্চুলি করিল॥'

জলকেলির শেষে বিধিমত স্নান করলেন সকলে। তারপরে শুষ্কবস্ত্রে অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে গেলেন রত্নমন্দিরে। পরে বৃন্দাবনের বনদেবী বৃন্দা তার সম্ভার এনে ধরল, সুগন্ধি ফুলের অলঙ্কার—আর তাইতেই সকলে বেশরচনা করলে। বৃন্দাবনের তরুলতা বারোমাস ফুলফল ধরে—সমস্ত এসে উপস্থিত হল। এল বিচিত্র মিষ্টান্ন। সকলে মিলে বন্যভোজন করলে। তারপর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে শয়ন

করলে আর-সখীরা কেউ বীজন করতে লাগল, কেউ বা পাদসংবাহন। সখীদের সেবা আর রাধাকৃষ্ণের ঘুম দেখে আমার মন আনন্দে বিভোর হয়ে উঠছে, তোমরা হঠাৎ এসে মহা কোলাহল সুরু করে দিলে। এখন কোথায় আমার বৃন্দাবন, কোথায় বা রাধাকৃষ্ণ, কোথায় বা যমুনা। আমার সকল সুখের অবসান হল!

ক্রমে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল প্রভুর। স্বরূপকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে তোমরা এ কোথায় নিয়ে এলে?'

স্বরূপ তখন সমস্ত বললে। 'দেখ এই জেলে যে তোমাকে তুলেছে জল থেকে, যাকে তোমার স্পর্শ দিয়ে প্রেমমত্ত করেছ। তুমি তো মূর্ছাছলে বৃন্দাবনে লীলা দেখছিলে আর আমরা তোমার মূর্ছার চারদিকে অন্ধকার দেখছি।'

'স্নান করবে এস। তারপরে ঘরে চলো।'

প্রভু জগদানন্দকে ডাকালেন। বললেন, 'নদীয়ায় যাও। নদীয়ায় গিয়ে আমার মাকে আমার প্রণাম দিও। শুধু মুখে বললে হবে না, আমার হয়ে তুমি আমার মায়ের পা দু'খানি ধরে প্রণাম করবে। মাকে বোলো, তিনি আমাকে রোজ স্মরণ করেন তা আমি জানতে পারি, আর আমিও রোজ গিয়ে মাকে প্রণাম করি, তা কি তিনি জানেন? আরো বোলো, যেদিন তিনি আমাকে খাওয়াতে ইচ্ছে করেন সেদিনই আমি তাঁর দেওয়া খাবার তাঁর পাশে বসে খেয়ে আসি। মায়ের সেবা ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে আমি বাতুলের কাজ করেছি। ধর্মের জন্যে সন্ন্যাস নিয়েছি কিন্তু মাতৃসেবার মত ধর্ম কোথায়? এ সবও তাঁকে বোলো—যেন তিনি আমাকে ক্ষমা করেন, বোলো, সন্ন্যাস নিয়েছি বলেই আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ ছিন্ন করে ফেলি নি। এই যে আমি নীলাচলে আছি তাঁর আদেশেই আছি, আর যতদিন এ জীবন আছে, নীলাচল ছাড়ব না। আমি মায়ের অধীনতা স্বীকার করেই বেঁচে আছি এখনো। সব তাঁকে বুঝিয়ে বোলো।'

আর নিয়ে যাও প্রসাদ আর প্রসাদীবস্ত্র। মাকে দিও।

জগদানন্দ নবদ্বীপে এসে শচীমাতাকে সব দিলে, সব বললে।

এক মাস থেকে ফিরে চলল নীলাচল। 'মাগো যাই আবার তোমার ছেলের কাছে।'

অদ্বৈত বললে, 'আমার একটি নিবেদন প্রভুর চরণে নিয়ে যাও।'

'কী বলো।'

'একটু হেঁয়ালি করে বলব। প্রভু ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।'

'সে আবার কী কথা!'

অদ্বৈত বললে, 'নাও, মুখস্ত করে নাও।'

'বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল॥'

সত্যিই তো এ তর্জার মানে কিছুই বুঝতে পারছে না জগদানন্দ। আর কেউ পারছে? কেউই তো উচ্চবাচ্য করছে না।

নীলাচলে ফিরে এসে প্রভুকে জগদানন্দ বললে সে হেঁয়ালি। প্রভু মৃদু হাসলেন। বললেন, 'তাই হোক, আচার্যের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।'

জগদানন্দ তো থ।

প্রভু বুঝেছেন কী গূঢ়ার্থ! বাউলকে কহিয়—মানে বাতুলকে, কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত চৈতন্যদেবকে বোলো, লোকে সকলেই প্রেমোন্মত্ত হয়ে উঠেছে। চাউল অর্থ কৃষ্ণপ্রেম। সকলেই প্রেমোন্মত্ত হয়েছে বলে প্রেমের হাটে চাউলের আর গাহেক নেই। বাড়িতে নিজের নিজের ভাণ্ডারেই যদি যথেষ্ট চাল থাকে তা হলে কে আর হাটে যায় সওদা করতে? দোকানীরা তাই অনর্থক বসে আছে দোকান খুলে, খদ্দের নেই। দোকানদার অর্থ কীর্তক-কথক প্রচারকের দল। তাদেরও কাজে মানে প্রেমবিতরণের কাজে ব্যস্ততা বা আগ্রহ নেই। বাউলের

কৃপায় সকলে নির্বিচারে কৃষ্ণপ্রেম পেয়ে গেছে, দোকানীরা আর তবে কাদের কাছে মাল গছাবে ? এই সোজা কথাটা বোলো বাউলকে, বোলো আরেক বাউলের কথা, অর্থাৎ আরেক প্রেমোন্মত্ত, অদ্বৈত আচার্যের কথা।

স্বরূপ গোঁসাইও বুঝতে পারে নি তর্জা। মহাপ্রভুকে বললে, 'অর্থের ব্যাখ্যা করে দিন।'

প্রভু ঘুরিয়ে বললেন, 'আগমশাস্ত্রের বিধান জানো তো ? পূজার জন্যে দেবতাকে আবাহন করতে হয়, যতক্ষণ পূজা না শেষ হয় দেবতাকে রাখতে হয় আটকে আর পূজা শেষ হলেই বিসর্জন। কে জানে তর্জার কী অর্থ।'

পরোক্ষে বললেন, কিন্তু কে বোঝে ! বলতে চাইলেন, অদ্বৈত আমাকে আবাহন করে এনেছিল জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচারের জন্যে। যতক্ষণ প্রেম প্রচারের কাজ চলছিল রেখেছিল আমাকে ধরে বেঁধে, আর যেই দেখলে আর প্রয়োজন নেই, সরাসরি বিদায় দিয়ে দিল আমাকে।

কী আশ্চর্য, প্রভু বলছেন এ তর্জার মর্মার্থ তাঁর কাছেও অগোচর।

কিন্তু পূজা নির্বাহ হলে বিসর্জন দিতে হয় এ ইঙ্গিতের তাৎপর্য কী ? স্বরূপ বিমনা হয়ে গেল। প্রভু কি তবে লীলাসম্বরণের কথা ভাবছেন ? হাটে চাল আসার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে ?

সেইদিন থেকে প্রভুর কৃষ্ণবিচ্ছেদদশা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। অনুক্ষণ রাধাভাবাবেশে দিব্যোন্মাদের আচরণ সুরু করলেন। সখী ভেবে রামানন্দের গলা ধরে প্রলাপ বকতে লাগলেন, আমার নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায় ? এমন প্রিয়তম সুহৃত্তমের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটায় সেই বিধাতাকে ধিক। সখি, একবার কৃষ্ণকে দেখাও, কৃষ্ণকে ডেকে নিয়ে এস। সেই তমালদ্যুতিকে আরেকবার দেখি। কৃষ্ণের রূপ যদি একবার চোখে লাগে, চোখ থেকে হৃদয়ে গিয়ে বসে, আর

তাকে হটানো যায় না, আঠার মত সে এঁটে বসে। কী আশ্চর্য, তাঁর মুরলীধ্বনিও আর শুনি না। বাঁশিই যদি না বাজে এই গৃহ-নির্জর ছিন্ন হবে কী করে? কোথায় সেই রাসরসতাণ্ডবী কলানিধি? যে আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র মহৌষধি তাকে না পেয়েও আমি এখনো জীবিত আছি—এমন যার বিধান সেই বিধাতাকে ধিক। যে বাঁচতে চায় না অথচ তাকে বাঁচিয়ে রাখে এই বিধান তো স্পষ্ট প্রতারণা।

এ কী বালকের মত ব্যবহার! দয়ার লেশমাত্র তো নেইই, বুঝতেও পারে না প্রণয়ে একবার সংযুক্ত করে মনোরথ পূর্ণ না করে বিযুক্ত করার দুঃখ। এ কি কোনো বিচক্ষণের ব্যবস্থা না কি এক অর্বাচীন বালকের পরিহাস? তৃষ্ণার্তের হাতে জলপাত্র দিলে, আর যেই সে-পাত্র সে ঠোঁটে ঠেকিয়েছে তখুনি তার হাত থেকে তা কেড়ে নিলে—এর মধ্যে নির্মমতার চেয়েও মূর্খতাই বেশি। একমাত্র অবোধ বালকেই সম্ভব এই মূর্খতা! না বোঝে প্রেমধর্মের মহিমা, না বা নিজের সৃষ্টির মর্যাদা। নইলে সঙ্গবাসনা দিল, কিন্তু যেই সে বাসনা সিদ্ধ হবার অভিমুখে যাত্রা করল অমনি এনে দিল বিয়োগ-বিচ্ছেদ, এনে দিল ব্যবধান। যারা অনন্যদুর্লভ তারা তো একমাত্র প্রেমেই মিলিত হতে পারে। তাদের মধ্যে বিধি প্রেম দিলে, উন্মুখতা দিলে, সম্মিলনের সুযোগ দিলে, তারপর চরম মুহূর্তে এনে দিলে বিপ্রয়োগ—এ দত্ত-অপহার পাপ ছাড়া আর কী! দিয়ে যে ফিরিয়ে নেয় সে বালকের চোখেও তরলচপল। কিন্তু আসলে বিধি তার চেয়েও বেশি। দুষ্ট আর ধৃষ্ট তো বটেই, সর্বোপরি নিষ্ঠুর।

জানি বলবে, আমি কী করব, অক্রূরই এই দুষ্কার্য করেছে, কিন্তু আসলে তুমিই তো ধরেছিলে ঐ অক্রূরমূর্তি, চুরি করে নিয়ে গেলে কৃষ্ণকে। তুমি ছাড়া চৌর্যে কার এত নৈপুণ্য! তুমি ছাড়া মায়ামমতায় কার এত উপেক্ষা! নিজের দোষ পরের উপর চাপিয়ে দেবার আগ্রহ!

কিন্তু হায়, হয়তো বৃথাই তোমাকে গঞ্জনা দিচ্ছি। সব আমারই কর্মফল। তোমার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কোথায়? তুমি-আমি তো কত দূর, কত অচেনা। তুমি আমাকে কেন মারবে? যে আমার দেহ-মনের অন্তরঙ্গ ছিল সেই কৃষ্ণই আমাকে মেরেছে। সর্বস্ব ত্যাগ করে যাকে ভজনা করলাম সেই আমাকে নিজহাতে হত্যা করল। নারীবধে কৃষ্ণের ভয় কী। ক্ষণমাত্রে প্রণয় ভেঙে দিতে তার কিসের আলস্য!

কৃষ্ণকে দোষই বা দিই কেন? এ আমার নিজের দুর্ভাগ্য। নইলে যে কৃষ্ণ আমার প্রেমাধীন ছিল সে কি নিজের ইচ্ছায় আমাকে ত্যাগ করতে পারে? আমার প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। হায়, আমার ভালোবাসার চেয়েও আমার দুর্ভাগ্য বলবত্তর। তাই অমন নমনীয় কৃষ্ণ এমন পাষাণ হয়ে গেল!

হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ। তুমি কোথায় গেলে? কোথায় তুমি গোবিন্দ-মাধব-দামোদর? পরম বিষাদে মহাপ্রভু রোদন করতে লাগলেন।

অক্রুর যখন রথে করে কৃষ্ণকে নিয়ে চলে যাচ্ছে মথুরায় তখনো গোপবালারা 'গোবিন্দ-মাধব-দামোদর' বলে কেঁদেছিল।

হে গোবিন্দ, তুমি তো চললে, তবে তোমার সঙ্গে আমাদের মন বুদ্ধি চক্ষু শ্রুতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কেও নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এই বিচ্ছেদব্যথার অনুভব। হে দামোদর, একদিন তুমি স্নেহরজ্জুতে বদ্ধ হয়েছিলে, সে কথাও ভুলে যাও। হে মাধব, তুমি তো আমাদের পতি নও, তুমি তো আমাদের সখা, আমরা তোমার পরবস্তু, সুতরাং পরের বস্তুকে তুমি কী বলে বিনাশ করতে চাও?

মহাপ্রভু গোপীভাবে বিলাপ করতে লাগলেন।

রাধিকা কৃষ্ণকল্পলতা আর গোপীরা তারই পুষ্পপত্রকিশলয়।

৭৮

রাধাকৃষ্ণের মিলনগীত শোনাতে বসল রামানন্দ। তবেই প্রভু স্থির হলেন। তাঁর বিরহযন্ত্রণার নিবারণ হল।

প্রভুকে শুইয়ে তবে বাড়ি গেল রামানন্দ। গোবিন্দ আর স্বরূপ গম্ভীরার দরজার পাশটিতে পাহারা রইল।

কিন্তু কই, প্রভু শান্ত হতে পারছেন কই? উঠে বসে নাম-সংকীর্তন সুরু করেছেন। ক্রমে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, গম্ভীরার দেয়ালে ঘষতে লাগলেন মুখ। মনে হল কৃষ্ণান্বেষণে বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু কোথায় দরজা? অন্ধকারে দরজার হদিস করতে পারছেন না, একবার এ-দেয়ালে মুখ ঘষছেন, আরেকবার ও-দেয়ালে। মুখে গালে নাকে ঘা হয়ে গেল, রক্ত ঝরতে লাগল। বাহ্যস্মৃতি নেই, তাই জানলেন না ক্ষতের কথা, রক্তের কথা। মনে-মুখে শুধু হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ।

আর্তনাদ শুনে স্বরূপ দীপ জ্বেলে ঘরে এল। এ কী করুণ দারুণ দৃশ্য!

'এমন দশা তোমার কে করলে?'

'জানি না কে করলে!' প্রভুর বুঝি কিছু বাহ্যস্মৃতি ফিরে এল। 'উদ্বেগে ঘরে থাকতে পারছিলাম না। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে আসতে গিয়ে বারে-বারে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছি, তাতেই ক্ষত হয়েছে।'

রাধাভাবে দিব্যোন্মাদ।

প্রেমবৈবশ্যে আবার কী করে বসেন, স্বরূপ আর গোবিন্দ পরামর্শ করতে বসল, কী করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ রক্ষা করা যায়। ঠিক

করা হল একজন প্রহরী রাখা দরকার। কিন্তু কে এমন প্রহরী আছে যার সম্পর্কে প্রভুর কোনো সঙ্কোচ নেই। শঙ্কর পণ্ডিতের নাম মনে পড়ল, একমাত্র তার প্রতিই প্রভুর গৌরববুদ্ধিহীন বিশুদ্ধ প্রীতি। শঙ্কর যদি তাই ঘরের মধ্যে শোয়, প্রভু হয়তো আপত্তি করবেন না।

'অনুমতি করো শঙ্কর তোমার পায়ের তলায় শোবে।' স্বরূপ প্রভুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাল।

প্রভু প্রথমে রাজি হলেন না। পরে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর মত দিলেন।

প্রভুর পায়ের নিচে আড় হয়ে শুল শঙ্কর আর প্রভু তার দেহের উপরে চরণ প্রসারিত করলেন। প্রভুর পায়ের বালিশ হল শঙ্কর, যেমন বিদুর হয়েছিল কৃষ্ণের, আর তার নাম হয়ে গেল 'প্রভুপাদো-পাধান'।

কিন্তু শঙ্কর যে শোয়, গায়ে এতটুকু একটা আবরণ নেই। তখন প্রভু নিজের গায়ের কাঁথাখানা শঙ্করের গায়ে চাপিয়ে দেন। তাতে কী, শঙ্করের ঘুম মোটেও গাঢ় হয় না, সে শীঘ্রচেতন, একটুতেই জেগে ওঠে। জেগে উঠে প্রভুর পা টিপতে সুরু করে। শঙ্করের ভয়ে প্রভু বাইরে বেরুতে পারেন না, না বা দেয়ালে মুখ ঘষতে। শঙ্কর দুর্ধর্ষ প্রহরী।

বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে প্রভু জগন্নাথবল্লভ বাগানের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। ভক্তরা সঙ্গ নিল। বাগানের বৃক্ষ-বল্লী ফুলে ভরে গেছে, ফুলের গন্ধ নিয়ে মলয়পবন বইছে, মৃদু কূজন করছে পাখিরা, জ্যোৎস্নায় সমস্ত বাগান উজ্জ্বল হয়ে আছে, দেখলে মনে হয় যেন বৃন্দাবন উদ্ঘাটিত।

ললিত-লবঙ্গ-লতা পদ কীর্তন করো। স্বরূপ গান ধরল, প্রভু নৃত্য করতে লাগলেন। এক বৃক্ষতল থেকে আরেক বৃক্ষতলে উপনীত হচ্ছেন। অশোকগাছের কাছাকাছি আসতে দেখলেন কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে।

কৃষ্ণকে দেখেই তাকে ধরবার জন্যে প্রভু ছুটলেন অশোকগাছের দিকে। কৃষ্ণ প্রভুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। আর, একটু হেসেই পালিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল।

কৃষ্ণকে কাছাকাছি পেয়েও ধরতে পেলাম না এই যন্ত্রণায় মূর্ছা গেলেন প্রভু। কৃষ্ণ নেই কিন্তু তার গাত্রগন্ধে সমস্ত বাগান ভরে গেছে, সেই গন্ধ নাকে যেতেই প্রভু উঠে পড়লেন, কোথায় কৃষ্ণ। অঙ্গগন্ধ-আস্বাদনে আমার মিলনলালসা যে আরো বেড়ে যাচ্ছে।

কৃষ্ণগন্ধলুব্ধা রাধিকা সখীদের যা বলেছিল সেই কথাই প্রভু পুনরাবৃত্তি করলেন :

মৃগমদবিজয়ী কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধের আটটি নিবাসস্থল—দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা, নাভি আর মুখ—সেই অষ্টপদের পরিমল-উর্মি দিয়ে কৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদের আকর্ষণ করছে, শুধু পদ্মগন্ধ নয়, কস্তুরি কর্পূর বরচন্দন আর কৃষ্ণাগুরুর গন্ধও সেই সঙ্গে মিশে আছে। এ সমস্ত দিয়ে কৃষ্ণ যে অঙ্গলেপন করে। একে নিজের স্বাভাবিক গন্ধ তার উপরে লেপনচর্চার গন্ধ—মদনমোহন যে আমার নাসাস্পৃহা বিস্তৃত করে দিচ্ছে।

'মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি।'

একসঙ্গে কতগুলো গন্ধডাকাত মিলে সমস্ত চুরি করে নিল। কী চুরি করে নিল? গোপনারীদের তনু মন লজ্জা ধর্ম কুল শীল গৃহ সমাজ—সমস্ত। তাদের কেশবন্ধ বেশবন্ধ সমস্ত সংযমের বাঁধ খসিয়ে দিয়ে 'বাউরী'—পাগলিনী করে ছাড়ে। গন্ধ পেয়েও গন্ধের পিপাসা মেটে না—এ কৃষ্ণতৃষ্ণায় শান্তি নেই, এ তৃষ্ণা নিয়ত-নিরন্তর। এ গন্ধ বুঝি বিনামূল্যে মেলে, কিন্তু গন্ধের এমন জাদু, অন্ধ করে ছাড়ে, একবার বাইরে নিয়ে এসে আর ঘরে যেতে পথ দেয় না।

'মদনমোহনের নাট পসারি গন্ধের হাট
জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।

বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ   গন্ধ দিয়া করে অন্ধ
ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥'

গৌরহরিও তেমনি গন্ধের উৎসকে, কৃষ্ণকে ধরবার জন্যে ছুটো-ছুটি করছেন। একেকটি গাছের কাছে যাচ্ছেন আর আশা করছেন এই বুঝি কৃষ্ণস্ফুরণ হবে। কৃষ্ণ কোথায়, শুধু—অঙ্গগন্ধের তরঙ্গ বয়ে চলেছে। তাঁকে আবার নিয়ে যাচ্ছে আরেক গাছের কাছে। শুধু গন্ধই মিলছে কিন্তু কই সেই গন্ধরাজ?

কৃষ্ণের এত অঙ্গগন্ধ, আমার কেন এতটুকুও প্রেমগন্ধ নেই? আমার যদি সত্যিই কৃষ্ণপ্রেম থাকত তা হলে তো আমি কৃষ্ণমুখ না দেখতে পেয়ে পতঙ্গের মত পুড়ে মরতাম। কৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করে যাওয়া সত্ত্বেও যে আমি বেঁচে আছি তার অর্থই আমার প্রেম নেই। অনুরাগী-অনুগতকে কি কেউ ত্যাগ করে? তবে কাঁদছি কেন? আমার এ কান্না ছলনা, লোকদেখানো। লোকদের আমি আমার সৌভাগ্য দেখাচ্ছি। দেখ আমি কত ভাগ্যবান, আমার মধ্যে কত কৃষ্ণপ্রেম। হায়, কৃষ্ণপ্রেমই যদি থাকত তবে এ বিরহানল সইতে পারতাম? দগ্ধ হয়ে যেতাম না? তার অর্থই হচ্ছে আমার এ অশ্রুও কাপট্য।

স্বরূপ আর রামানন্দ নানাবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগল।

সত্যিই তো, কৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গনই করুক বা বাহুর পেষণে বধই করুক, আমার পক্ষে দুই-ই সমান। দর্শন দিক বা অদর্শনে রাখুক, সমস্তই সে। সে লম্পট হোক তবু সেই আমার নাগর, আমার প্রাণনাথ।

কৃষ্ণের মাধুর্য রাধা কী ভাবে আস্বাদন করেছিল তা বোঝবার জন্যেই তো কৃষ্ণ গৌর হয়েছে। গৌরই তো রসরাজ আর মহাভাব একসঙ্গে। রাধার সুখের স্বরূপ জানতেই তো বাসনা ছিল কৃষ্ণের, কিন্তু এই দিব্যোন্মাদের আবেশ কেন? এ আবেশে যে নিদারুণ বিরহক্লেশ। কিন্তু বিরহযন্ত্রণা না থাকলে প্রেমের আনন্দ কোথায়?

'বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত।' দিব্যোন্মাদ না হলে রাধার প্রেম-মহিমাই বা কী করে জানা যাবে? এদিকে সর্বশক্তিমানের ঐশ্বর্য, অথচ রাধাপ্রেমের প্রভাবের কাছে সর্ব গর্ব খর্বীকৃত।

বহু যত্নে নাম-গান করে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনল রাম রায়।

রাত্রিদিন নীলাচলে বসে কৃষ্ণবিরহবিহ্বল জীবন যাপন করছেন গৌরহরি। সঙ্গী শুধু দু'জন—স্বরূপ আর রামানন্দ। তারা ব্রজের গান গাইছে, আবৃত্তি করছে রসশ্লোক। তাই শুনে প্রভুর কখনো জাগছে হর্ষ, কখনো শোক, কখনো বা রোষ দৈন্য উদ্বেগ কাতরতা। কখনো বা উৎকণ্ঠা কখনো বা সন্তোষ।

প্রভুর স্বরচিত অষ্ট শ্লোক—শিক্ষাষ্টক নিয়েই চলতে লাগল রসাস্বাদ।

প্রভু বলে উঠলেন, 'শোনো স্বরূপ, শোনো রাম রায়, কলিতে নামসংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়।'

'নামসঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।'

কিসের উপায়? কলিকালে যখন, তখন সন্দেহ কী, আনন্দের উপায়। কলিকালে স্থির আনন্দ কী? রস। রসবস্তুকে পেলেই মানুষ আনন্দী হতে পারে। কৃষ্ণই অক্ষয় রসবস্তু। কৃষ্ণই অশেষ রসামৃতবারিধি। মূর্তিমন্ত মাধুর্য। রসস্বরূপ হয়েও আবার রস-আস্বাদক। তাই তার একমাত্র ব্রত ভক্তচিত্তবিনোদন। সুতরাং কৃষ্ণই কলিকালে একমাত্র সন্ধিতব্য বস্তু। তাকে পেলেই জীব পূর্ণানন্দ, কৃতকৃতার্থ।

তাকে পাবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় নামকীর্তন। এই কীর্তনেই ভক্তির উত্থান। ভক্তি ছাড়া কেউ কোনো ফল দিতে পারে না, না কর্ম না যোগ না বা জ্ঞান। 'ভক্তিসুখনিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান।' নাম-কীর্তনই নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ পন্থা। যে আকাঙ্ক্ষা করে বা করে না

দু'জনেরই। আর যে আকাঙ্ক্ষা করে তার সমস্ত অভীষ্টই নামকীর্তন পূর্ণ করে দিতে পারে। গমনে উপবেশনে শয়নে উত্থানে লঘুতায় ভর্ৎসনায় অশ্রদ্ধায় অবহেলায় এমন কি কথাচ্ছলে কলিমর্দন হরিনাম উচ্চারণ করলেই সে পেয়ে যাবে কৃষ্ণধন। এসব তো সামান্য কথা, ব্রাহ্মণ যদি রজস্বলা শ্বপচীতে গমন করে, কিংবা যদি সুরা-পাচিত অন্ন ভোজন করে, কিন্তু মৃত্যুকালে যদি একবার হরিনাম মুখে আনতে পারে, সে অগম্যাগমন ও অভক্ষ্যভক্ষণের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বিষ্ণুলোকে প্রবেশ করে।

নামকীর্তনের মুখ্য ফল প্রেম, ভাগবতী প্রীতি। প্রেম কী? প্রেম অর্থ কৃষ্ণের সুখের জন্যে কৃষ্ণসেবা, যে সেবা বিনিময়ে নিজের জন্যে কোনো প্রত্যাশা রাখে না। একবার যদি প্রীত হয়ে কৃষ্ণ ভক্তকে বলে, কী চাও বলো, ভক্ত বলবে, তোমার চরণসেবা। বেশ, তাই হবে। বলে কৃষ্ণের সাধ্য নেই যে সরে পড়বে। যখন চরণসেবা মঞ্জুর করেছ, তখন চরণ নিয়ে তুমি কোথায় পালাবে? আর তোমার ছুটি নেই, তোমার চরণ দু'খানি প্রীতিরজ্জু দিয়ে হৃদয়ে আবদ্ধ করে রেখেছি। এত বড় সর্বেশ্বর ঈশ্বর, শুধু প্রেমের কাছে

এই প্রেমই জনে-জনে শিখিয়েছেন গৌরহরি, দান করেছেন নির্বিচারে।

একদিন এক ভিক্ষুক শচীর আলয়ে ভিক্ষে করতে এসেছিল, দেখল শচীনন্দন প্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করছেন। ভিক্ষুকের কী হল, প্রভুকে নাচতে দেখে সেও নাচতে লাগল। প্রভু তাকে প্রেম দিলেন, কৃষ্ণপ্রেমরসে কোথাকার কে ভিক্ষুক ভেসে যেতে লাগল।

হে অর্জুন, বলছে কৃষ্ণ, যারা আমার নাম গান করে আমার সাক্ষাতে নাচে, আমি তাদের ক্রীত হয়ে থাকি, আর তারা যদি আমার নাম গান করে রোদন করে তা হলে আমি তার দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত হই না।

প্রভু প্রেম দিলেন সর্বজ্ঞ জ্যোতিষীকে। জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, গণনা করে বলো তো পূর্বজন্মে আমি কে ছিলাম? জ্যোতিষী বলে দিল, তুমি সর্বৈশ্বর্যময় ভগবান ছিলে, তোমার নিরীহ রাখালবেশও সে ঐশ্বর্য লুকোতে পারে নি। তুমি যেই হও, তোমাকে প্রণাম। সর্বজ্ঞ জ্যোতিষী প্রেমে ভরপুর হয়ে উঠল।

শ্রীবাসের কাপড় সেলাই করে মুসলমান দরজি, তার মধ্যে কী পেয়ে কে জানে, প্রভু তাকে নিজরূপ দর্শন করালেন। 'দেখেছি', 'দেখেছি', বলে দরজি প্রেমে পাগল হয়ে উঠল। প্রেমে সুরু করল নৃত্য করতে, 'বৈষ্ণব পাগল' অর্থাৎ অগ্রগণ্য বৈষ্ণব হয়ে দাঁড়াল।

প্রেম দিলেন নবদ্বীপের ভক্তগণকে, সার্বভৌমকে, অমোঘকে, প্রতাপরুদ্রকে, প্রকাশানন্দকে। প্রেম দিলেন যত্রতত্র, আলালনাথে, দক্ষিণ পথে, প্রয়াগে, বৃন্দাবনে, অক্রূর ঘাটে। প্রেম দিলেন ঝাড়-খণ্ডের আদিবাসীদের শুধু নয়, ঝাড়খণ্ডের স্থাবরজঙ্গমকে। আর মনে আছে কৃষ্ণদাস রাজপুতকে, যে স্বপ্ন দেখে প্রভুকে প্রত্যয় করেছিল, চেয়েছিল বৈষ্ণবকিঙ্কর হতে? প্রভু তাকে আলিঙ্গন করতেই সে উঠেছিল হরি বলে, প্রেমে মত্ত হয়ে গিয়েছিল!

প্রত্যক্ষ স্পর্শ নয়, শুধু দৃষ্টিতেই কত লোককে প্রেমে ভাসিয়ে দিয়েছেন। শুধু একটি স্মিতালোক, একটি কল্যাণকটাক্ষ।

'বাহু তুলি হরি বলে প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষনাশ প্রেমেতে ভাষায়॥'

তা ছাড়া প্রভুকে দেখে কত লোক প্রেম পেয়ে গেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

'যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে হরি বোলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক॥'
'রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম॥"

এই শ্লোক পড়ে প্রভু পথ চলেছেন আর যাকেই দেখেছেন,

বলেছেন, হরি-হরি বলো। যেই বলেছে তাকে আলিঙ্গন করে প্রভু প্রেমশক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। কৃষ্ণনামামৃতবন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছেন দেশ গ্রাম। প্রভুর দেহসৌন্দর্য দেখেও কত লোক প্রেমাবিষ্ট হয়েছে। শুধু দূর থেকে দেখে চিত্রোৎপল নদীতে স্নান করতে এসে রাজমহিষীরা প্রেম পেয়ে গেল। চোখে আপনা থেকেই জল এল, মুখে বলতে লাগল কৃষ্ণ-কৃষ্ণ। যবনরাজার হিন্দু চর তো দর্শন পেয়ে বাউল হয়ে গেল। আর সেই যবন দূর থেকে দেখেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, প্রেমে উচ্চারণ করল কৃষ্ণনাম।

দর্শনে হবে স্পর্শনে হবে এমন কি গৌরহরির নামমাত্র শ্রবণে মানুষ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হবে। তাই আর কিছু নয়, শুধু নামের আশ্রয় নাও। শুধু নামেতেই, শুধু অর্থহীন অক্ষর উচ্চারণেই পরম প্রেমপ্রাপ্তি। পরম সম্পত্তিলাভ।

স্মরণমনন করবে যে, চিত্তকে তো স্থির করতে হবে। এই স্থৈর্য সম্পাদনের জন্যেই নাম দরকার। নামে কত সুবিধে, সজন-বিজন লাগে না, দীক্ষা-পুরশ্চর্যার দরকার হয় না। যে কোনো লোক যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় নাম করে ফলবান হতে পারে। হলই বা না বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, ব্রহ্মচর্যশূন্য —হরিনামে সেও ধর্মিষ্ঠদের দুর্লভ গতি লাভ করতে পারে।

নাম স্বতন্ত্র, তাই কোনো বিধি-নিষেধের সে অধীন নয়। আর কোনো সাধনের এমন স্বাতন্ত্র্য নেই, তাই তো নামই পরম উপায়।

তা ছাড়া নামের কৃপা স্বতঃসিদ্ধ। নামী ভগবানকেও নামায়, নামকীর্তনকারীকেও নামায়। একজনকে তার অচল অটল সিংহাসন থেকে, আরেকজনকে তার অভিমান থেকে। নিরপরাধে নাম নিলেই প্রেমধন মেলে। নামাপরাধ থাকলে সমস্ত অনর্থক। কিন্তু নামের এমনি কৃপা যে নামাপরাধও খণ্ডন করে দেয়।

নাম আর নামী অভিন্ন। তাই নামীর যেমন মহিমা তেমনি মহিমা আবার নামের।

হরিনাম হরির মতই মধুর।

তা ছাড়া নাম আর নামী অভিন্ন বলে নাম অপ্রাকৃত চিদবস্তু। এমন কি নামের অক্ষরও অপ্রাকৃত চিন্ময়। নামাক্ষরই ব্রহ্ম। 'এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম'।

নাম আর নামী এক বলে, আরেক মহিমা, নামভাসেও প্রেম জাগে। অন্য বস্তুকে নির্দেশ করলেও নামের শক্তি হ্রাস পায় না। নারায়ণ পুত্রের নাম হলেও নারায়ণ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই ভগবান চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

আর সব সাধনাঙ্গে, মন্ত্রে-তন্ত্রে যজ্ঞে-যাগে কত ত্রুটি ও অঙ্গহানির সম্ভাবনা, নাম সমস্ত কিছুকে নিশ্ছিদ্র করে। নববিধা ভক্তিও এই নাম থেকে পূর্ণতা পায়।

হরি শব্দ উচ্চারণ করলে সমস্ত বেদ অধীত হয়ে যায়, সমস্ত তীর্থভ্রমণ পরিসমাপ্ত হয়, আর কোনো সৎকর্মের প্রয়োজন হয় না। নামই সমস্ত দুঃসহ পাপ দূরীভূত করতে পারে, নামই সর্বমহা-প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রহ্মকে জানার উপায়ও আবার ভক্তি। কৃষ্ণনামই মহামন্ত্র।

সঙ্কীর্তন যজ্ঞে যে কৃষ্ণ-আরাধন করে সেই সুবুদ্ধি, সেই কৃষ্ণচরণের অধিকারী। নাম সঙ্কীর্তন থেকেই সমস্ত অনর্থের নাশ হয়, সকল মঙ্গলের উদয় হয়, কৃষ্ণপ্রেমের বিচিত্রতম অভিব্যক্তি ঘটে।

কৃষ্ণকীর্তনের জয় দাও। শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকটি দেখ। কৃষ্ণকীর্তনই নিত্য জয়যুক্ত। সে কী করে? চেতোদর্পণ মার্জন করে। দুর্বাসনা দূরীভূত করে। আর কী করে? ভব-মহা-দাবাগ্নি নির্বাপণ করে। ত্রিতাপজ্বালা শান্ত করে। সংসারবিষানল নিবিয়ে দেয়। জ্যোৎস্নায় যেমন কুমুদ বিকশিত হয় তেমনি কৃষ্ণকীর্তনে জীবের মঙ্গলবাসনা প্রস্ফুটিত হবে। কী সে কল্যাণেচ্ছা? একমাত্র কৃষ্ণসেবা। বিদ্যাবধূর জীবনই এই কীর্তন। বিদ্যা কী? কৃষ্ণভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। সে বিদ্যারূপ বধূকে কে বাঁচিয়ে রাখবে? শুধু কীর্তনই

বাঁচিয়ে রাখবে। আর আনন্দ-অম্বুধির বর্ধন ঘটাবে। আনন্দের ঢেউয়ে ভক্তের হৃদয় তোলপাড় করে তুলবে। প্রতি পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন দেবে। দেহ মন আত্মাকে আনন্দরসে সিঞ্চিত করে রাখবে। উচ্চারণ করছে জিহ্বা কিন্তু সমস্ত দেহ মন আত্মা সুখস্নানে প্লাবিত হয়ে যাবে। সুতরাং কৃষ্ণকীর্তনই সর্বজয়ী।

'সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন-উদ্‌গম ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥'

তারপর দ্বিতীয় শ্লোকটি নাও :

'নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥'

ভগবান, তোমার কত নাম, কত নামে তুমি কীর্তিত, প্রচারিত। মুকুন্দ-গোবিন্দ-হরি—কত কত অজস্র। সমস্ত নামেই নিজের পূর্ণশক্তি অর্পণ করেছ। সেই নামের স্মরণবিষয়ে সময়ের কোনো নিয়ম নেই অনুশাসন নেই—এমনি তোমার নিরর্গল কৃপা। কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে এমন নামেও আমার অনুরাগ হল না।

ভগবানের সকল নামেই সমান শক্তি সমান গৌরব। যার যাতে প্রীতি সে সেই নামেই আনন্দিত। যে মুক্তি চায় সে মুকুন্দ বলুক, যে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে সেবা করতে চায় সে বলুক গোবিন্দ। যে বিঘ্ন বিপদ উত্তীর্ণ হতে চায় সে বলুক পুতনারি। আর যে শুধু প্রেমে উদ্বেলিত হতে চায় সে বলুক কৃষ্ণ-কৃষ্ণ।

এত যেখানে রুচির স্বাধীনতা সেখানেও আমার দুর্ভাগ্য গেল না। আমিই শুধু নামে জাতানুরাগ হলাম না। এত কৃপার মধ্যেও আমিই কৃপণ রইলাম।

'অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে-শুইতে যথা-তথা নাম লয়।
দেশ-কাল নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয়॥
সর্বশক্তি নামে দিলেন করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ॥'

৭৯

দুর্দৈব কী? সেবা-বিমুখতাই দুর্দৈব। অন্যাভিলাষিতা, স্বরূপ-বিস্মৃতি, অনুরাগের অভাবই দুর্দৈব।

কিন্তু নামই আবার সমস্ত দুর্দৈবের প্রতিকার। অতৃপ্তিলাঞ্ছিত মনে নাম করতে গিয়ে অপরাধ ঘটে, আবার নামাপরাধের ওষুধও নাম। নিরন্তর নামে অপরাধের অবকাশটুকুও থাকে না। কালাকালের কঠিন শৃঙ্খল থেকেও নামোচ্চারককে নামকৃপা মুক্তি দিয়ে বসেছে।

'কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥'
'সর্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।'
'খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্বসিদ্ধি হয়॥'

এই নামসাধনের প্রণালী কী? যদিও বিধিপদ্ধতি কিছু নেই, নামের মুখ্য ফল প্রেম পেতে হলে নাম করবার সময় চিত্তের একটি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। সেটি আর কিছুই নয়, অভিমানশূন্যতা, নির্মৎসরতা, বিষয়বিরক্তি।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥'

তৃণ থেকেও নীচ হয়ে, বৃক্ষের মতন সহিষ্ণু হয়ে, নিজে সম্মান লাভের অভিলাষ না করে, বরং অপর সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সর্বদা হরিকীর্তন করবে।

তৃণ থেকে নীচ হই কী করে? কী করে তরুর মত সহিষ্ণু হই? প্রথম থেকেই নিজে নিরভিমান থেকে পরকে সম্মান দিতে পারি কই? উপায় কী? নামই উপায়। নামের প্রভাবেই দৈন্য আসবে সহিষ্ণুতা আসবে, জাগবে অনভিমান, অন্যকে মান্য করার স্পৃহা। নামের স্পর্শে ঐ সব গুণ উপস্থিত হলেই না নামের ফল প্রেমের আবির্ভাব!

'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয় ॥'

নামসাধক হয়তো ধনে জনে কুলে মানে বিদ্যায় গরিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ, হয়তো ভক্তিতেও সর্বোত্তম, তবু নিজেকে সর্বভাবে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা হেয় মনে করবে। পদদলিত তৃণের চেয়ে তুচ্ছ আর কী আছে? আমি সেই তৃণের চেয়েও তুচ্ছতর। বৃক্ষের মত সহিষ্ণু আর কে আছে? তার দু রকম সহিষ্ণুতা। এক, অন্যকৃত দুঃখ সইছে, দুই প্রকৃতিদত্ত দুঃখ সইছে। কেউ গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে তাতেও

আপত্তি করছে না, প্রকৃতি রৌদ্রদাহে দগ্ধ করে মারলেও নীরবে সয়ে যাচ্ছে। উদ্ধারের আশায় কারু কাছে সাহায্য পর্যন্ত প্রার্থনা করছে না। বৃক্ষের আরো গুণ। যে যা চাইছে, ডাল পালা ফুল পাতা বল্কল নির্যাস, দান করছে অকাতরে। নিজে পুড়ে মরছে অথচ অন্যকে ছায়া দিচ্ছে, নিজে ভিজে মরছে অথচ অন্যকে আশ্রয় দিচ্ছে। তাই সাধক সহিষ্ণু হবে, দৈন্যভাবাপন্ন হবে, অনিষ্টকারীর প্রতিও রুষ্ট হবে না, সমস্ত দুঃখ দুর্বিপাক কৃতকর্মের ফল ভেবে অবিচলিত চিত্তে মেনে নেবে। শত্রুকেও প্রীতি থেকে বঞ্চিত করবে না, নিজে দগ্ধ হয়েও শত্রুর তাপ নিবারণ করবে, বদান্যতার চূড়ান্ত হয়ে থাকবে। মনে-মনেও আশা করবে না কেউ তাকে মান দিক, মুখের কটাক্ষকেও অম্লানমুখে সহ্য করবে। যেমন তার প্রার্থনা নেই তেমনি তার প্রতিহিংসাও নেই, বরং যে তাকে হিংসা করছে তার মঙ্গল কামনা করছে। অবজ্ঞায়ও তার ক্ষোভ হয় না।

আর কী লক্ষণ ?

প্রত্যেক জীবকেই কৃষ্ণের শ্রীমন্দির বলে মনে করবে। মন্দির ভগ্ন হোক বিকৃত হোক, অপরিচ্ছন্ন হোক, ভক্তের কাছে তা সমান পূজনীয়। তেমনি জীব যতই হীন হোক দীন হোক, ভক্তের কাছে সে সমান নমস্য।

'মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ বহুমানয়ন।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি।'

সকল জীবের মধ্যেই অন্তর্যামীরূপে ঈশ্বর বিরাজ করছেন এই উপলব্ধিতে চণ্ডাল কুকুর গরু গাধা সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে।

'ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥'

এইভাবে যে কৃষ্ণনাম নেবে তারই কৃষ্ণচরণে প্রেম জাগবে।

বলতে বলতে প্রভুর দৈন্য বাড়ল, কৃষ্ণের কাছে তিনি শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করলেন।

শুদ্ধা ভক্তি কাকে বলে? যে ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার বাসনা ছাড়া আর কোনো বাসনার স্থান নেই তাই শুদ্ধা ভক্তি। যে ভক্তিতে শুধু কৃষ্ণপ্রীতির অনুশীলন। যে ভক্তিতে শুধু কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য। যে ভক্তি জ্ঞান বা কর্মদ্বারা আবৃত নয়। যে ভক্তি অহৈতুকী। আর সে ভক্তিই প্রেম।

প্রভু প্রেমময়তনু, তবু প্রেমের অভাব অনুভব করছেন কেন? প্রেমের স্বভাবই এই, যার মধ্যে প্রেম, তাকেই প্রেম মনে করায় আমার লেশমাত্র প্রেম নেই। প্রেমের অভাবজ্ঞান এনে দেওয়াই প্রেমের ধর্ম। আমি বোধ হয় প্রেমের কিছুই জানি না, কৃষ্ণপ্রেমের কণাও আমার মধ্যে নেই। হে কৃষ্ণ, আমাকে শুধু ভালোবাসতে দাও, আমাকে ভালোবাসতে শেখাও। আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমাকে ভালোবাসতে চাই।

'ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥'

হে জগদীশ, তোমার কাছে আমি ধন চাই না, জন চাই না, সুন্দরী স্ত্রী বা সালঙ্কারা কবিতাও চাই না, আমার এই শুধু প্রার্থনা, যেন জন্মে জন্মে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। ফলানুসন্ধানরহিতা চিৎস্বভাবাশ্রয়া কৃষ্ণানন্দরূপা অকিঞ্চনা অমিশ্রা কেবলা ভক্তি। কৃষ্ণপাদাম্বুজযুগগতা নিশ্চলা ভক্তি।

প্রবল দৈন্যে ভগবান মহাপ্রভু সংসারজীব-অভিমানে দাস্যভক্তি প্রার্থনা করলেন।

'অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥'

হে সেবানন্দলীলারসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন, আমি তোমার কিঙ্কর, আমি বিষম ভবসমুদ্রে নিপতিত, তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পদসংলগ্ন ধূলিতুল্য বিবেচনা করো।

আমি জীব, তাই স্বরূপত আমি কৃষ্ণদাস। আমি দাস হয়েও দাস্যে উদাসীন, তোমার সেবায় পরাঙ্মুখ। তাই দুষ্পার সংসারসাগরে ডুবেছি। এখন একমাত্র তোমার কৃপাই আমার অবলম্বন। কৃপা করে আমাকে তোমার পদধূলি করো, পদধূলি করে বোঝাও, তোমার চরণই আমার আশ্রয়, তোমার চরণসেবা করাই আমার কাজ।

কিন্তু কৃষ্ণসেবা পাব কী করে যদি না সপ্রেমে নাম-সঙ্কীর্তন করি?

প্রভুর সপ্রেম নাম-সঙ্কীর্তনের জন্যে উৎকণ্ঠা জাগল। কৃষ্ণের কাছে পরম দৈন্যে সেই প্রেমের প্রার্থনা করলেন।

'নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥'

হে কৃষ্ণ, কবে তোমার নাম করতে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন আপ্লুত হবে, গদগদবাক্যে বদন রুদ্ধ হবে, সমস্ত দেহ পুলকরোমাঞ্চে পরিব্যাপ্ত হবে?

'প্রেমধন বিনু ব্যর্থ দরিদ্র-জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥'

হে কৃষ্ণ, হে আমার প্রভু, তুমি আমাকে তোমার ভৃত্য করো ভৃত্য করে তোমার সেবায় নিয়োজিত করো, আমার প্রাপ্য বেতন বলে তোমার প্রেমধন আমাকে দান করো।

একমাত্র কৃষ্ণই প্রেমদাতা। প্রেম কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরই বৃত্তি। 'হ্লাদিনীর সার প্রেম।' সুতরাং কৃষ্ণই প্রেমের মূল উৎস। আর এই কৃষ্ণ, এই 'হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিঃ'ই তো গৌরহরি। নির্বিচারে প্রেম দিলেন। ঝাড়িখণ্ডের পথে স্থাবরজঙ্গমকেও অভিষিক্ত করে দিলেন।

'কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্তয়ন।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥'
'অ-মায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দুইরে।
জন্ম-জন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে।'

রূপসনাতনকে প্রেম দেবার জন্যে গৌরহরি আদেশ করলেন অদ্বৈতকে। বললেন, 'অদ্বৈত, তুমিই ভক্তির ভাণ্ডারী। তুমি প্রেম না দিলে কৃষ্ণধন মেলে কী করে?'

'ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে তুমি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণ কারে মিলে।'

তখন অদ্বৈত, 'যাহার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার,' বিনম্রবাক্যে বললে, 'প্রভু, আমি যদি ভাণ্ডারী হই তুমি সেই ভাণ্ডারের মালিক। প্রেমদাতা সর্বদাতা একমাত্র তুমিই। তবে তুমি আদেশ করলে আমি তোমার ভাণ্ডারের জিনিস বিতরণ করতে পারি মাত্র।'

খাজনার মালিক কৃষ্ণ, গৌরহরি, ভক্ত শুধু তার খাজাঞ্চি।

'অদ্বৈত বলেন, প্রভু, সর্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এইমত যারে কৃপা কর যার দ্বারে॥
কায়মন বচনে মোহোর এই কথা।
এ দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্বথা॥'

অদ্ভুতার্থ প্রেমনাম গৌরহরির আগে আর কার শ্রবণপথগত হয়েছিল? কেই বা আর জেনেছিলেন শ্রীনামের মহিমা? বৃন্দাবনবিপিনের মহামাধুরীতে আর কারই বা প্রবেশ ছিল? আর কেই বা রাধিকার পরমরসচমৎকার মাধুর্যসীমা পেরেছিলেন বুঝতে? কে তিনি? তিনি সেই একজন, শ্রীচৈতন্য। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম করুণার বশবর্তী হয়ে সর্ব-সমস্তকে জগতে প্রকটিত করলেন।

প্রেমের কথা বলতে-বলতে প্রভুর ভক্তভাব অন্তর্হিত হল, দেখা

দিল রাধিকার ভাবাবেশ। জাগল বিরহ-দুঃখ, বিয়োগস্ফুরণ। উদ্বেগবিষাদ-দৈন্যে প্রলাপ করতে লাগলেন : গোবিন্দবিরহে আমার এক নিমেষ-কাল এক যুগের মতন দীর্ঘ হয়েছে, চোখ বর্ষণপ্রবণ মেঘের স্বভাব নিয়েছে আর সমস্ত জগৎ শূন্যময় হয়ে গিয়েছে।

'যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥'

এই তো বিপ্রলম্ভ। জাতরতি ভক্তের সম্ভোগের পরিবর্তে বিপ্রলম্ভরসের মাধুরী অধিকতর প্রাকৃত। বিপ্রলম্ভে বা বিরহরসে কেবল দুঃখ, অপ্রাকৃতে পরমানন্দ। বাইরে যন্ত্রণা ভিতরে মধু।

'যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহারদুখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥'

বিপ্রলম্ভই সম্ভোগের পুষ্টিকারক। বিপ্রলম্ভেই কৃষ্ণস্মরণপ্রাচুর্য।

'উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ হৈল যুগ-সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন॥
গোবিন্দবিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন॥'

'সুখবাঞ্ছা নাই সুখ হয় কোটিগুণ।' ভক্তের সুখবাঞ্ছা নেই, তবু ভগবান তাকে সুখ দেন। ভক্তের শুধু সেবাতেই গৌরব। সেবা করে যে সুখ পাওয়া যায় সেই সুখ পাছে মূল সেবার বাধক হয় ভক্ত তাই সেবা-সুখও বর্জন করে। 'নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।' তাই তো কমলনয়না সেই কৃষ্ণকান্তা গোবিন্দদর্শনে উদ্‌গত আনন্দাশ্রুকে কৃষ্ণদর্শনের বিঘ্নবোধে ধিক্কার দিয়েছিল। কৃষ্ণসারথি দারুক কৃষ্ণকে চামর ব্যজন করতে গিয়ে সাত্ত্বিক ভাবোদয়ের প্রভাবে পড়েছিল, হাত জড়ীভূত হয়ে আসছিল, তাই প্রেমানন্দ সেবার বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে তাকে অভিনন্দিত করতে পারে নি। শুধু কৃষ্ণসেবা, বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাই ভক্তের কামনীয়।

'কৃষ্ণ যেমন তোমার প্রতি উদাসীন হয়েছে, তুমিও তেমনি কৃষ্ণকে

উপেক্ষা করো।' সখীরা রাধিকাকে উপদেশ করল: 'ঐ কঠিনের প্রতি কেন তুমি কাতর হবে? তুমি কঠিন হলে দেখবে কৃষ্ণ নরম হবে, তোমার কাছে না এসে থাকতে পারবে না।'

সখীদের উপদেশে ফল বিপরীত হল। রাধিকার নির্মল হৃদয়ে, যে হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া আর কিছু নেই, জাগল প্রেমোচ্ছ্বাস। সে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গমালার নাম ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয়, প্রৌঢ়ি বা প্রগল্‌ভতা। বললে, 'আমি কৃষ্ণের পদদাসী ছাড়া কিছু নই। তিনি আমাকে আলিঙ্গনে নিষ্পেষিতই করুন বা অদর্শনে থেকে মর্মাহতই করুন, বা যথা তথা বিহারই করুন, সে লম্পটই আমার প্রাণনাথ।'

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা—
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাগরঃ॥'

আমি শ্রীকৃষ্ণচরণের দাসী, সুতরাং কৃষ্ণ যাই করুন না-করুন, সেবাদ্বারা সর্বভাবে তাঁর সুখবিধানই আমার একমাত্র কর্তব্য। তিনি আমাকে আলিঙ্গনে আত্মসাৎই করুন, বা দর্শন না দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারুন, তিনিই আমার প্রাণপ্রাণ।

'আমি কৃষ্ণপদ দাসী তেঁহো সুখ রসরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেন দরশন জারেন আমার তনুমন
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥'

অনুরাগই করুক বা দুঃখ দিয়ে মারুক, কৃষ্ণই আমার আপনতম জন। তাঁর অন্যতর প্রেয়সীদের ছেড়ে কখনো-কখনো আমারই ইচ্ছায় তাঁর তনুমনকে আমারই বশীভূত করে দেন। পরিত্যক্তা প্রেয়সীদের চোখের সামনেই আমাকে নিয়ে ক্রীড়া করেন, আমার সৌভাগ্য সকলের চেয়ে বেশি তাই প্রকট করে অন্য নারীদের ক্ষুণ্ণ করেন। কিন্তু সেই শঠ-লম্পটের স্বভাব দেখ। আবার আমাকেই

পরিত্যাগ করে আমাকেই দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে অন্য প্রেয়সীদের নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠেন। তবু সেই ধৃষ্ট কপট বহুবাসক্তই আমার প্রাণনাথ। জানি সে সম্মুখে প্রিয়বাক্য বলে পরোক্ষে অপ্রিয়কার্য করে, জানি কোথায় নিশিযাপন করে কার চরণের অলক্তকচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে এসেছে, জানি কার শুধু বচনে পটুতা নয়নে নৈপুণ্য, তবু তিনি, তিনিই আমার প্রাণবন্ধু, জীবনবল্লভ।

'না গণি আপন দুখ,
সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।'

আমি কখনো এমন আশা করি না যে তিনি আমাকে সুখী করবেন। আমি শুধু এই আশা করি আমাকে নিয়ে তিনি তাই করুন যাতে তাঁর সুখ হবে। আমাকে দুঃখ দিয়ে তিনি যদি সুখী হন তা হলে সেই দুঃখই আমার বরণীয়। তাঁকে সুখী করাই যে আমার প্রাণের প্রার্থনা তা তিনি বোঝেন, আর বোঝেন বলেই সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন, আর সেইজন্যেই তো তিনি আমার প্রাণনাথ।

যে নারীকে কৃষ্ণ বাঞ্ছা করেন, যার রূপে কৃষ্ণ সতৃষ্ণ, তাকে না পেয়ে কৃষ্ণ কেন দুঃখিত হতে যাবেন? কৃষ্ণের সুখের জন্যে আমি সেই নারীকে এনে দেব। সে নারী যদি অনিচ্ছুক হয় আমি তার পায়ে ধরে মিনতি করব, পরে তাকে হাতে ধরে নিয়ে যাব কৃষ্ণের কাছে, ক্রীড়া করিয়ে সুখী করাব কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের ভালো লাগবে বলেই তার কান্তারা মাঝে মাঝে মান করে, আবার কৃষ্ণ অল্প একটু অনুনয়-বিনয় করলেই মান ছেড়ে দেয়। মান বেশিক্ষণ ধরে রাখলে কৃষ্ণ পাছে ব্যথা পায়, তার সুখের ব্যাঘাত হয়, তাই তারা তাড়াতাড়ি মান ত্যাগ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের মান করাও কৃষ্ণসুখের জন্যে, মান ছাড়াও কৃষ্ণসুখের জন্যে।

সকলেই জানে গাঢ় রোষে কৃষ্ণের আত্যন্তিক দুঃখ। জেনে শুনে যে নারী কৃষ্ণের প্রতি গাঢ় রোষ করে তার জীবনে ধিক। গাঢ়

রোষে যে শুধু নিজের চরিতার্থতা খোঁজে তার মাথায় যেন বাজ পড়ে। যে নারী কৃষ্ণের সুখ চায় না, শুধু নিজের গরব চায়, সে বাঁচে কেন? আমি শুধু কৃষ্ণের সুখ চাই। যাতেই কৃষ্ণের সন্তোষ তাতেই আমার সমর্থন, তাতেই আমার সমর্পণ। যদি আমার প্রতি বিদ্বিষ্টা কোনো গোপীকে দিয়েও কৃষ্ণের সুখসাধন হয় তা হলে সেই গোপীরও আমি দাসী হতে প্রস্তুত। কৃষ্ণের তৃপ্তির কাছে আমার আবার ব্যক্তিত্ব কী। যে প্রেমের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে তার আবার কিসের স্বার্থ-তট।

'যে গোপী মোরে করে দ্বেষে,
কৃষ্ণের করে সন্তোষে
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুঞি তার ঘরে যাঞা
তারে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোরে সুখের উল্লাস ॥'

দুগ্ধের সার নবনী। নবনীর সার ঘৃত। তেমনি সর্ববেদের প্রাণধারা ভক্তি। ভক্তির সার ব্রজপ্রেম। সেই প্রেম জগতে প্রকটিত করলেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু সেই প্রেমদান করতে এলেন গৌরচন্দ্র। সর্বভক্তিসার ব্রজপ্রেমদানে একমাত্র গৌরজলধরেরই অধিকার।

৮০

'কুষ্ঠিবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।'

দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, এক সুন্দরী বেশ্যার রূপে অভিভূত হয়েছে। শ্রমে-সেবায় লীলায়-কলায় তার পতিব্রতা স্ত্রী

কিছুতেই তাকে বশীভূত করতে পারছে না। চলতে অক্ষম, বিপ্র যে বেশ্যার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে একবার যে তাকে চোখে একটু দেখবে তারও সাধ্য নেই। যদি একটিবার তাকে চোখেও দেখতে পেতাম—স্বামীর কাতরতা শুনতে পেল স্ত্রী। বলো তোমার কিসের দুঃখ, দেহ ছেড়ে এ আবার কোন চিত্তের যন্ত্রণা!

স্ত্রীকে তখন বললে সব ব্রাহ্মণ। এই কথা? যে করে হোক আমি এনে দেব তোমার চক্ষের পরিতৃপ্তি। স্বামীর সুখসাধনই স্ত্রীর একমাত্র ব্রত।

কিন্তু অর্থ কই যে বেশ্যাকে সম্মত করা যাবে? ব্রাহ্মণের স্ত্রী তখন পরিচারিকা সাজল, বেশ্যার ঘরে গিয়ে তার বিনাবেতনের কিঙ্করী হল। সেবা দ্বারা তুষ্ট করল বেশ্যাকে। বলো তুমি কী চাও? তোমার এই অনন্যপ্রাণ সেবাকে আমি কী দিয়ে পুরস্কৃত করি?

'শুধু একবারটি আমার ঘরে চলো।'

'তোমার ঘরে?' গণিকা অবাক মানল।

'হ্যাঁ, আমার স্বামী তোমাকে একটিবার দেখবে।'

এ কী অকথন প্রার্থনা! গণিকা তখন জানতে চাইল আসল ব্যাপার কী। বিপ্রের স্ত্রী তখন বললে সব আগাগোড়া।

বেশ্যা বললে, 'আমি যেতে পারব না, তোমার স্বামীকে এখানে আসতে বলো।'

'সে কী করে আসবে? সে যে হাঁটতে পারে না।'

'তা আমি জানি না। আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব।' দৃপ্ত গরিমায় বললে গণিকা।

তাই সই। নিশ্চল স্বামীকে পিঠে করে বহন করেই এখানে নিয়ে আসব। আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রেখে তাকে মরতে দেব না।

বাড়ি ফিরে এসে সব বললে স্বামীকে। 'তোমাকে দেখা দিতে রাজি করিয়েছি। চলো।'

কী করে যাবে? ব্রাহ্মণ অসহায় চোখে তাকাল বিহ্বলের মত।

'তোমাকে আমি পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাব।'

'লোকে দেখবে যে।'

'না, দেখবে না। রাত্রে নিয়ে যাব।'

রাতে, অন্ধকারে, স্বামীকে পিঠে তুলে বেশ্যার ঘরের উদ্দেশে বেরুল ব্রাহ্মণী। পথের পাশে শূলাসনে বসে মার্কণ্ড মুনি সমাধিমগ্ন, বুঝি স্পষ্ট করে দেখতে পায় নি তাকে, কুষ্ঠিবিপ্রের স্পর্শ তার গায়ে লাগল। মুনির টুটে গেল সমাধি। মুহূর্তমাত্র দেরি হল না, ক্রোধে শাপ দিয়ে বসল, রাত্রিগতেই যেন এ পাপিষ্ঠের মৃত্যু হয়।

তার অর্থ আমি বিধবা হব? ব্রাহ্মণীও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। আমার এত পতিসেবার পুরস্কার বৈধব্য? আর এত ক্লেশ সত্ত্বেও আমার স্বামীর কামনা অচরিতার্থ থাকবে?

বিপ্রপত্নীও শপথবাক্য উচ্চারণ করল: 'আমি যদি পতিব্রতা হই তবে এ রাত্রি প্রভাত হবে না।'

সতীবাক্য ব্যর্থ হবার নয়। সূর্যের গতি স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাত্রি প্রভাত হল না।

মহা সর্বনাশ উপস্থিত। সূর্যের অভাবে জীবজগৎ ছারখার হতে বসল। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনজনেই মহা ফাঁপরে পড়লেন। চলে এলেন ব্রাহ্মণীর কাছে। বললেন, 'সূর্যকে উঠতে অনুমতি দাও। সূর্য না উঠলে সমস্ত প্রাণিজগৎ যে বিনষ্ট হয়ে যায়।'

'আর সূর্য উঠলে আমার স্বামী যে বাঁচে না!' বিপ্রপত্নীও জানে কঠিন হতে।

'তোমার স্বামীকে মুনির শাপের মান রাখতে একবার মরতে দাও। আমরা কথা দিচ্ছি,' তিন দেবতা সংযুক্ত আশ্বাস দিলেন: 'আমরা তাকে আবার বাঁচিয়ে দেব। তোমার সম্মানও প্রতিষ্ঠিত হবে।'

ব্রাহ্মণী তখন সূর্যকে উঠতে অনুমতি দিল। রাত্রি প্রভাত হল, কুষ্ঠিবিপ্র মারা গেল, আবার দৈবানুগ্রহে বেঁচে উঠল। বিপ্র আর

স্ত্রী দুজনেই অবাক, নতুন সুন্দর দেহে কুষ্ঠের লেশমাত্র চিহ্নও আর নেই। যেহেতু নতুন হয়ে নীরোগ হয়ে উঠেছে, বেশ্যাসক্তি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

আমারও সেই রকম কৃষ্ণকে ভালোবাসা। কৃষ্ণের জন্যে সর্ব তর্পণ, সর্ব অর্পণ আমার।

'কুষ্টিবিপ্রের রমণী পতিব্রতা-শিরোমণি
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্যের গতি জীয়াইল মৃতপতি
তুষ্ট কৈলে মুখ্য তিন দেবা॥'

তেমনি, সখি, কৃষ্ণই আমার জীবন, আমার প্রাণধন, আমার প্রাণের প্রাণ। সেই হৃদয়ের হৃদয়কে হৃদয়ে ধরে সেবা করা, সেবা করে সুখী করাই আমার ধ্যান, আমার জপতপ, আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস। আমার যে সঙ্গম সে আমার নিজের সুখের জন্যে নয়, আমার সঙ্গে সঙ্গমে কৃষ্ণ সুখী হবে তারই জন্যে। আবার আমার সুখেই কৃষ্ণের সুখ সেই কৃষ্ণসুখের জন্যেই আমার সুখী হওয়া। আমার সুখও কৃষ্ণসুখেরই দক্ষিণা। আমাকে কান্তা করে কৃষ্ণ আমাকে প্রাণেশ্বরী বলে সম্বোধন করলেও আমি নিজেকে দাসী বলেই ভাবি। আমার প্রেয়সী-অভিমান নয়, আমার দাসী-অভিমান।

সঙ্গমসুখের চেয়েও সেবাসুখ সুমধুর। সেবাতেই সুখের সমুদ্র। দেখ না লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে। নারায়ণের হৃদয়ের উপর থেকেও তাঁর তৃপ্তি নেই, বিশ্রাম নেই, সর্বক্ষণই তাঁর পদসেবার আগ্রহ। নারায়ণের বুকের চেয়েও নারায়ণের পায়ের জন্যেই তাঁর বেশি লোভ।

বিশুদ্ধ প্রেম-লক্ষণে-ভরা রাধিকার কথা আস্বাদন করছেন গৌরহরি। যে প্রেমে আত্মসুখের গন্ধমাত্র নেই সেই ব্রজপ্রেমের অর্থ প্রকাশ করলেন। তাঁর এই অষ্টশ্লোকেই লোকশিক্ষার বীজ নিহিত। তাই এই অষ্টশ্লোকের নাম শিক্ষাশ্লোক বা শিক্ষাষ্টক।

'প্রেমধন বিনু—ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন ॥'

তারপরেই চৌদ্দশ পঞ্চান্ন শকে আটচল্লিশ বছর বয়সে প্রভুর তিরোভাব হল।

কিন্তু আবির্ভাব কোথায়?

'সর্বত্র ব্যাপক প্রভু সদাসর্বত্র বাস।' কিন্তু তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে মানুষ দেখবে কী করে? সর্বত্র বিদ্যমান হয়েও যিনি লোকচক্ষের অগোচর তাঁকে তাঁর কৃপাশক্তিতেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

নীলাচলে থেকেও গৌড়দেশে গৌরহরির চার জায়গায় নিত্য আবির্ভাব। শচীমাতার ঘরে, নিত্যানন্দের নর্তনে, শ্রীবাসের কীর্তনে আর পানিহাটিতে রাঘবপণ্ডিতের ভবনে।

মার কাছে গিয়ে খেয়ে আসতেন। শচী ভাবতেন স্বপ্ন। ভোজনের পরেও প্রসাদপাত্র পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। কোনোদিন পাকপাত্র শূন্য দেখে আবার ভোগ লাগাতেন। নিমাই যে খাচ্ছে, খেয়ে গেছে, অন্তরে সুখ মানলেও প্রত্যক্ষে মানতে পারতেন না। শুধু তাঁর বাৎসল্য-প্রেমটিই অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকত।

নিত্যানন্দকে বলে দিলেন, 'তুমি যখনই প্রেমানন্দে নাচবে আমি অলক্ষ্যে থেকে তা দেখব। তোমার বার-বার নীলাচলে আসবার দরকার নেই, তুমি ওখানেই আমার সঙ্গ পাবে। তোমার নৃত্য জানবে আমারই নৃত্য।'

শ্রীবাসকেও বলে দিলেন সেই কথা। 'তোমার বিরহে আমি বাঁচব কী করে?' জিজ্ঞেস করল শ্রীবাস। প্রভু বললেন, 'তোমার গৃহে কীর্তনে আমি নিত্য নাচব, তোমার দেবালয়ে নিত্য অবস্থান করব। তুমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পাবে না।'

পানিহাটির রাঘবপণ্ডিতের সেবার পারিপাট্য। শুধু কৃষ্ণসেবার ভোগ নয় গৌরসেবারও ভোগ লাগায় রাঘব। প্রভু প্রতিদিন এসে ভোজন করে যান।

নিত্যস্থিতি ছাড়া সাময়িক আবির্ভাব তো কত জায়গায়।

গলৎকুষ্ঠী বাসুদেবের সামনে, পানিহাটিতে রঘুনাথের গৃহে দধি-চিড়া উৎসবে, যেমন শিবানন্দের ঘরে।

আবির্ভাব লোকনিস্তারের জন্যে।

'সর্বলোক নিস্তারিতে গৌর অবতার।'

কোথাও সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে, কোথাও বা আবেশ সঞ্চার করে। এমন কি কুকুরের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত করে।

সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ দেখলেন, হাতে করে ভাতের গ্রাস নিয়েছে, জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে নিমাই কোথায়, এ যে বৃন্দাবনবিহারী মুরলীবদন শ্রীকৃষ্ণ।

'ভাত খায়, হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।'
'সেই ক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অষ্টভুজ রূপ॥'

নিতাই আর নিমাইকে খেতে দিয়েছেন শচীমাতা। একবার পরিবেশন করে অন্য উপচার আনতে ঘরের মধ্যে গিয়েছেন, এসে দেখেন নিমাই-নিতাই কোথায়, এরা যে কৃষ্ণ-বলরাম।

খোলা-বেচা শ্রীধরও প্রভুর মধ্যে কৃষ্ণকে দেখল। প্রভু বললেন, 'শ্রীধর, তুমি আমার অনেক আরাধনা করেছ, তোমার খোলায় অনেক অন্ন খেয়েছি। এবার আমার রূপ দেখ।' শ্রীধর তাকিয়ে দেখল তমালশ্যামল কৃষ্ণ হাতে বাঁশি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পাশে বলরাম। চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ দুজনেই স্তুতি করছে। করজোড়ে তাই শুনছে নারদ আর শুক আর সনক।

দেখল বনমালী ভিক্ষুক। ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষে করতে এসেছিল একদিন। প্রভু বললেন, 'এস তোমার সঙ্গে হরিকীর্তন করি।' প্রভু কীর্তন করছেন আর বনমালী দেখছে, এ গৌরাঙ্গ কোথায়, এ যে পীত-বসন পরা একটি শ্যামল বালক। আর ঐ যে যমুনা, গিরিগোবর্ধন। আমি দেখেছি, আমি দেখেছি—ভিক্ষুক হুঙ্কার করে উঠল।

'ঘন ঘন হুহুঙ্কার মারে মালসাট।
এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি পাতাইল হাট॥'

রাম-উপাসক মুরারি দেখল দূর্বাদলশ্যামকে। বিশ্বম্ভর কোথায়, মহাধনুর্ধর রঘুনাথ বসে আছেন বীরাসনে। বামে জানকী, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, চারদিকে স্তুতি করছে বানরের দল। আরেকবার তারই ভবনে প্রভুর বরাহ-আবেশ হয়েছিল।

শ্রীবাসের সামনে নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হলেন। একদিন গঙ্গা-তীরে গিয়ে প্রভু দেখলেন একপাল গরু চরছে, কেউ বা শুয়ে আছে, কেউ বা জল খাচ্ছে, কেউ বা হাম্বা-হাম্বা ডাকছে, কেউ বা ধুলো উড়িয়ে ছুটছে উর্ধ্বপুচ্ছ হয়ে। আমিই সেই—আমিই সেই—বলতে-বলতে একছুটে প্রভু শ্রীবাসের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। দেখলেন মন্দিরের দরজা বন্ধ করে নৃসিংহের পূজা করছে শ্রীনিবাস। 'কার পুজো কার ধ্যান করছিস রে শ্রীবাস? ছাখ সে বাইরে দাঁড়িয়ে।' বলে বন্ধ দরজায় প্রভু ঘন-ঘন লাথি মারতে লাগলেন। শ্রীবাসের ধ্যান ছুটে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল মত্ত সিংহাকার নৃসিংহ বামবক্ষে তালি দিয়ে হুঙ্কার করছে। একটা গদা হাতে নিয়ে ধাবিত হলেন, সে ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখে সবাই পালাতে লাগল। পরে গদা ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে বসলেন প্রভু। শ্রীবাসকে বললেন, 'সকলে দেখি আমাকে দেখে ভয় পেয়েছে। এতে যে আমার অপরাধ হল।'

'লোক ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ।'

বলরামরূপে প্রকটিত হলেন। যমুনাকর্ষণ লীলা দেখালেন। সমস্ত গৃহ রজতকান্তিতে ধবলিত হল। পরনে নীলাম্বর, হাতে লাঙল, দাঁড়ালেন যেন রৌপ্যপর্বত।

তারপর ধরলেন শিবরূপ। ভক্তসামীপ্যে হরিগুণ কথা বলছেন, কোত্থেকে এক ভিক্ষুক এসে ডমরু বাজিয়ে শিবমহিমা কীর্তন সুরু করল। প্রভু ছুটে এসে একলাফে তার কাঁধের উপর চড়ে

বসলেন। বললেন, 'আমিই সেই শঙ্কর।' কেউ দেখল, প্রভু বৃষস্কন্ধে আরূঢ়, মাথায় জটা, হাতে শিঙ্গা-ডমরু, পরনে বাঘছাল। শ্রীবাস গিরিশ-স্তোত্র পড়তে লাগল, মুকুন্দ পড়তে লাগল মহিম্ন-স্তোত্র।

তারপর চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হলেন কত বার কত জায়গায়। জগাইয়ের কাছে, তাকে যখন দিলেন প্রেমভক্তি। জগাই, উঠে দেখ আমি কে। জগাই উঠে দেখল চতুর্ভুজে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর দাঁড়িয়ে আছেন।

আরেকবার শ্রীবাসমন্দিরে গরুড়, গরুড় বলে ডাকতে লাগলেন মুরারিকে। মুরারি কাছে আসতেই তার কাঁধে চেপে বসলেন। বললেন, 'তুমি আমার বাহন।' মুরারির দেহে মহাশক্তি গরুড়ের ভাব সঞ্চারিত হল! প্রভুকে কাঁধে নিয়ে সমস্ত অঙ্গনে পাক দিয়ে ছুটতে লাগল মুরারি।

বেদান্তব্যাখ্যায় প্রভুর কাছে পরাস্ত হল সার্বভৌম। পরাভূত হয়েও বুঝি সার্বভৌমের সেই জয়ের আনন্দ। মনে মনে স্থির করলেন ইনি কৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ নন। পুলকাঞ্চিত হয়ে নমস্কার করল প্রভুকে। চোখ চেয়ে দেখল শত-কোটি-ভাস্বৎ দিবাকরের মত চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রভু দীপ্তি পাচ্ছেন।

কাশী মিশ্রও দেখল চতুর্ভুজকে। দক্ষিণ দেশ থেকে ফিরে মন্দির দেখে প্রভু যেই কাশীর গৃহে গিয়েছেন, কাশী তাঁর পায়ে প্রণত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে, সেই সময়। চতুর্ভুজ মূর্তিতে প্রকটিত হয়ে প্রভু তাকে আলিঙ্গনে আত্মসাৎ করে নিলেন।

অষ্টভুজ হল, চতুর্ভুজ হল, এবার ষড়ভুজ।

ব্যাস পূজার দিন পূজা-অন্তে নিত্যানন্দ যখন প্রভুর চাঁচর-চিকুরে মালা পরিয়ে দিল দেখল বিশ্বম্ভর ষড়ভুজ আকার ধরেছেন।

সার্বভৌমের কাছে যখন ভাগবতের 'আত্মারাম'-শ্লোকের অনেকরকম অর্থ করলেন তখন আত্মভাবে ষড়ভুজ অবতার হলেন।

সরস্বতীকান্ত বলে বন্দনা করলেন সার্বভৌম। ঊর্ধ্ব দুই করে ধনু-শর, মধ্য দুই হাতে মুরলী, নিম্ন দুই হাতে দণ্ড-কমণ্ডলু, সার্বভৌম প্রেমবিহ্বল হয়ে পড়লেন।

প্রতাপরুদ্র তিন-তিনবার স্বপ্ন দেখল প্রভুকে। তৃতীয়বার সোজা প্রভুর চরণে এসে উপনীত হল। প্রভুর অমল পাদপদ্ম নিজের বুকে ধরে স্তব করতে লাগল। প্রভু তাকে তাঁর ষড়ভুজরূপ দেখালেন।

গোপীভাবে আবিষ্ট হয়ে অদ্বৈত শ্রীবাসের অঙ্গনে নাচছে আর আর্তি প্রকাশ করছে।

প্রভু গৃহে ছিলেন, শুনতে পেলেন অদ্বৈতের আর্তি। দ্রুত চলে এলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে, অদ্বৈতের হাত ধরে বিষ্ণুমন্দিরে নিয়ে এসে দ্বার রুদ্ধ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কী চাই বলো।' অদ্বৈত বললে, 'তোমাকে ছাড়া আর কী চাইবার আছে? তোমাকেই চাই।' আমি তো এই তোমার কাছেই আছি, বলো আর কী চাই? তখন অদ্বৈত বললে, 'তোমার বৈভব দেখতে চাই।' কোন বৈভব? 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলে, তাই একবার দেখাও আমাকে।' প্রভু অদ্বৈতের বাসনা পূর্ণ করিলেন।

> 'বলিতে, বলিতে অদ্বৈতমাত্র দেখে এক রথ।
> চতুর্দিকে সৈন্য দেখে মহাযুদ্ধ পথ॥
> রথের উপরে দেখে শ্যামলসুন্দর।
> চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর॥
> অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেখে সেই ক্ষণে।
> চন্দ্রসূর্য সিন্ধু গিরি নদী উপবনে॥
> কোটি চক্ষু বাহু মুখ দেখে পুনঃপুন।
> সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জুন॥
> মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
> পোড়ে যত পতঙ্গ পাষণ্ড দুষ্টগণ॥'

এই বিশ্বরূপ নিত্যানন্দও দেখেছিল। প্রভু বললেন, 'তুমি এ আর নতুন কী দেখবে? তুমি তো আমার সমস্ত আখ্যানই জানো। তবু অদ্বৈতের সঙ্গে তুমিও দেখ।'

শুধু কি তাই? রুক্মিণী, লক্ষ্মী ও শেষে সর্বশক্তিমতী ভগবতীরূপে প্রকট হলেন। যখন জগজ্জননী রূপ ধরলেন তখন তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধক্ষরণ হল।

কত তাঁর ভাগবত ঐশ্বর্য।

কেশব ভারতীর কাছে যখন সন্ন্যাস প্রার্থনা করলেন কেশব প্রভুর ভগবত্তা অনুভব করতে পারল। বললে, 'তুমি ঈশ্বর, তুমি সকলের নিয়ন্তা, সকলের অন্তর্যামী। আমারও চিত্তের প্রেরয়িতা তুমি। তাই তুমি যা করাবে আমাকেও তাই করতে হবে, অন্যথা করবার মত আমার সামর্থ্য কই?'

তারপর কী রূপ গৌরাঙ্গের! রুক্মবর্ণ পুরুষ। যেন কাঞ্চন হিমাদ্রি। অনাময় নীরোগ দেহ।

'গোরারূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা নহিল যে কষিলবাণ সোনা॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥
কুঙ্কুম জিনিয়া রূপ অতি মনোহরা।
বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥'

তারপর ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু, অর্থাৎ নিজের হাতের মাপে দৈর্ঘ্য চার হাত। 'তপ্তহেমসম কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।' 'সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন।'

'চতুর্দিকে আপন-বিগ্রহ-ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

উন্নত নাসিকা সিংহগ্রীব মনোহর।
সভা হইতে সুপীন সুদীর্ঘ কলেবর ॥
এতেক লোকের যে হইল সমুচ্চয়।
সরিষা পড়িলেও তল নাহি হয় ॥
তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন।
সভেই দেখেন মুখে প্রভুর বদন ॥'

পরব্রহ্ম বিমৃত্যু, সে অমর, মৃত্যুহীন। ভগবৎ-স্বরূপের অন্তর্ধানের পর তার কিছু দেহাবশেষ থাকে না। যিনি সচ্চিদানন্দ, তাঁর দেহও চেতন আনন্দ। তাই তিনি যখন তিরোহিত হন তাঁর দেহও তিরোহিত হয়।

কী ভাবে ঘটল প্রভুর তিরোধান?

৮১

আষাঢ় মাস। সপ্তমী তিথি। রবিবার। শক চৌদ্দশ পঞ্চান্ন।

বেলা প্রায় তিন প্রহর। নিজ ভবনে প্রভু ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন। বলছেন চিরায়ত বৃন্দাবনী কথা।

কি জানি কী হল বলতে-বলতে প্রভু হঠাৎ নীরব হলেন। ফেললেন বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস।

সহসা উঠে দাঁড়ালেন। ভক্তরাও উঠে দাঁড়াল।

এ কী, প্রভু চললেন কোথায়?

পিছে-পিছে ভক্তরাও চলল। মুকুন্দ গোবিন্দ শ্রীবাস কাশী মিশ্র। আরো কেউ-কেউ।

একেবারে জগন্নাথমন্দিরের সিংহদ্বারে এসে দাঁড়ালেন। কখনো তো ভক্তদের ছেড়ে একা মন্দিরে আসেন না, আজ এ কী ব্যতিক্রম!

একেবারে মন্দিরে ঢুকে পড়লেন। যেন ভালো করে জগন্নাথকে দেখতে পাচ্ছেন না, এগিয়ে গিয়ে একেবারে অভ্যন্তরে, গর্ভগৃহে এসে উপনীত হলেন। আর অমনি নিজের থেকে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

চিরদিন গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়েই দেখেছেন জগন্নাথকে, আজ উতলা হয়ে অতটা এগিয়ে গেলেন কেন? আর এ কী অঘটন, আপনা-আপনি কপাট পড়ে গেল! ভক্তদল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে রইল।

ভিতরে প্রভু কী করছেন তা তাদের কে বলে দেবে?

প্রভু জগন্নাথের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সকাতরে বললেন, 'সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চার যুগ, আর কলির একমাত্র ধর্ম সঙ্কীর্তন। জগন্নাথ, পতিতপাবন, সেই কলিযুগ এসেছে, করুণা করে জীবকে তুমি আশ্রয় দাও!'

তখনো জীবের কথা, জীবনিস্তারের কথা ভাবছেন।

'সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ আর।
বিশেষতঃ কলিযুগে সঙ্কীর্তন সার॥
কৃপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন।
কলিযুগ আইল দেহত শরণ॥'

এই বলে প্রভু জগন্নাথকে দুবাহু মিলে আলিঙ্গন করে ধরলেন! আর নিমেষে লীন হয়ে গেলেন।

যেন নীলাঞ্জন মেঘে সুবর্ণা বিদ্যুৎলেখা মিশে গেল।

'এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত-রায়।
বাহু ভিড়ি আলিঙ্গনে তুলিল হিয়ায়॥
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥'

অভ্যন্তরে একজন পাণ্ডা ছিল, সে স্বচক্ষে এই তিরোধান দেখে হাহাকার করে উঠল।

দরজার ওপার থেকে ভক্তদল আর্তনাদ করে উঠল : 'পরিছা-ঠাকুর, শিগগির দরজা খুলে দাও, প্রভুকে দেখব।'

পাণ্ডা দরজা খুলে দিল। কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'গৌরহরি জগন্নাথের সঙ্গে মিশে গেলেন।'

'মিশে গেলেন? কী বলছ তুমি?' ভক্তদল অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

'হ্যাঁ, স্বচক্ষে দেখলাম।'

'ভক্ত আর্তি দেখি কহে পরিছা তখন।
গুঞ্জাবাড়ির মধ্যে প্রভু হইলা অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিনু গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন॥'

এ কী, প্রভুর দেহাবশেষও অন্তর্হিত।

তাই তো হবে। তিনিই দেহ, দেহই তিনি। যখন তিনি তিরোহিত হলেন দেহও তিরোহিত হল। তার কোনো অবশেষ থাকল না।

তিরোধানের পর শ্রীকৃষ্ণেরও দেহাবশেষ ছিল না।

'কোথায় গেলে? কোথায় গেলে?' আর্তনাদে দীর্ণবিদীর্ণ হতে লাগল ভক্তদল।

কোথায় আবার যাব? বিশাল-উজ্জ্বল নেত্রে জগন্নাথ হাসতে লাগল। উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আবির্ভূত হয়েছিলাম, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর অন্তর্হিত হচ্ছি। গোচর থেকে সরে যাচ্ছি অগোচরে। মূর্ত থেকে বিমূর্তে।

বিষ্ণুর মহাভারতবর্ণিত ক'টি লক্ষণাত্মক নাম শোনো

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

দেখ সব কটি লক্ষণ মহাপ্রভুতে উপস্থিত কিনা।

সুবর্ণবর্ণ। সুবর্ণ অর্থ উত্তম অক্ষর। কৃ আর ষ্ণ-ই হচ্ছে

সর্বোত্তম অক্ষর। সর্বোত্তম নামই কৃষ্ণ। সেই নাম যিনি বর্ণন বা কীর্তন করেন তিনিই সুবর্ণ।

আর আমাদের প্রভু—মহাপ্রভু কী করেন? নিরন্তর কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন।

'কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই তো প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥'

হেমাঙ্গ। সোনার মত পীতবর্ণ। 'প্রত্যক্ষ তাহার তপ্ত কাঞ্চনের দ্যুতি। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি॥' ততি অর্থ রাশি, সমূহ। গৌরহরির অঙ্গকান্তিতে তিমিররাশি, অজ্ঞানরাশি দূরীভূত।

বরাঙ্গ। শ্রীতে আর সামর্থ্যে দীপ্ত-দৃপ্ত দেহ। বলিষ্ঠ সৌষ্ঠবে বরণীয়। এবার গৌরাঙ্গকে দেখ।

'তপ্তহেমসমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর॥'
'আজানুলম্বিত ভুজ—কমললোচন।
তিলফুল জিনি নাসা সুধাংশুবদন॥'
'সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার।'
'অতিশুদ্ধ বিক্রম, তপ্তকাঞ্চনাভাস রসমূর্তিমান।'
'সর্বজীবহিতকৃৎ স্বয়ং ঈশ্বর।'

চন্দনাঙ্গদী। চন্দনের বা চন্দনপঙ্কের অঙ্গদ বা বাহুভূষণধারী। গৌরাঙ্গও চন্দন ধারণ করেন।

'চন্দনের অঙ্গদ বালা চন্দনভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তন॥'

সন্ন্যাসকৃৎ। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনি সন্ন্যাসকৃৎ। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী।

শমঃ। যিনি শান্তি বিধান করেন তিনি শমঃ। নির্বিচারে

সকলকে প্রেম দিয়ে, নাম দিয়ে শান্তি দান করেন গৌরহরি, তাই তিনি শমঃ—শময়িতা।

আর কী? শান্তঃ। যিনি স্থিরবুদ্ধি অচঞ্চলচিত্ত তিনিই শান্ত। যাঁর বুদ্ধি ভগবানে নিষ্ঠিত তিনিও শান্ত। গৌরাঙ্গ শান্তশ্রেষ্ঠ। যেমন স্থৈর্যে তেমনি কৃষ্ণনিষ্ঠায়।

তারপর? নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। নিবৃত্তি আর ভক্তিতে যিনি অধিষ্ঠিত। অবিদ্যার নিবৃত্তি আর ভক্তিতে সমাশ্রয়। পরায়ণ অর্থ পরম অয়ন, পরম ধাম, অভয়নিবাস। ভক্তিই সেই অভয়নিবাস, যেখানে একবার গেলে আর ফেরবার শঙ্কা থাকে না। গৌরহরি সেই নিবৃত্তিতে প্রেরিত, ভক্তিতে আরূঢ়।

অতএব কৃষ্ণও যে গৌরাঙ্গও সেই।

প্রকট লীলায় কৃষ্ণের তিনটি বাসনা অপূর্ণ থেকে গেছে।

প্রথম হচ্ছে, নিজের মাধুর্য নিজের আস্বাদন করবার বাসনা। আমি না জানি কত সুন্দর, কত বিস্ময়কর! আমাকে ভালোবাসায় না জানি কত মাধুরী! কে—কে বলে দেবে?

দ্বিতীয় হচ্ছে, তার মাধুর্য আস্বাদন করে রাধিকার যে সুখ তার স্বরূপ জানার বাসনা।

আর তৃতীয় হচ্ছে রাধিকার প্রেমের মহিমা জানার বাসনা।

সুতরাং রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার না করে আর উপায় কী। অপূর্ণ তিনটি বাসনা পূর্ণ করবার জন্যেই কৃষ্ণ-রাধা একীভূত হয়ে গৌরহরি হওয়া!

'রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
এই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গী করি ধরি তার বর্ণ।
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥'

'আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে।' এই ভক্তভাবেই গৌরহরির অবতরণ। 'ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।'

'আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সভায়।' 'যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সংকীর্তন।' কলির যুগধর্মই নামসংকীর্তন। আর এই নাম থেকেই প্রেমের উৎপত্তি, প্রেমের উত্থান। 'নিরপরাধ নাম হৈতে পায় প্রেম-ধন।' যে ব্রহ্মজ্ঞানী তাকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে আত্মবশ করে দেয়। 'না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।' নামের প্রতি পদে প্রতি অক্ষরে পূর্ণামৃতের আস্বাদন। 'নামের অক্ষর সভের এই ত' স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব ॥'

ধন পেলে যেমন ধনী আনন্দ পেলে তেমনি আনন্দী। আনন্দ কী? ভূমাই আনন্দ। ভূমা কী? যা অসীম তাই ভূমা। সংসারে অসীম কে? রসস্বরূপ পরব্রহ্মই অসীম। সুতরাং রসস্বরূপকে পাওয়াই আনন্দকে পাওয়া। তাকে ছাড়া সমস্ত কিছুই অল্প। স্বর্গও অল্প মর্ত্যও অল্প। দেহসুখ তো আরো অল্প।

সেই আনন্দকে পাবার উপায় কী? উপায় নামসংকীর্তন। নামই নামী। নামেই মায়ার নিবৃত্তি। দুঃখের নিবৃত্তি। অল্পের নিবৃত্তি। নামেই প্রেমলাভ। নামেই কৃষ্ণাকর্ষণ। নামই তারক আর পারক একসঙ্গে। তারক মুক্তিপ্রদ আর পারক প্রেমভক্তিপ্রদ। কলির জীবদৃষ্টি নষ্ট। নামই তার এই দৃষ্টিদোষ দূর করতে পারে। সরিয়ে নিতে পারে মায়ামোহের আচ্ছাদন। দেখা করিয়ে দিতে পারে সেই স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে।

'সঙ্কীর্তনযজ্ঞে করে কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নামসঙ্কীর্তন হৈতে সর্বার্থনাশ।
সর্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস ॥
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি-সাধন-উদ্‌গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম্ প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন ॥'

তাই বলি, লক্ষেশ্বর হও। ব্রাহ্মণেরা নিমন্ত্রণ করতে এলে প্রভু বললেন, 'আগে লক্ষেশ্বর হও, পরে আমাকে ডেকো। লক্ষেশ্বরের বাড়ি ছাড়া অন্য বাড়িতে আমি ভিক্ষা নিই না।'

ব্রাহ্মণেরা কেঁদে পড়ল। 'আমরা গরিব মানুষ, লক্ষ দূরস্থান, সহস্রও আমাদের ঘরে নেই। যদি আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করো তা হলে আমাদের গার্হস্থ্য পুড়ে ছারখার হোক।'

প্রভু বললেন, 'লক্ষেশ্বর অর্থ কি লাখটাকার মালিক? লক্ষেশ্বর অর্থ হচ্ছে যে প্রতিদিন লক্ষবার নাম নেয়।'

ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে স্বীকার হল। বললে, 'তাই হবে। প্রতিদিন আমরা প্রত্যেকে লক্ষ নাম জপ করব, তারপর তুমি একদিন এস।'

শচী দেবী আগেই অন্তর্ধান করেছেন, তখন থেকেই তো বিষ্ণুপ্রিয়া একাকিনী।

'বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা শচীদেবীর অন্তর্ধানে।
ভক্তদ্বারে দ্বাররুদ্ধ কৈলা স্বেচ্ছাক্রমে॥
তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শনে।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণে॥
প্রত্যূষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নামমাত্র এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রে রাখয়।
হেনমতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যার তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বাঁধিয়া॥
অলবণ অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদমাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥

অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥'

এবার প্রভুর তিরোধানে বিষ্ণুপ্রিয়ার সাধনা কঠোরতর হল। জীবনধারণের ক্লেশ নিষ্ঠুরতর। তবু ভজনপূজনের মহিমা দীপ্ত হতে দীপ্ততর চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সেই আনন্দে কোনো ক্লেশকেই কৃচ্ছ্র বলে স্বীকার করেন না। কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময়ী সেবা কাকে বলে তারই প্রতিষ্ঠা করেছেন। রূপ আর সনাতন ভক্তিগ্রন্থ প্রচার করুন, নিত্যানন্দ দেশে-দেশে ঘরে-ঘরে নামগান করে বেড়ান, ঘরে বসে নামসাধন কাকে বলে তারই দৃষ্টান্ত বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাসস্থলী নবদ্বীপের গম্ভীরা। কে বলবে হয়তো গম্ভীরতরা।

'অন্তঃপুরে ঠাকুরাণী প্রাতঃস্নান করি।
শালগ্রামে সমর্পিয়া তুলসী মঞ্জুরী॥
পিড়াতে বসিয়া করে হরেকৃষ্ণ নাম।
আতপতণ্ডুল কিছু রাখে নিজস্থান॥
ষোল নাম পূর্ণ হৈলে একটি তণ্ডুল।
রাখে সরাতে অতি হইয়া ব্যাকুল॥
এইরূপে তৃতীয় প্রহর নাম লয়।
তাহাতে তণ্ডুল সব সরাতে দেখয়॥
তাহা পাক করি শালগ্রামে সমর্পিয়া।
ভোজন করেন কত নির্বেদ করিয়া॥
সেবক লাগিয়া কিছু রাখে পাত্রশেষ।
ভক্ত সব আইসে তবে পাইয়া আদেশ॥
বাড়ীর বাহিরে চারিদিকে ছানি করি।
ভক্ত সব রহিয়াছে প্রাণে মাত্র ধরি॥
কোন ভক্ত গ্রামে কেহ আছে আশপাশ।
একত্র হইয়া অভ্যন্তরে যান সব দাস॥

তাবৎ না করে কেহ জলপান মাত্র।
অনন্যশরণ যাতে অতি কৃপাপাত্র ॥'

কোথায় তিরোধান! বিশ্বম্ভরের দারুবিগ্রহ স্থাপন করলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। 'প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি। নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥'

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে ॥'

আর নরোত্তম ঠাকুর বলছেন :

'গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুই যাউ বলিহারী।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তার স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডলভূমি যে বা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥'

এই লীলাম্বুনিধির পার পাবে কে? কেই বা এর তল খুঁজবে? শুধু নখে করে এককণা জল একটু স্পর্শ করা।

'মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা পারে সম্যক বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি, তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥'

একমাত্র ভেলা হচ্ছে নামাশ্রয়। স্থির দুর্গও নামাশ্রয়। নামাশ্রয়

থেকে বিচ্যুত করাই কলির ঘোরতম প্রতারণা। নামই আশ্রিতকে রক্ষা করে, প্রতিপালন করে। সমস্ত কলিবাধা নামই হরণ করবে। কলিতে নামই অনন্যগতি। নামেই সংসারক্ষয়।

স্থিতি সেবা গতি যাত্রা স্মৃতি চিন্তা স্তুতি বাক্য সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে সমর্পিত হোক।

'সর্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদ।'

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নি গৌরত্বিষে নমঃ ॥

৮২

কিন্তু কোথায় যাবেন? কোথায় লুকোবেন?

যে মুহূর্তে ভক্তিভরে নামকীর্তন করে উঠব, তিনি এসে উদয় হবেন। নারদের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যেখানে তাঁর ভক্তেরা নামগান করবেন তিনি এসে উপস্থিত হবেন সেখানে। 'মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।'

যাবেন কোথায়? যাবেন বা কতদূর?

অন্তরে ভালোবাসা আর মুখে প্রিয়নাম, সাধ্য কী কাছে না আসেন! সাধ্য কী দেখা না দেন! সাধ্য কী বধির হয়ে থাকেন! নিশ্চল হয়ে থাকেন! বিমুখ হয়ে থাকেন! যেখানে কাম নেই শুধু নাম, আশা নেই শুধু ভালোবাসা, সেখানে তিনি ধরা না দিয়ে আর কী করতে পারেন?

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

তিনিই হরি। তিনিই কৃষ্ণ। তিনিই রাম।

আরো কত রূপ কত গুণ কত লক্ষণ কত পরিচয়। শুধু আন্তরিকতায় উচ্চনাদ হও, আর নামের মূলে অনুরাগের সুরটুকু রাখো।

তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। দীননাথৈকশরণ, ভক্তানুগ্রহকারক। সর্বদুঃখাপহ সর্বাভীষ্টপ্রদ। মনোমলবিনাশন, দারিদ্র্য-উপদ্রবভঞ্জন।

কৃষ্ণকে দেখ। কোটি কন্দর্পমোহন, বেণুবাদ্যবিনোদী। সুরম্যাঙ্গ, সর্বসৎলক্ষণান্বিত। বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত। করুণ, বদান্য, প্রতাপী, ক্ষমাশীল। ভক্তসুহৃৎ, প্রেমবশ্য, সর্বশুভঙ্কর, শরণাগত-পালক। অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, প্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডল। ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিত। সর্বাদ্ভুত-চমৎকার লীলাকল্লোলবারিধি।

এক কথায় অতুলমধুর।

আর এত যিনি তেজীয়ান গরীয়ান বলীয়ান বরীয়ান একটি ডাক-নাম ধরে ডাক দিলেই অস্থির। একেবারে দুয়ারে এসে উপস্থিত। একেবারে হৃদয়ে এসে উপস্থিত।

এমন সহজ উপায়ের এমন পরম সম্পদ কে ছাড়ে? কার বোকা বলতে সাধ যাবে? ভবের হাটে বাজার করতে এসে কে ঠকতে চাইবে? কে সবচেয়ে খাঁটি মজবুত জিনিসটা কিনে নেবে না? ছেড়ে দেবে? জীবনে সেই খাঁটি মজবুত জিনিসটাই কৃষ্ণ। আর একে কিনতে দাম লাগে না। বিনা দামে পাওয়া যায়। স্বভাবের ধনই তো ভালোবাসা। এ তো অর্জন করতে হয় না। সেই স্বভাবের ধনটুকু কৃষ্ণকে দিয়ে দিলেই কৃষ্ণ আমাদের স্বভাব হয়ে উঠবে।

তাই শুধু নামগ্রাহী নয়, নামাশ্রয়ী হতে হবে।

সেই নাম-ভক্তি দিতেই চৈতন্য আর নিত্যানন্দ একসঙ্গে উদিত হয়েছেন। মঙ্গলপ্রদ, তিমিরহরণ, সর্বতঃসুন্দর—দিবাকর আর নিশাকর একসঙ্গে। স্বরূপতঃ এক—'দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।' অভিন্নকলেবর। 'একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়।'

চৈতন্যের মধ্যেই শাশ্বত আনন্দ, নিত্য আনন্দ। তাই চৈতন্যই নিত্যানন্দ। তাই যখন চৈতন্য বলছ সঙ্গে-সঙ্গে নিত্যানন্দও বলা হচ্ছে। যখনই ভক্তি ভাবছ তখনই নাম আসছে। আবার যখনই নাম করছ তখনই ভক্তি এসে যাচ্ছে। 'একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান। অর্ধকুক্কুটী-ন্যায় তোমার প্রমাণ॥' কুক্কুটীকে অর্ধেক করে কাটলে আর ডিম পাওয়া যায় না।

ভক্তিই তো ভয় থেকে ত্রাণ করে। কিসে আমাদের ভয়? ভগবান ছাড়া অন্য দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশই ভয়। ভগবানই প্রথম বস্তু। আর-সব দ্বিতীয় বস্তু। ভগবানই মুখ্য আর সব অবান্তর। 'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ।' সেই প্রথমে একান্তানুরক্তিই ভক্তি। ভক্তিপথের গতিই তাই প্রকৃষ্টা গতি—প্রগতি। 'ভক্তি-যোগস্য মদ্‌গতিঃ।' গতি তো স্থিতিরই জন্যে। ভক্তিপথের স্থিতি তাই পরম-অচ্যুত-ধামে।

'মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস॥'

দেবহূতিকে বলছেন কপিলদেব, 'মা, আমার ভক্তরা মুক্তি দিলেও নেয় না।' 'দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি।' সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্য—এই পাঁচ মুক্তির কোনো মুক্তিই তাদের স্পৃহনীয় নয়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য একমাত্র কৃত্য হরিসেবন। তারা সেবাতেই পূর্ণ-মনোরথ। যখন মুক্তিই তাদের কাম্য নয় তখন কালবিপ্লুত অন্য ভুক্তিতে আকৃষ্ট হবে কী করে? যা কালপ্রভাবে বিনষ্ট হবে তাই কালবিপ্লুত। আর ভুক্তি তো ভোগ—স্বর্গভোগও বিনাশশীল। স্বসুখ-বাসনাহীন শুদ্ধ ভক্ত স্বর্গভোগেও পরাঙ্মুখ। 'ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভয়।'

শুদ্ধ ভক্ত কী করছে? নিরন্তর বাক্য দ্বারা স্তব করছে, মন দ্বারা স্মরণ করছে, শরীর দ্বারা প্রণাম করছে। এততেও তৃপ্ত হতে পারছে না। তারপরে নয়নজলে অভিষিক্ত হয়ে সমস্ত আয়ু হরিসেবাতেই সমর্পণ করছে।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, কমলবিশদনেত্র, কবে আমি যমুনাতীরে সজল-নয়নে তোমার নামাবলী কীর্তন করতে-করতে তাণ্ডব রচনা করব ?

যদি একবার কৃষ্ণকৃপার গন্ধ এসে গায়ে লাগে তখন ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি সুখ দূরে পালায়। আনন্দময়ের অভ্যাসই যে সকলকে আনন্দিত করে। 'ভক্তগণ সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।' সে সুখই বিশুদ্ধাব্ধি, জড়জগতের প্রাকৃত সুখ নয়, তার কাছে ব্রহ্মানন্দও 'গোষ্পদায়ন্তে', গোষ্পদের মত মনে হয়। একমাত্র কৃষ্ণেই সর্বাতিশায়ী মাধুর্য। এই মাধুর্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় প্রেম। স্বসুখবাসনা-শূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যময় প্রেম। সেই প্রেমই জীবের মহাধন। 'প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্যরস করায় আস্বাদন।'

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন তখন চারদিকে কেবল পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চা ; না ভক্তি, না বা ভগবদ্‌ভজন। বিষয়ীর বিষয়বর্ধনই তখন একমাত্র পুরুষার্থ। আর ধর্মকর্ম বলতে বিষহরির পুজো আর মঙ্গলচণ্ডীর গান। 'কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয় ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ ॥'

দেশের দুর্দিনে অদ্বৈতের প্রাণ কেঁদে উঠল। এ জড়তার নিরাকরণ হবে কিসে ? কোনো মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, তবে যদি স্বধাম থেকে শ্রীকৃষ্ণ নেমে আসেন, যদি নিজে এই ভবরোগের চিকিৎসা করেন। তা হলেই যদি জীব রক্ষা পায়, নয়তো সমস্ত ছারখার। 'আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার। আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার ॥' কিন্তু কী করে তাঁকে ডেকে আনি ? শুধু নিরন্তর ক্রন্দনে, নিরন্তর নিবেদনে, হুঙ্কারে গর্জনে নৃত্যে কীর্তনে আত্মসমর্পণে। 'শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥ আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্তন সঞ্চার। তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার ॥'

গৌরাঙ্গ শচীর ঘরে জন্ম নিলেন।

'শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।

মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি ॥
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লোলে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলিমাখা সর্ব গায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি ॥
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি ॥'

ঐশ্বর্যবেশে এলেন না, এলেন মাধুর্যবেশে। দণ্ডধর মূর্তিতে এলেন না, এলেন ক্ষমাসুন্দর মূর্তিতে। আগে লোকে ভাবত ঐশ্বর্যই বুঝি ভগবত্তার সার, গৌরহরিই প্রথম দেখালেন, মাধুর্যই ভগবত্তার সার।

মাধুর্যে ঈশ্বর মানুষ। ঐশ্বর্যে ঈশ্বর ভগবান। মহৈশ্বর্য প্রকাশ হোক বা না হোক, যে অবস্থায় ঈশ্বরের নরলীলার বা মনুষ্যভাবের ব্যতিক্রম না ঘটে তাই-ই মধুর। পুতনানিধন সময়ে মহৈশ্বর্য প্রকাশ করলেও কৃষ্ণের তখন নরশিশুর ভাব—অতএব তা মাধুর্য। যশোদা রজ্জুকে দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করেও কৃষ্ণকে বাঁধতে পারছেন না, সেখানেও কৃষ্ণের নরশিশুর ভাব—সেটাও মাধুর্য। আবার যখন কৃষ্ণ দুধ-সর চুরি করছে তখন কোনো ঐশ্বর্যের প্রকাশ না থাকা সত্ত্বেও সে মধুর। এসব ক্ষেত্রে কোথাও তার মনুষ্যোচিত ভাবের ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কিন্তু যেখানে নরলীলার অপেক্ষা না করেই ঈশ্বরত্বের প্রকাশ তাই-ই ঐশ্বর্য। জন্মগ্রহণ করেই কংসকারাগারে চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হলেন কিংবা অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন দুটোই ঐশ্বর্যভূমিতে।

ঐশ্বর্যে প্রেম কই? ঐশ্বর্যে ভয়, সম্ভ্রম, সঙ্কোচ, দূরস্থিতি। তখন কোথায় স্বজাতীয়ভাব, কোথায় আত্মীয়তা? সাধ্য কি ঐশ্বর্যবানকে

প্রাণসম মনে করি, সমীপবর্তী হই? কিন্তু তুমি মধুর হও, আপনা থেকেই তোমার প্রতি আমার মমতা প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। আপনা থেকেই তোমার কাছে আমি ছুটে যাব, সন্নিহিত, আলিঙ্গনে আবদ্ধ হব। সেখানে তখন না কুণ্ঠা না বা কার্পণ্য, না ভীতি না বা ব্যবধান। তখন যে ভগবান সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নন, তখন তিনি ভক্তিবশ পুরুষ, মধুরের সওদাগর। মাধুর্যপ্রেমের এমনি প্রভাব ভগবানকে ঐশ্বর্য প্রকাশের অবকাশ দেয় না। আর যদি কখনো ভগবান ঐশ্বর্য প্রকাশ করেও বসেন ভক্ত বিচলিত হয় না, তখনো ঈশ্বরবুদ্ধি করে না, আপনার লোক বলেই মনে করে। 'কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য না জানে। ঐশ্বর্য দেখিলেও নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥'

'এই শুদ্ধ ভক্ত লঞা করিব অবতার।
করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে-যে লীলার প্রচার।
সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥'

কৃষ্ণের মাধুর্যপ্রচারই গৌরহরির প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভগবৎ-মাধুর্যের মানুষরূপ বা নরভাবটিই মূর্তিমান গৌরহরি।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ॥'

কৃষ্ণের কিশোরেই নিত্যস্থিতি। 'স্বয়ংরূপ এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি।' দ্বারকা-মথুরায় ঐশ্বর্য, ব্রজে অবিচ্ছিন্ন মাধুর্য। ব্রজেই ব্রহ্মরসত্বের চরমতম বিকাশ। ব্রজে নন্দ-অলিন্দে পরব্রহ্ম বালগোপাল হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে।

'অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।'

আর এই কৃষ্ণমাধুর্যের পূর্ণ আস্বাদ একমাত্র ব্রজপ্রেমে, যে প্রেম নির্মল, নিরলস, ত্রিভুবনপাবন।

'ঈশ্বরঃ পরমঃকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম।' কৃষ্ণ পরব্রহ্ম, সর্বগ, অনন্ত, বিভু, সর্ববীজ, সর্বেশ্বর, লীলাপুরুষোত্তম, কিন্তু তার আসল গুণ কী ? কৃষ্ণ করুণাময়।

এই করুণাতেই তো গৌরহরির মর্তাবতরণ। জীবের পতিতাবস্থাই তো সেই করুণাকে আকর্ষণ করেছে।

নরোত্তম বলছে :

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া করো মোরে।
তুমি বিনা কে দয়ালু জগত-সংসারে॥
পতিতপাবনহেতু তব অবতার।
মো হেন পতিত প্রভু না পাইবে আর॥'

হরি নিরন্তর প্রসাদাভিমুখ, করুণায় সর্বত-উৎসুক। হরি প্রসন্ন-বদনেক্ষণ, তার আনন-নয়ন সর্বদা প্রসন্ন। স্থিরযৌবনসম্পন্ন, রমণীয়াঙ্গ। প্রণতাশ্রয়ণ, প্রণতজনের আশ্রয়দাতা। হরি করুণার্ণব, দয়ার অম্বুনিধি। হরি শরণাগতপালক। নবীননীরদশ্যাম। দর্শনীয়তম, অর্থাৎ পৃথিবীতে যা-কিছু দর্শনযোগ্য আছে তার মধ্যে হরি শ্রেষ্ঠ। তিনি মনোনয়নবর্ধন, মন ও নয়নের প্রীতিবর্ধক। তাঁর উজ্জ্বল চরণ-যুগল ভক্তহৃদয়ে স্থাপন করেছেন, তিনি সর্বান্তর্যামী।

'স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকম।
নিয়তে নৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম॥'

হরি বরদশ্রেষ্ঠ। তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন ও অনুরাগভরে তাকিয়ে আছেন এই কল্পনায় একভূত বা একাগ্র হয়ে ধ্যান করবে।

এই ধ্যানের মন্ত্র কী ?

মন্ত্র—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নারদ এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ধ্রুবের কানে দিয়ে দিল।

ওঁ উচ্চারণ মাত্র মোহনিদ্রা দূরে পালিয়ে যায়। আমি সেই নিদ্রায় আচ্ছন্ন, হে মধুসূদন, আমাকে ত্রাণ করো। ন গতির্বিদ্যতে নাথ, ত্বমেব শরণং মম। তুমি ছাড়া গতি নেই, তুমিই অনন্যশরণ।

আমি পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা করো। আমি অজ্ঞানমুগ্ধ, পুত্রদারগৃহে আসক্ত, নিরন্তর তৃষ্ণাপীড়িত, হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা করো। আমি ভক্তিহীন নাথহীন, দুঃখশোকদীর্ণ নিরাশ্রয়, হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা করো। সংসারের দীর্ঘপথে গতাগতিচক্রে আমি পরিশ্রান্ত, পুনর্জন্মপরাঙ্মুখ, হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা করো। হে দুরিতঘ্ন, দুঃখসাগরে নিমগ্ন আমি ত্রাণপ্রার্থী, গর্ভবাসের মহাদুঃখ থেকে হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা করো। বাক্যে যা প্রতিজ্ঞা করেছি কর্মে তা উদযাপন করিনি, দুষ্কৃতই শুধু করেছি সুকৃত আচরণ এক বিন্দুও করিনি, তাই তো পাপসমুদ্রে ডুবেছি, হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা করো। বদ্ধ উন্মাদের মত অসংবদ্ধ প্রলাপ বকেছি, আমি জরামরণভীত, হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা করো। যেখানেই জন্মলাভ করি না কেন, স্ত্রীই হই আর পুরুষই হই, হে মধুসূদন, আমাকে দৃঢ়াচলা ভক্তি দিয়ে রক্ষা করো।

'জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে-দেশে
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে ॥'

'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বরস্বভাব।' 'লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।' 'লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।' 'জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই।' 'জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান।'

'অবতরি কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্তন।'

উদ্ধারের উপায়ই ভক্তি। 'ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য।' প্রত্যক্ষ উপদেশটা কী? কৃষ্ণদাস হও। 'কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে।' 'কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু। কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু।'

আর অদ্বৈত আচার্য কী বলছেন? বলছেন, চৈতন্যদাস হও। কৃষ্ণ আর চৈতন্য একই অভিন্নতত্ত্ব, সুতরাং যে কৃষ্ণের দাস সেই চৈতন্যের দাস, যে চৈতন্যের দাস সেই কৃষ্ণের দাস। আর সমস্ত

আনন্দের চেয়ে কৃষ্ণদাস-অভিমানের আনন্দ বেশি, তাই আমি আর নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস হয়েছি।

'অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।'

সুখবাসনাশূন্য একান্ত ভক্ত, সর্বকামপ্রেরিত কর্মী বা মোক্ষলিপ্সু জ্ঞানী—যেই হোক, সে যদি উদারবুদ্ধি হয়, সে তীব্রভক্তিতে পরমপুরুষ ভগবানকে ভজনা করবেই। উদারতম বুদ্ধিটি কী? ভাগবতী শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হলেই ভক্তিতে প্রবেশ।

'শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।' শ্রদ্ধা অর্থই বিশ্বাস। 'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।' 'শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে। প্রেমভক্তি পায় সে-ই চৈতন্য চরণে।' 'শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে। গৌরলীলা-ভক্তি-ভক্ত রসতত্ত্ব জানে।' 'শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ। ইহার প্রসাদে পাবে চৈতন্যচরণ॥' 'আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান। শ্রদ্ধা করি শুন ইহা সত্য করি মান॥' 'শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শুনে যেই জন। শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন॥'

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

ততক্ষণই কর্ম করো যতক্ষণ না কৃষ্ণকথা শুনতে শ্রদ্ধা জাগে বা ভোগেচ্ছার বিরতি বা নির্বেদ উপস্থিত হয়।

আর 'কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার।' প্রেমের বন্যায় অস্পৃশ্যতা দূর করে দিলেন গৌরহরি। নিয়ে এলেন প্রত্যক্ষ সাম্যবাদ। ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এক হয়ে গেল। 'ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকোলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ।' সাধন-ব্যাপারে কত সামাজিক ও লৌকিক বাধা-নিষেধ ছিল, সব প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল। সমান প্রেমে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হল সকলে। 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং

বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রো[illegible]
পূর্ণামৃতেব্ধের্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসানুদাসঃ।' আমি কি[illegible]
কেউ নই, আর কোনো আমার পরিচয় নেই, আমি শুধু নিখিলানন্দ
ভগবানের পদপঙ্কজের ভৃত্য।

কৃষ্ণদাস আর কারু ভৃত্য হয় না। একমাত্র কৃষ্ণদাসই প্রকৃত স্বাধীন, প্রকৃত অঋণী।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম॥

যে সমস্ত কৃত্য পরিহার করে শরণাগতপালক মুকুন্দে সর্বতোভাবে শরণ নিয়েছে সে দেবতা ঋষি প্রাণী কুটুম্ব মানুষ ও পিতৃগণের ঋণীও নয় কিঙ্করও নয়।

স্বপাদমূলং ভজতঃপ্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ॥

বিহিতকর্মনিবৃত্ত অন্যভাবরহিত প্রিয় ভক্ত যদি প্রমাদবশে কখনো নিষিদ্ধ কর্মে পতিত হয়, পরেশ হরি তার হৃদয়ে প্রবেশ করে তার সমুদয় পাপ নাশ করেন।

নারদ কী বলছেন তাঁর ভক্তিসূত্রে? 'ওঁ নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যা-রূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ।' ভক্তের পক্ষে জাতি কুল বিদ্যা কর্ম রূপ ধন কিছুরই বিচার নেই, অপেক্ষা নেই। সে তো নিজে রক্ষা পায়ই, অন্যকেও উদ্ধার করে। ওঁ স তরতি স তরতি স লোকান্তরয়তীতি। তখন তার সৌভাগ্যে পিতৃগণ আনন্দিত, দেবগণ নৃত্যপর আর বসুন্ধরা সনাথা। 'ওঁ মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।'

'যখন দেখিনু গোরাচাঁদে।
তখনই পড়িনু প্রেমফাঁদে।
তনুমন তাঁহারে সঁপিনু।
কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিনু॥
গোরাবিনু না রহে জীবন।
গৌরাঙ্গ হইল প্রেমধন॥
ধৈরজ না বাঁধে মোর মনে।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥'

৮৩

'সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈল অঙ্গীকার।' পার্থিব আকর্ষণের সমস্ত বস্তু ত্যাগ করতে হবে, তবেই জগজ্জনে আমাকে মানবে, আমার প্রেমনামজালে বাঁধা পড়বে। লোকনিস্তারের জন্যেই আমার এই সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাস একহিসেবে চাতুরীমাত্র। 'সভা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার। সভা নিস্তারিতে করেন চাতুরী অপার।'

কী ছাড়ছেন? ছাড়ছেন বৃদ্ধা জননীকে, যিনি পর-পর আটটি সন্তান হারিয়ে পেয়েছিলেন নিমাইকে, যাঁর বড় ছেলে বিশ্বরূপ ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছে সন্ন্যাসী হয়ে, যিনি পতিশোকে ম্রিয়মাণা। ছাড়ছেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে, যৌবন-লাবণ্যের মাধবীমদিরা, সরলা শীতল-স্বভাবা নম্রনির্ভরা বধূকে। ছাড়ছেন ধনজন সংসার নামযশ প্রতাপ-প্রতিষ্ঠা। পণ্ডিত সমাজের শিরোরত্ন, সমস্ত শাস্ত্রে-জ্ঞানে পারঙ্গত, তর্কে-বিচারে অপরাজেয়—তিনি কিনা হরিনাম সম্বল করে দীনহীন কাঙালের বশে পথে বেরিয়ে পড়লেন। বুকফাটা কান্নাতেও বিচলিত

হলেন না, কোনো মর্ত স্বার্থের বিচারই তাঁকে পারল না বিচ্যুত করতে। এই আত্মত্যাগ দেখে কে না সশ্রদ্ধ হবে, কে না বিনত হবে, কে না প্রেমার্দ্র হবে ?

কিন্তু কেন এই সন্ন্যাস ? শ্রান্ত ভ্রষ্ট দগ্ধ ক্লিন্ন জীবকে পরমরসায়ন পরিবেশন করবার জন্যে।

প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তা পরমানন্দ গুপ্ত বলছেন :

'কি করিলে গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সভার বিদরয় বুক॥
না জীব মুরারি মুকুন্দ শ্রীনিবাস।
আচার্য অদ্বৈত ভেল জীবনে নৈরাশ॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া।
ছটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
এবার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি॥'

বংশীবদন দাস বলছেন :

'আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা-তিলকা-কাচ।
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন-খঞ্জন-নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত-চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়্যা॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঁই।

নিমাই করিয়া ফুকারি সদাই
নিমাই কোথায় নাই ॥
নির্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ ।
গৌরাঙ্গসুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া-মাঝ ॥

আর মুরারি গুপ্তই তো 'প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।' কী বলছেন মুরারি? বলছেন, 'যিনি সাধারণ দৃষ্টিতে গৌরকান্তি হয়েও ভক্তের দৃষ্টিতে শ্যামসুন্দররূপে বিভাত, অদ্বৈত নিত্যানন্দ যাঁর অঙ্গ, শ্রীবাসাদি যাঁর উপাঙ্গ আর গদাধর গোবিন্দ প্রভৃতি যাঁর পার্ষদ, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্থিরবুদ্ধি সাধুকুল সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করে থাকেন।'

চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে মহাপ্রভুকে প্রণাম করেছেন মুরারি। আর বলছেন, 'হে চৈতন্যচন্দ্র, তোমার পাদপদ্ম দর্শন করেও যারা তোমাতে পরেশ-বুদ্ধি, ঈশ্বরবুদ্ধি না করে তারা আর কিছু নয়, তোমার বিস্তৃত বৈভবমায়াতেই মোহিত।'

মুরারি আবার পদরচনা করছেন :

'সখিহে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ান পুতুল করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোরে
না করিয়া শ্রবণ গোচরে।

স্রোত বিথার জলে এ তনুটি ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পীরিতি এমতি হয়
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥'

আগের পদ বিষ্ণুপ্রিয়ার হয়ে বলেছেন, এবার বলছেন শচীমাতার হয়ে :

'ধর ধর ধররে নিতাই আমার গৌরে ধর।
আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর ॥
আচার্য গোঁসাই দেখিও নিমাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্তনে
পরাণে হইব হারা ॥
শুনহ শ্রীবাস কৈরাছে সন্ন্যাস
ভূমিতলে পড়ি যায়।
সোনার বরণ ননীর পুতলি
ব্যথা না লাগয়ে গায় ॥
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্তন
হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি
দেখহ মায়ের দশা ॥'

আবার বাসুদেব ঘোষ বলছেন :

'তখন নাপিত আসি প্রভুর বামেতে বসি
খুর দিল ও চাঁচর কেশে।

করি নানা উচ্চরব কান্দয়ে ভকত সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে ॥
মুণ্ডন করিতে কেশ হঞা অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে খুর মোর নাহি চলে
প্রাণ ফাটে বিদরিয়া যায় ॥'

বাসুদেব গোবিন্দ আর মাধব তিন ভাই। 'গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব ঘোষ। তিন ভাই কীর্তনে করে প্রভুর সন্তোষ ॥'

মহাপ্রভু কেন সন্ন্যাস নিলেন তার কারণ বলছেন গোবিন্দ ঘোষ :

'দেখিয়া জীবের দুখ ছাড়িনু গোলকের সুখ
লভিলাম মনুষ্য জনম।
পাইলাম কষ্ট যত তোমরা পাইলা তত
হইল সব পণ্ড পরিশ্রম ॥
পণ্ডিত পড়ুয়া যারা আমারে না মানে তারা
মোর উপদেশ নাহি লয়।
ভাবি হই বুদ্ধিহারা কিরূপে তরিবে তারা
দূর হবে নরকের ভয় ॥
অনেক চিন্তার পর দঢ়ায়িনু এ অন্তর
আমি ত্বরা ছাড়ি গৃহবাস।
মস্তক মুণ্ডন করি এ ডোর কৌপীন পরি
অবিলম্বে লইব সন্ন্যাস ॥
তবে ত পাষণ্ডী সব শুনি হরি হরি রব
নামে প্রেমে হইবে পাগল।
সবে যাবে নিত্যধাম পূর্ণ হবে মনস্কাম
অবতার হইবে সফল ॥'

আবার পরক্ষণেই বলছেন নিজের কথা, নদীয়াবাসীদের কথা :

'হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও ॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজকোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতুলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্তনবিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মরিয়া ॥'

আর, তৃতীয় ভাই মাধব ঘোষ বলছেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পাষাণগলানো দুঃখের কথা :

'অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মূরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ ঘিরি করে রোদন
তুল ধরি নাসার উপরে ॥
তুয়া বিরহানলে অন্তর জরজর
দেহ ছাড়া হইল পরাণী।
নদীয়ানিবাসী যত তারা ভেল মূরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা দেহ তার প্রাণ ছাড়া
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গীগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলে তার মায়া ॥
যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস বহে দরশন আশে।

এবে হে রসিকবর   চলহে নদীয়াপুর

কহে দীন এ মাধব ঘোষে ॥'

আবার বিরহকাতরতার ছবি আঁকছেন :

'গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।

প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

তোমার পূরব যত চরিত পীরিত।

সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূরছিত ॥

হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।

ধূলায় পড়িয়া কাঁদে তোমা না দেখিয়া ॥

কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।

তিলেক বিলম্ব আমি আগে যাই মরি ॥'

গোবিন্দ মাধব আর বাসুদেব তিনভাই-ই কবি আর কীর্তনকুশল। একই সঙ্গে এমন তিন কবি আর কোন কুলে এসেছে!

তেমনি আবার তিন পুরুষে ভক্ত দেখ। পিতামহ সদাশিব কবিরাজ, পুত্র পুরুষোত্তমদাস আর পৌত্র কানু ঠাকুর।

গৌরহরিকে সন্ন্যাস তো নিতেই হবে। উপপুরাণে ব্যাসকে তো তাই বলছেন শ্রীকৃষ্ণ। বলছেন :

'অহমেব ক্বচিদ্‌ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান ॥'

হে ব্রহ্মণ বেদব্যাস, কোনো কলিযুগে আমি স্বয়ং সন্ন্যাস-আশ্রম নিয়ে পাপহত মানুষকে হরিভক্তি নেওয়াই।

আবার বলছেন মহাভারতে, অনুশাসন পর্বে, আমি হেমাঙ্গ, আমি সুবর্ণবর্ণ, আমি সন্ন্যাসকৃৎ। হেমাঙ্গ অর্থ আমি গৌরোজ্জ্বল, আমি যে ভক্তভাবময়ী রাধিকার সঙ্গে মিলিত। আমি সুবর্ণবর্ণ, যেহেতু 'কৃষ্ণ' এই উত্তম বর্ণই আমি বর্ণনা করি। আর আমি রাধিকাকে অঙ্গীভূত করে অখণ্ড প্রেমভাণ্ডারের অধিকারী হওয়ার দরুন জগতে নির্বিশেষে প্রেম বিতরণ করবার জন্যেই সন্ন্যাসী হয়েছি।

কবি রামানন্দ বসু বলছেন :

'দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা।

লাখে লাখে গোপী নিমিষে ভুলাইয়া
কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা॥
পীতবসন ছাড়ি ডোর কৌপীন পরি
বাকুয়া করিল দণ্ড।
কালিন্দীর তীরে সুখ পরিহরি
সিন্ধুতীরে পরচণ্ড॥
রাম অবতার ধনুক ধরিয়া
গোকুলে পূরিলা বাঁশী।
এবে জীব লাগি করুণা করিয়া
দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী॥
ধরি নবদণ্ড লইয়া করঙ্গ
সিন্ধুতীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয় সন্ন্যাসীর বেশ নয়
পাষণ্ডদমন বীরবানা॥'

মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শিবানন্দ সেনও পদরচনা করেছেন :

'অখিল ভুবন ভরি হরি রস বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য মেঘে।
ভকত চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করল বাদর।
উচা নীচা যত ছিল প্রেমে জলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।

অধম দুঃখিত যত তারা হৈল ভাগবত
বাড়িল গৌরাঙ্গ ঠাকুরালি॥
জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধারিল
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে কেন রৈনু মায়াভোলে
প্রভু মোরে দেহ পদছায়া॥'

সর্বজীবে গৌরহরির অনপেক্ষ করুণা। শুধু কৃষ্ণ-নামেই জীবের সমস্ত অভিমান নিরাকৃত হয়, জেগে থাকে শুধু কৃষ্ণদাসত্বের অভিমান।

আমি ব্রাহ্মণ নই ক্ষত্রিয় নই বৈশ্য নই শূদ্র নই, আমি বর্ণী বা ব্রহ্মচারী নই, আমি গৃহপতি বা গৃহস্থ নই, আমি বনস্থ বা বানপ্রস্থীও নই, আমি যতি বা সন্ন্যাসীও নই অর্থাৎ আমি চার বর্ণের কেউ নই, চার আশ্রমের কেউ নই, আমি প্রকৃষ্ট-প্রকটিত নিখিল পরমানন্দ অমৃতসমুদ্র গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসদাসানুদাস।

আর এই শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রই কবিকর্ণপূর, যাঁর অমর রচনা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। 'স্বানন্দরসসতৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যবিগ্রহো জয়তি।'

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে ভগবান শ্রীচৈতন্য ও রামানন্দের প্রশ্নোত্তর-মালিকাই তো প্রেমামৃতের নিরন্তধারা।

কা বিদ্যা? হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদিনিষ্ণাততা। বিদ্যা কী? হরিভক্তি। বেদপারঙ্গমতা নয়। 'প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার। রাম কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা নাহি আর।'

কীর্তিঃ কা? ভগবৎপরোঽয়মিতি যা খ্যাতির্ন দানাদিজা। কীর্তি কী? ভক্ত বলে সুখ্যাতি, দানধ্যান নয়। 'কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি। কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥'

কা শ্রীঃ? তৎপ্রিয়তা ন বা ধনজন-গ্রামাদি-ভূয়িষ্ঠতা। শ্রী কী? ভগবৎপ্রেম, ধনজনসম্পত্তিসমৃদ্ধি নয়। 'সম্পত্তিমধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি। রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সেই বড় ধনী॥'

কিং দুঃখম ? ভগবৎপ্রিয়স্য বিরহো নো হৃদ্‌ব্রণাদিব্যথা। দুঃখ কী ? ভক্তসঙ্গহীনতা, হৃদব্রণের যন্ত্রণা নয়। 'দুঃখমধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর। কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর ॥'

কে মুক্তাঃ ? প্রত্যাসত্তিহরিচরণয়োঃ সানুরাগে ন রাগে। প্রীতিঃ প্রেমাতিশয়িনী হরের্ভক্তির্যোগে ন যোগে। অন্য কোনো অনুরাগে নয়, হরিচরণানুরাগে, অন্য কোনো যোগে নয়, তীব্র প্রেমপ্রেরিত হরিভক্তিযোগে। 'মুক্তমধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি। কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি ॥'

কিং গেয়ম ? ব্রজকেলিকর্ম।

কিমিহ শ্রেয়ঃ ? সতাং সংগতিঃ। শ্রেয় কী ? সাধুসঙ্গ। 'শ্রেয়োমধ্যে কোন শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥'

কিং স্মর্তব্যম ? অঘারি নাম। স্মরণীয় কী ? নামবিনাশন কৃষ্ণনাম। 'কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ। কৃষ্ণনামগুণলীলা প্রধান কারণ ॥'

কিমনুধ্যেয়ম ? মুরারেঃ পদম। ধ্যানের বিষয় কী ? কৃষ্ণপাদপদ্ম। 'ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান। রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান ॥'

ক স্থেয়ম ? ব্রজ এব। কোন স্থান বাসযোগ্য ? ব্রজভূমি। 'সর্বত্যাগী জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস ? ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাঁহা লীলারাস ॥'

শ্রীরূপ গোস্বামী কী বলছেন ?

> 'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরামধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
> বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তাত্রপি গোবর্ধনঃ।
> রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
> কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥'

কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছে বলে মথুরা বৈকুণ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ। মথুরা থেকে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ যেহেতু বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রাসোৎসব করেছে।

বৃন্দাবন থেকে শ্রেষ্ঠ গোবর্ধন, যেহেতু গোবর্ধনই উদারপাণি কৃষ্ণের বিচিত্র রমণস্থল। গোবর্ধন থেকে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট যেহেতু সেখানেই কৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন। কোন ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা করবে না?

আরো বলছেন : জড়কর্মী থেকে চিদন্বেষী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়তর। জ্ঞানীর চেয়ে প্রিয়তর শুদ্ধভক্ত। শুদ্ধভক্তের চেয়ে প্রিয়তর প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত। প্রেমনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে প্রিয়তর ব্রজগোপীমণ্ডলী। সর্বগোপী মধ্যে প্রিয়তমা রাধিকা। যেমন প্রিয় রাধিকা তেমনি প্রিয় তার সরসী, রাধাকুণ্ড। কোন কৃতী ভক্ত না সেই রাধাকুণ্ড আশ্রয় করবেন?

৮৪

শ্রীচৈতন্য এক অদ্ভুত কল্পবৃক্ষ, যতিমুকুটমণি মুনিশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্রপুরী এই কল্পবৃক্ষের মূল, শ্রীল অদ্বৈত এর প্ররোহ, অবধূত নিত্যানন্দ এর স্কন্ধ, বক্রেশ্বরাদি পণ্ডিতগণ এর মূল শাখা, এই কল্পবৃক্ষের সর্বাঙ্গ মধুর রসে পরিপূর্ণ, ভক্তিযোগ এর কুসুম আর অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমই এর ফল।

কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয় কিসে?

'সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চমধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সদবুদ্ধিজনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥'

রূপগোস্বামী বলছেন : এই পঞ্চ বিষয় দুরূহ ও অদ্ভুতবীর্য—এ সবে শ্রদ্ধা দূরে থাক, ক্ষণিক স্বল্প সম্বন্ধ হলেই সুবুদ্ধি জনের ভাবোদয় হতে পারে।

কৃষ্ণই একমাত্র সৎ বস্তু এ বুদ্ধি যার আছে সেই সুবুদ্ধি।

যে বুদ্ধিমান সে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করে সৎ ব্যক্তিতে আসক্ত হবে। সৎ ব্যক্তিরাই উপদেশ দিয়ে মনের বিশেষ আসক্তিগুলিকে ছিন্ন করতে পারে। 'মহৎকৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়।' মহৎ কে? সাধু কে? সৎ কে? যে নির্মম বা নিরভিমান, নির্দ্বন্দ্ব বা নিন্দাস্তুতিনিরপেক্ষ, নিরহঙ্কার ও নিষ্পরিগ্রহ বা পুত্রকলত্রে নিরাসক্ত সেই সাধু। ভাগবতে ভগবান বলছেন, সাধুদের প্রসঙ্গ ঘটলেই আমার বীর্যপ্রকাশক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা উপস্থিত হয়, তা আস্বাদন করলেই আমাতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা রতি ভক্তি জন্মায়। আর আমিই অপবর্গের পথস্বরূপ।

সাধুরাই তিতিক্ষু কারুণিক সুহৃদ অজাতশত্রু শান্ত প্রণত ও সমদর্শী। 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়স্ত্বহম। মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।' সাধুরাই আমার হৃদয়, সাধুদের হৃদয়ও আমিই। তারা আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। আর আমিও তাদের ছাড়া আর কাউকেও বিন্দুমাত্র জানি না। 'ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান। ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥'

ভক্তরাই তীর্থস্বরূপ। তারাই তীর্থকে মহাতীর্থে পরিণত করে। 'ভাগবতাঃ তীর্থীভূতাঃ।' 'তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি।'

তীর্থভ্রমণ করে বিদুর ফিরে এলে যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের কি আর আপনার মনে আছে? পক্ষচ্ছায়ায় বিহঙ্গ যেমন তার শাবকদের রক্ষা করে আপনি তেমনি আমাদের বিষপ্রয়োগ ও জতুগৃহদাহ থেকে রক্ষা করেছেন। এখন তীর্থভ্রমণ ও দেশদর্শন করে ফিরে এলেন। কী কী দেখলেন, কীভাবেই বা জীবন ধারণ করলেন জানতে ইচ্ছে করছে। আপনার মত ভক্তজন তো নিজেই তীর্থ। গদাধর যাঁদের অন্তঃকরণে নিরন্তর বিরাজ করছেন তাঁরা তীর্থের পবিত্রতা বৃদ্ধি করবার জন্যেই তীর্থে যান, নতুবা তাঁদের তীর্থদর্শনে আর প্রয়োজন কী?

আর নারদ কী বলছেন? বলছেন, বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে একদিন তাদের ভিক্ষাপাত্রলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করেছিলাম।

সেইদিনই আমার পাপ দূরীভূত হল আর ক্রমশ চিত্তশুদ্ধতার ফলে তাদের অনুষ্ঠিত ভজনধর্মে আমার অভিরুচি হল। তারা প্রতিদিন মনোহর কৃষ্ণকথা গান করত, সেই পবিত্র কথা সশ্রদ্ধচিত্তে শুনতে শুনতে আমার কৃষ্ণে অনুরাগ উপস্থিত হল। বর্ষা ও শরৎ ঋতু এলে মহাত্মারা ত্রিসন্ধ্যা হরির অমল যশোগান কীর্তন করত, তাই শুনতে শুনতে আমার রজস্তমোনাশিনী ভক্তির উদয় হল। আমি পাপশূন্য ভক্তিসম্পন্ন বিনয়ী ও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে মহাত্মাদের পরিচর্যা করতে লাগলাম।

সাধুসেবার ফলই ভগবৎপদপ্রাপ্তি।

'সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।' সমচিত্ত বা সমভাবাপন্ন স্নিগ্ধস্বভাব অথচ নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করবে, আলাপ করবে আর রসিক সাধুর সঙ্গে ভাগবতের অর্থের আস্বাদন করবে।

'সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব। এ তিনে সব ছাড়ায়—করে কৃষ্ণভাব॥' ভগবৎসঙ্গীর সঙ্গ যদি লবমাত্র কালের জন্যেও হয়, তার ফলের সঙ্গে স্বর্গ বা মোক্ষ বা অপুনর্ভবেরও তুলনা হয় না। 'লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।' ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।'

কৃষ্ণোন্মুখতা আসে কিসে? সাধুর কৃপায় আর শাস্ত্রের কৃপায়। এই কৃষ্ণোন্মুখতা না আসা পর্যন্ত জীবের নিস্তার নেই। 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতং তরন্তি তে॥' গীতায় বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, আমার এই অলৌকিকী গুণাত্মিকা মায়া দুরতিক্রম্যা। যারা আমার শরণাগত শুধু তারাই এ মায়া উত্তীর্ণ হতে সমর্থ। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সৎসমাগম থেকেই পরাবর অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রতি আসে। 'সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন।' আর ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে সর্ব অনর্থের নিবর্তন হয়, সর্ব দুর্বাসনার বিমোচন ঘটে।

আর কৃষ্ণসেবা কী? ভক্তিই তো কৃষ্ণসেবা। রূপকে বলছেন মহাপ্রভু, 'কৃষ্ণসেবা রস ভক্তি করিহ প্রচার।' 'কৃষ্ণমাধুর্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ। কৃষ্ণসেবা করে আর কৃষ্ণরস আস্বাদন॥' কৃষ্ণসেবার ফল ভক্তি আবার ভক্তিছাড়া কৃষ্ণসেবা সাধ্যাতীত। কৃষ্ণই সমস্ত রসের নিধান, সমস্ত রসের মূর্ছনা। কৃষ্ণরস পরিস্ফূর্ত চারটি মাধুর্যে। লীলামাধুর্যে, বেণুমাধুর্যে, রূপমাধুর্যে আর প্রেমমাধুর্যে। কৃষ্ণরসেরও আরেক নাম ভক্তি। কৃষ্ণসেবা দ্বারাই কৃষ্ণরস ও কৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদনীয়।

তাহলে আবার সেই ভক্তি। বৈধী আর রাগানুগা। বৈধী যা শাস্ত্র-আজ্ঞা মেনে চলে আর রাগানুগা যা শাস্ত্র-যুক্তি মানে না, যা শুধু হৃদয়ের অনুবর্তী। কর্তব্যের ডাক শোনে না, শুধু প্রাণের ডাক শোনে। যা নিশ্চিত মাত্রায় ঐকান্তিক। উদগাঢ়তীব্র।

ভগবান সর্বাধীশ। সকলের বশকারী, সকলের অধিপতি, সকলের নিয়ামক, সকলের শাসনকর্তা—'সর্বমিদং প্রশাস্তি'। সেই কিনা ভক্তের বশীভূত। 'ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।' 'অহং ভক্তপরাধীনো।' কে না জানে ভগবান সমদর্শী, অপক্ষপাত। তবু ভক্তের সঙ্গে তাঁর সাপেক্ষ সম্বন্ধ কেন? সে শুধু ভক্তির গুণে। যে হরিময় তাকে হরি হৃদয়ে ছাড়া আর কোথায় রাখবেন? কী বলছেন ভগবান? যাদের চিত্তে কামকর্মের বীজ নেই, ভোগবাসনা যাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সে সব বাসুদেবনিলয় ভাগবতোত্তমদের আমি ফেলি কী করে? যাদের আমিই একমাত্র গতি তাদের ছেড়ে আমি আমার আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালোবাসি না। যারা অকামহত তারাই তো অমৃতত্বের অধিকারী।

ভক্তের মহিমা দেখ।

ভক্ত সর্ববর্ণাধিক। অর্থাৎ ভক্তিই বর্ণোত্তম। অন্ত্যজও যদি হরিভক্ত হয় সে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ভক্তই সর্বধর্মকর্তা। সর্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ আহর্তা। সর্বপুরুষার্থসিদ্ধ। সর্বত্রপূজ্য। ভক্তই প্রশস্ততীর্থ। তাদের

পাদরজ গঙ্গা-যমুনার জলস্পর্শের চেয়েও বেশি। দেবতান্তরের উপাসনার দরকার নেই, শুধু বৈষ্ণব ভক্তদের আরাধনা করো। ভক্তই মহত্তম ভগবৎপ্রতিনিধি। ভক্তই ভক্তিদাতা। হে উদ্ধব, ভক্ত বলে তুমি আমার যেমন প্রিয়, পুত্র হয়েও ব্রহ্মা আমার তেমন প্রিয় নয়, আমার স্বরূপ হয়েও শঙ্কর তেমন প্রিয় নয়, ভাই হয়েও সঙ্কর্ষণ তেমন প্রিয় নয়, ভার্যা হয়েও লক্ষ্মী তেমন প্রিয় নয়। সব চেয়ে বড় কথা আমি নিজেও আমার তেমন প্রিয় নই।

তারপরে ভাগবত। ভাগবত কৃষ্ণলীলাগ্রন্থ, তাই 'কৃষ্ণতুল্য ভাগবত', সকলের আশ্রয়—'বিভু সর্বাশ্রয়।' ভাগবতই সমস্ত বেদ-উপনিষদের সার। ভাগবতই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। ভাগবতই কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ। ভাগবতই নিখিল শাস্ত্রচর্চার পরম পরিণতি।

সনাতন পুরুষ বাসুদেবই সমস্ত বেদের বেদ্য বস্তু। তাঁর পারম্যই সমস্ত বেদে পরিগীত হয়েছে। এ কথা যারা জানে তারাই বেদবিৎ। বেদকে কেউ দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, কিন্তু সালঙ্কারা পত্নী যেমন প্রণয়বশে পতিকামনায় নিজ তনু প্রকাশ করে তেমনি বেদও প্রসন্ন হয়ে বৃত জনের কাছে আপন রহস্য উন্মোচন করে।

কৃষ্ণই সর্ব। কৃষ্ণবিরহিত কোনো সত্তা নেই। 'সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।' কৃষ্ণভজনেই সমস্ত ভজন, সর্ব দেবের আরাধনা। কৃষ্ণ প্রসন্ন থাকলে অরি মিত্র হয়, বিষ পথ্য হয়, অধর্মও ধর্ম হয়। আর কৃষ্ণ যদি বিপরীত হয় তা হলে সমস্তই বিপর্যয়। তখন মিত্রও অরি, পথ্যও বিষ আর ধর্মও পাপকর্ম।

মানুষের রাজা নৃপতি, নৃপতির রাজা দেবতা, দেবতার রাজা ইন্দ্র, ইন্দ্রের রাজা জনার্দন। জনার্দনই বিষ্ণু, আবার বিষ্ণুই নরলোকে নররূপী কেশব। 'বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি, ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।' বেদ থেকে বড় কোনো শাস্ত্র নেই, কেশব থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো দেবতা নেই। 'কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ।' কৃষ্ণ ছাড়া ভগবৎ-পদার্থ আর কী আছে? 'বাসুদেব পরাগতিঃ।'

আর অনাবৃত অনাচ্ছাদিত বেদই ভাগবত। বেদোপদেষ্টাও কৃষ্ণ। বেদের বিষ্ণুতে কৃষ্ণকেই নির্দেশ। কৃষ্ণই প্রচ্ছন্নরূপে সর্ব-বেদকীর্তিত বিষ্ণু। কৃষ্ণভক্তি বেদেরও মুখ্য তাৎপর্য। 'কৃষ্ণে ভগবত্তাজ্ঞান সম্বিদের সার।'

'অবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম॥
প্রভু বোলে সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বোলয়ে আন॥
হর্তা কর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যার তার অকথ্য কথনে॥
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন।
সেবকবৎসল নন্দগোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি।
পঢ়িয়াও সর্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম নাহি জানে॥

'শাস্ত্রের না জানে মর্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে।'

ভগবান জ্ঞানী-বৎসল বা যোগী-বৎসল নন, ভগবান ভক্তবৎসল। শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া ভগবদবস্তুর সাক্ষাৎকারের বা উপলব্ধির অন্য পথ নেই। ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির অন্তর্নিহিত প্রাণধারা। ভক্তের সমস্ত চেষ্টাই ভগবৎসেবা। ভগবানের প্রীতিবিধান ছাড়া তার আর অন্য প্রয়োজন নেই। ভক্ত সুখ পেতে চায় না, শুধু সেবা করতে চায়। সেবায় আনন্দের থেকে সেবার অভিলাষেই তার বেশি আনন্দ। আনন্দ আস্বাদন করতে গিয়ে যদি সেবায় বিঘ্ন ঘটে তা হলে সে আনন্দে ধিক। কৃষ্ণসারথি দারুক কৃষ্ণকে চামর ব্যজন করছিল। করতে করতে তার প্রাণে সেবানন্দ উপস্থিত হল, ফলে দেহে স্তম্ভ ভাবোদয় হল, হাত জড়ীভূত হয়ে এল। চামর আর নড়তে চাইল না। কৃষ্ণসেবায় বাধা পড়ল। সেই প্রেমানন্দকে ধিক যে কৃষ্ণ-সেবার ব্যত্যয় হয়।

সেই ভগবান কৃষ্ণ কলিযুগে প্রেমোজ্জ্বল ভক্তিপথের প্রদর্শক চৈতন্যমূর্তি ধরে অবতীর্ণ হলেন। তখন 'গেহে গেহে তুমুল হরি-সঙ্কীর্তন', 'দেহে দেহে বিপুল পুলকাশ্রু' আর 'স্নেহে স্নেহে পরম-মধুরোৎকর্ষ পদবী' প্রকাশ পেল। পাত্রাপাত্র বিচার করলেন না, আত্মপর ভেদদর্শন করলেন না, দেয়-অদেয় বিবেচনা করলেন না, কাল-অকাল প্রতীক্ষা করলেন না। শ্রবণ দর্শন প্রণাম ও ধ্যান দ্বারাও যা পাওয়া যায় না সেই ভক্তিরস তৎক্ষণাৎ তন্মুহূর্তে বিতরণ করলেন। আর নাম-সঙ্কীর্তনেই সেই ভক্তির সমুত্থান।

নামেই শান্তি, সংসৃতিনাশ বা সংসারক্ষয়। গৌরের আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে যুগধর্ম নামেরও আবির্ভাব। 'জন্মিলা চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া।'

'সঙ্কীর্তন সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥

হেনমতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সঙ্কীর্তন করিয়া প্রচার॥
যার মুখে এ জন্মেও নাই হরিনাম।
সেহো হরি বলি ধায় করে গঙ্গাস্নান॥'

নামই পরম উপায়। নামেই কৃষ্ণপ্রেমোদয়।

'মথিয়া সকল তন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে শিখায়।
গোলোকের প্রাণধন হরিনাম সঙ্কীর্তন
রতি না জন্মিল কেন তায়?'

একমাত্র নামেরই প্রেমদানের ক্ষমতা আছে। 'অদ্যাপিও দেখ—চৈতন্যনাম যেই লয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥' নামমাধুরী চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী, কিছুতেই চিত্ত থেকে রসনা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। 'না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো—বদন ছাড়িতে নাহি পারে।' নাম পাপনাশ করে এ বড় কথা নয়, মুক্তি এনে দেয় এও বড় কথা নয়, নাম প্রেমিক করে তোলে এটাই বড় কথা।

সূর্য যেমন তিমিরজলধিকে শোষণ করে, জগন্মঙ্গল হরিনাম একবার তেমনি জিহ্বাগ্রে উদিত হতেই পাপ চোরের মত ছুটে পালায়। নাম আর নামী অভিন্ন বলেই নামের এত শক্তি। 'এতদ্ধি এবং অক্ষরং ব্রহ্ম।' এই নামাক্ষরই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের মত নামও পরম স্বতন্ত্র, সচ্চিদানন্দ। নামের মত নামাভাসেরও সমান শক্তি। এমন কি নামের অক্ষরগুলি একই শব্দে দূরে দূরে, ব্যবহিত হয়ে, বা ফাঁক রেখে বসলেও সমান কার্যকর। 'নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥' নামই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। 'এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।'

'কেহো বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়॥

হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়ে॥'

নামেই নববিধা ভক্তির পূর্ণতা। নামই 'আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং'—পুণ্যাত্মাদের আকর্ষণ, 'উচ্চাটনং অংহসাং'—মহাপাতকের উৎপাটন, 'আচণ্ডালং অমূকলোকস্সুলভ'—চণ্ডাল পর্যন্ত অধমদের, শুধু যাদের বাকশক্তি আছে তাদেরই সহজপ্রাপ্য—এমন কি 'বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ', —মুক্তি-বিত্তের বশীকারক। এতে কোনো দীক্ষার দরকার নেই, পুরশ্চর্যার দরকার নেই, সদাচারের দরকার নেই। 'রসনাস্পৃগেব ফলতি'—রসনাস্পর্শ করা মাত্রই ফলান্বিত হয়ে ওঠে।

'কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদিপরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্মদ্রুমস্য প্রভবতুভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥'

কৃষ্ণনাম নিখিল কল্যাণের আধারস্বরূপ, কলিদোষবিধ্বংসী, পবিত্রেরও পবিত্রকারী, ভববন্ধনমুক্তির পাথেয়, ভক্ত কবিবাণীর বিশ্রামস্থল, সাধুদের জীবনস্বরূপ, ধর্মবৃক্ষের নিগূঢ় বীজ—সে নাম সকলের মঙ্গলময় পরমপদপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নিজের পারম্য শক্তি বিস্তার করুক।

নামাশ্রয় থেকে বিচ্যুত করাই কলির শ্রেষ্ঠ কাপট্য। নামকে ধরে থাকলে নামই আশ্রিত জনকে রক্ষা করবে। যারা হরিনাম-পরায়ণ তারাই কৃতকৃতার্থ, কলি তাদের কী করবে? কলিসঙ্কটত্রাণে নামই সর্বাধ্যক্ষ, সর্বশক্তিমান।

'কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম॥'

কলিকালরূপ তীক্ষ্ণদন্ত ক্রূর কালসাপ থেকে ভয় নেই। গোবিন্দ-নামরূপ দাবাগ্নিতে তা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

'জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়, জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে!' হে

পরমাক্ষর, অনাদরেও যে তোমাকে উচ্চারণ করে তার নিখিলপাপ-পটলী অপসৃত হয়ে যায়। ভবধ্বান্তকবলিত মানুষ তোমার থেকে তত্ত্বদৃষ্টি পেয়ে প্রণয়িনী ভক্তিকে সাক্ষাৎ করে। তোমার স্ফুরণে প্রারব্ধভোগের খণ্ডন হয়। তুমি বাচ্যরূপে অর্চনীয়, বাচ্যপদে যে অপরাধী, নামদাস্যে তারও অপরাধ দূরে যায়। 'নাম! গোকুল-মহোৎসবায় তে কৃষ্ণ পূর্ণবপুষে নমো নমঃ।' হে নাম, গোকুল-মহোৎসব কৃষ্ণ, হে পূর্ণস্বরূপ, তোমাকে বারে বারে প্রণাম করি।

'যারে দেখে তারে বলে বল কৃষ্ণনাম।' উচ্চস্বরে নাম করেন গৌরহরি আর তার সংখ্যা রাখেন। তীর্থপর্যটনেও নাম-গণনায় তাঁর হাত ব্যাপৃত। 'দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে।' কতক্ষণ নাম করেন? ব্রাহ্মমুহূর্তে থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। 'বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে। নাম সংকীর্তন করে মধ্যাহ্ন পর্যন্তে।'

জগাই মাধাই বৈষ্ণব হয়ে প্রত্যহ দু লক্ষ নাম করত। হরিদাস তিন লক্ষ। 'লক্ষেশ্বর' ছাড়া অন্য গৃহে প্রভু ভিক্ষা নিতেন না।

'চৈতন্য সেব চৈতন্য গাও লও চৈতন্য নাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ॥
এই যত লোকে চৈতন্য ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন নিন্দকাদি সভারে নিস্তারিল॥'

নিত্যানন্দ গৌড়দেশে প্রেমধর্ম প্রচার করবার জন্যে প্রেরিত হন। প্রেমধর্ম প্রচারের সঙ্গে মহাপ্রভুর ভগবত্তাও প্রচার করলেন।

আর অদ্বৈত বলছেন:

'শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজ শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোনো অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব-অবতার মম চৈতন্যগোঁসাই॥'

৮৫

ছয়-গোস্বামী কে কে? রূপ সনাতন শ্রীজীব গোপাল ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস।

'জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এ ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ॥'

রূপ গোস্বামী বলছেন: 'স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশো-র্যাস্যতি পদম।' সেই চৈতন্য কি আরেকবার আমার নয়নপথের পথিক হবেন?' কে চৈতন্য? পরমেষ্ঠি পঞ্চাননের যিনি 'সদোপাস্য', ভক্তদের যিনি নিজভজনমুদ্রা শেখাবার জন্যে সমুৎসুক। যিনি গোপীপ্রেমের বিনির্যাস, যতিকুলশিরোমণি, দীনোদ্ধারী গৌরহরি, সেই কৃপাদ্রব শ্রীচৈতন্যকে কি আরেকবার দেখতে পাব? উচ্চকণ্ঠে হরেকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করতে যাঁর রসনা নৃত্যপর ও নাম-গণনায় ব্যাপৃত যাঁর সুন্দর বাম হস্ত গ্রন্থীকৃত কটিসূত্রে সুশোভিত, যিনি বিশালাক্ষ ও আজানুলম্বিতবাহু সেই শ্রীচৈতন্য কি আরেকবার আমার নয়নসম্মুখে উদিত হবেন?

রূপ মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থনা করছেন: হে রসরত্নাকর, যা বেদে নেই উপনিষদে নেই, অন্যান্য অবতারেও যা প্রকাশিত হয় নি, সেই ভক্তিরত্ন তুমি পৃথিবীতে বিতরণ করছ। অতএব হে শচীনন্দন, এই মন্দজনকে কৃপা কর।

আর সনাতন গোস্বামী বলছেন :

'বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভগবন্তং কৃপার্ণবম।
প্রেমভক্তিবিতানার্থং গৌড়েষ্ববততার যঃ ॥'

প্রেমভক্তি প্রচারের জন্যে যিনি গৌড়ে অবতীর্ণ হয়েছেন সেই কৃপাপারাবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

আবার বলছেন : ভক্তভাবের প্রতি লোভবশত যিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ সেই কনককান্তি যতিবেশধারী শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই শ্রীহরিরূপে বিরাজমান।

গৌরহরিই সনাতনের 'মদেকধনজীবনম'। গৌরহরিই সেই ভগবান যাঁর করুণাস্পর্শে পাষাণও নৃত্য করে।

শ্রীজীব রূপ-সনাতনের ভাইপো। শ্রীজীবের প্রার্থনা :

নমশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

নাম-নামীতে অভেদ রসামৃতমূর্তি পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত চিন্তামণি কৃষ্ণচৈতন্যকে নমস্কার। আবার বলছেন : দুর্জন পর্যন্ত সর্বজীবের আশ্রয় চৈতন্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের জয়। যিনি বাইরে গৌর অন্তরে কৃষ্ণ যিনি তাঁর অঙ্গবৈভব জনসমাজে প্রকটিত করেছেন আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্তন সাহায্যে তাঁর আশ্রয় নিয়েছি।

রঘুনাথ গোস্বামী বলছেন :

নিজামুজ্জ্বলিতাং ভক্তিসুধামর্পয়িতুং ক্ষিতৌ।
উদিতং তং শচীগর্ভব্যোম্নি পূর্ণং বিধুং ভজে ॥

যিনি পৃথিবীতে নিজের উজ্জ্বল ভক্তি-সুধা সমর্পণ করবার জন্যে শচীর গর্ভাকাশে পূর্ণচন্দ্রের মত উদিত হয়েছেন তাঁকে আমি ভজনা করি।

গোপালভট্ট গোস্বামী প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভাইপো। হরিভক্তি-বিলাসের রচয়িতা। আর এই গ্রন্থের প্রত্যেক বিলাসেই শ্রীচৈতন্য-বন্দনা। শ্রীচৈতন্যই ভগবান, গুরুত্তর ও জগৎগুরু।

প্রবোধানন্দ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের কবি। প্রথমে মায়াবাদী ছিলেন, গৌরকৃপা পাবার পর ভক্তিসুধাসমুদ্রে ডুবেছেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে 'রাধারসসুধানিধি'। প্রেমানন্দরসোৎসব। দয়ালু দেবতা।

'বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগং
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥'

বৃন্দাবনদাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে এর অনুবাদ দিচ্ছেন :

'বৈরাগ্য সহিতে নিজভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-তনু পুরুষপুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণগুণধাম।
স্ফুরুক আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥'

আবার :

'কালান্নষ্টঃ ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥'

বৃন্দাবনদাসের অনুবাদ :

'কালবশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে
পুনর্বার নিজভক্তি প্রকাশ কারণে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥'

রামানন্দ রায় বলছেন :

'নানোপচারকৃতপূজনমার্তবন্ধোঃ।
প্রেমৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ॥

যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরা পিপাসা।
তাবৎ সুখায় ভবতো নমু ভক্ষ্যপেয়ে ॥'

ভগবান আর্তবন্ধু। তাঁর বিবিধ উপচারকৃত পূজায় নয়, শুধু প্রেমেই ভক্তহৃদয় সুখে দ্রবীভূত হয়। যে পর্যন্ত তীব্র ক্ষুধা ও পিপাসা জঠরে থাকে সে পর্যন্তই ভক্ষ্যপেয় সুখাস্বাদ্য। ঐকান্তিক ভক্তগণ শুধু প্রেমেই তৃপ্ত, সোপচার অর্চনায় নয়, নয় বা আয়োজনের আড়ম্বরে। আর ভক্তের যাতে তৃপ্তি তাতে কৃষ্ণেরও তৃপ্তি।

'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা যতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥'

যদি কোথাও পাও তবে কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি অর্জন করো। তার একমাত্র মূল্য লৌল্য অর্থাৎ সুতীব্র লালসা। যদি না হৃদয়ে এই দুর্বার লালসা জাগে তবে কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও তা লাভ করা যাবে না।

'যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥'

'যার নাম শ্রবণমাত্র জীব নির্মল হয় সেই তীর্থপদ শ্রীহরির দাসদের আর কী অবশেষ আছে?'

'ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
সদাহমৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম ॥'

আমি কবে অন্যাভিলাষশূন্য স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়ে নিরন্তর তোমার

অনুচর হয়ে তোমার সেবা করতে পারব? কবে তোমার ঐকান্তিক নিত্যকিঙ্কর হয়ে আপনাকে সনাথ ভেবে আনন্দান্বিত হব?

ব্যোম বা আকাশের গুণ শব্দ, মরুৎ বা বাতাসের গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ ও রূপ, অপ বা জলের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, ক্ষিতি বা মৃত্তিকার গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ। তেমনি শান্ত রসে কেবল শান্ত ভাব। দাস্যরসে শান্ত ও দাস্য ভাব। সখ্য রসে শান্ত দাস্য ও সখ্য ভাব। বাৎসল্য রসে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য ভাব। আর মধুর রসেই পঞ্চ ভাবের সম্মিলন—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্যের সমাহার।

'মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে।
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে॥'

সুমধুর ঈষৎ-হাস্য-যুক্ত যাঁর আকার, যিনি মন ও নয়নের উৎসব, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার উৎকণ্ঠিতা দীনা তৃষ্ণা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

গৌরহরির আবির্ভাবের হেতু কী? অদ্বৈতের কাতর প্রার্থনা, যুগধর্ম নামসঙ্কীর্তন প্রচার, জীবকে ব্রজপ্রেমদান আর অন্তরে রাধিকামাধুর্যের আস্বাদন।

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যাঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥'

যে প্রেমের দ্বারা রাধা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করে রাধার সেই প্রণয়মহিমাই বা কী রকম? আর রাধাপ্রেম দ্বারা আস্বাদ্য যে আমার অদ্ভুত মধুরিমা তাই বা কী রকম? আমাকে অনুভব করে রাধার যে সুখ হয় তাই বা কী রকম? এই লোভে রাধাভাবযুক্ত হয়ে শচীগর্ভসিন্ধুতে হরি-ইন্দু অর্থাৎ গৌরাঙ্গচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করলেন।

রাধিকা কৃষ্ণের সদানন্দবিধায়িনী।

'শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী॥'

কৃষ্ণ জগন্মোহন কিন্তু রাধিকা তার প্রেমে সৌন্দর্যে সুস্বভাবে নৃত্যগীতচাতুর্যে গুণবৈভবে কবিতায় ও পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরও মনোমোহিনী।

সেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণই গৌরহরি।

'শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্যতঃ।
সংগৃহ্নাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন॥'

'যাঁর চরণাশ্রয় প্রভাবে অজ্ঞও শাস্ত্র-খনি থেকে সিদ্ধান্ত-মণি সংগ্রহ করতে পারে সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।'

'বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নঃ শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥'

'আমি বৈগুণ্যকীট দ্বারা আচ্ছন্ন, খলতা-ব্রণে নির্যাতিত, দৈন্য-সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে শ্রীচৈতন্যবৈদ্যের শরণ নিয়েছি।'

তাই চাইছি যেন আমার হরিকথাতে রতি হয়। যদি নামে রুচি না হয় তাহলে ধর্মকর্ম সমস্তই পণ্ডশ্রম। 'মহাভাগবত যত ঐকান্তিক ভক্ত। প্রীতি করে নাম স্মরণ না করে অন্যকৃত্য॥' হরিনাম গোলোকের গুপ্তধন। সেই গুপ্তধন বিতরণের জন্যেই গৌরাবতরণ।

'চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণ জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে॥'

যে কৃষ্ণ পরম-উদার গৌররূপে চির অপ্রদত্ত স্বীয় গুপ্তবিত্ত,

প্রেমামৃত ও নামামৃত, আপামর জনগণকে বিতরণ করেছিলেন আমি তাঁর শরণাপন্ন হই।

'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥'

সত্য আনন্দ ও চিৎস্বরূপ আত্মায় যোগিগণ রমণ করেন, এইজন্য রাম-পদে উক্ত আত্মা পরমব্রহ্ম বলে কীর্তিত হয়ে থাকে। আর কৃষ্ণ?

'কৃষির্ভূর্বাচকঃ শব্দোণশ্চনির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥'

'কৃষি' ভূ-বাচক শব্দ। ভূ অর্থ সত্তা। আর 'ণ' নির্বৃতিবাচক। নির্বৃতি অর্থ পরমানন্দ। কৃষ ধাতুর উত্তর ণ প্রত্যয় করে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ অর্থ হচ্ছে পরমানন্দময় অবস্থা। কৃষ্ণ শব্দও পরব্রহ্মবাচক।

এদিকে পদ্মপুরাণে মহাদেব পার্বতীকে বলছেন:

'রাম রামেতি রামেতি রমে! রামে! মনোরমে!
সহস্র নামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥'

হে সুন্দরী বরাননে, হে মনোরমে, তুমি 'রাম' এই নাম শ্রবণ করো। কেননা অন্য সহস্র নামের সমান এক রাম নাম।

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলছে:

'সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলম।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥'

পবিত্র সহস্র নামের তিনবার পাঠে যে ফল হয়, কৃষ্ণ এই একটি নামের একবারমাত্র পাঠে সেই ফল পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তম্।'

আর হরি? হরি তো হরণকর্তা। অশুভ হরণ করেন আবার প্রেম দিয়ে মনোহরণ করেন। আর নাম তো হরি কৃষ্ণ রাম, রাম কৃষ্ণ হরি।

প্রকাশানন্দকে বলছেন মহাপ্রভু :

'প্রভু কহে—শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন॥
মূর্খ তুমি তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥'
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্রমর্ম॥
ব্যক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার।
কলিযুগে কৃষ্ণনাম সংকীর্তন সার॥
এত বলি পুনঃ শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে॥'

যিনি ভাগবতের সর্ব প্রথম বঙ্গানুবাদ করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-নামে সেই গুণরাজখানকে বলছেন :

'প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন॥'

কূর্মক্ষেত্রে কূর্মনামে বৈদিক ব্রাহ্মণ বিষয়-তরঙ্গের দুঃখ সইতে না পেরে মহাপ্রভুকে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।'

মহাপ্রভু বললেন :

'প্রভু কহে—ঐছে বাত কভু না কহিবা।
গৃহে বসি কৃষ্ণনাম নিরন্তর লৈবা॥
যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হৈয়া তার' দেশ॥'

কুষ্ঠী বাসুদেব বললে, 'আগে সকলের অস্পৃশ্য হয়ে ছিলাম, ভালোই ছিলাম। মনে লেশমাত্র অহঙ্কার ছিল না। এখন তোমার আলিঙ্গনে আমার অঙ্গ ক্ষতমুক্ত সুন্দর হয়ে উঠল, এখন যে আমার মনে অহঙ্কার জাগবে।

উত্তরে মহাপ্রভু কী বললেন ?'

'প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥'

বৌদ্ধরা যখন মহাপ্রভুকে বললেন, 'আমাদের আচার্য গুরুকে বাঁচাও, তখনও মহাপ্রভুর ঐ উপদেশ।

'প্রভু কহে—সভে কহ 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি।
গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি ॥
তোমা সভার গুরু তবে পাইবে চেতন।
সর্ব্ব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সঙ্কীর্তন ॥'

তারপর তত্ত্ববাদী বৈষ্ণব আচার্যকেও সেই কথা।

'প্রভু কহে—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেম সেবাফলের পরম সাধন ॥'

প্রতাপরুদ্রের কাকুতি শুনে বলছেন :

'প্রভু বোলে কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণকার্য্য বিনে তুমি না করিহ আর ॥
নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণুচক্র সুদর্শন ॥'

যবনরাজকে আশ্বাস দিলেন :

'তবে মহাপ্রভু তারে কৃপাদৃষ্টি করি।
আশ্বাসিয়া কহে—তুমি কহ কৃষ্ণ-হরি ॥'

সনাতনকে বলছেন :

'কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥'

রূপকেও দিচ্ছেন সেই কীর্তনের উপদেশ :

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হঞা। সেই বীজ করয়ে রোপণ।
শ্রবণ কীর্তন জলে করয়ে সেচন ॥'

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকেও সেই কথা :

'আমার অবজ্ঞায় রঘুনাথ! যাহ বৃন্দাবনে
তাহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন স্থানে ॥
ভাগবত পঢ় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান ॥'

রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলছেন :

'বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসঙ্কীর্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥
অমানীমানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।'

আর নিজের সম্পর্কে বলছেন :

'আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।'

৮৬

যে বাক্যের দ্বারা পবিত্রকীর্তি ভগবানের গুণকীর্তন করা হয় তাই সার্থক বাক্য, অন্য সব বাক্য বৃথা। যে হাত তাঁর সেবাপূজাদি কর্ম করে তাই হাত। যে মন তাঁকে সমস্ত স্থাবরজঙ্গমে অবস্থিত বলে স্মরণ করে তাই মন। আর যে কান তাঁর পুণ্যকথা শোনে তাই কান।

যমদূতেরা অজামিলকে নরকে নিয়ে আসতে পারল না। যম-রাজের দণ্ড ভঙ্গ হল। নারায়ণ—এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে চারজন বিষ্ণুদূত এসে তাকে ভগবদ্ধামে নিয়ে গেল।

সেই হেতু যমদূতেরা এসে যমকে প্রশ্ন করছে : এই ত্রিভুবনের শাসনকর্তা ক'জন? আমরা জানতাম আপনিই সর্বেসর্বা, সমস্ত শাসকের অধীশ্বর, আপনিই একমাত্র শুভাশুভ বিচারক, একমাত্র দণ্ডধর। এখন দেখছি আপনার বিহিত দণ্ড আর লোকশাসনে সক্ষম নয়। নচেৎ আপনার আদেশে পাপীকে যাতনা-গৃহে আনছিলাম, কোত্থেকে চারজন সিদ্ধপুরুষ এসে আপনার আদেশ লঙ্ঘন করে তার পাশ ছেদন করে তাকে মুক্ত করে দিল। মাত্র নারায়ণ-নাম উচ্চারণেই এই ব্যাপার ঘটে গেল।

প্রজাসংযমন যম আনন্দিত হলেন, শ্রীহরির পদারবিন্দ স্মরণ করে বললেন, 'আমারও ঊর্ধ্বে চরাচরের একজন পরমেশ্বর আছেন, বস্ত্রে সূত্রের মত তাঁতে বিশ্ব ওতপ্রোত রয়েছে। তিনিই সমস্ত স্থিতি-জন্ম-লয়ের কর্তা এবং সমস্ত লোক তাঁর বশবর্তী। অন্যে পরে কা কথা, আমি, মহেন্দ্র, নির্ঋতি, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ সকলেই তাঁর অধীন, তাঁর চেষ্টা

বা অভিপ্রায় জানতে কেউই সক্ষম নয়। ভাগবত-ধর্ম সম্বন্ধে শুধু বারো জন অবহিত। ব্রহ্মা, নারদ, শিব, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব আর আমি যম—এই বারো জন। এই বিশুদ্ধ দুর্বোধ আর গুহ্য ভাগবত-ধর্ম জানতে পারলেই জীব অমৃত হয়।

সেই পরমধর্ম কী? নামসংকীর্তন দ্বারা ভগবান বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ তাই ইহলোকে পুরুষদের পরম ধর্ম। আর নামোচ্চারণ মাহাত্ম্য তো দেখলে। অজামিল কেমন মৃত্যুপাশ থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

যারা ভগবৎপ্রপন্ন, ভগবানে সর্বান্তঃকরণে ভক্তি করে থাকে, তাদের পাপ হতে পারে না। যদি বা হয়, ভগবন্নামকীর্তনে তা নষ্ট হয়ে যায়। ভক্ত ও নামকারীর দণ্ডবিধানে আমরা সমর্থ নই। 'নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে।' হে পুত্রগণ, তোমরা ক্ষুব্ধ হয়ো না, অজামিলের মুক্তিতে তোমাদের প্রভুর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নি। যারা অকিঞ্চন, সাধুসঙ্গ থেকে বিচ্যুত, যারা মুকুন্দ পাদ-পদ্মের মধু-আস্বাদনে বিমুখ, যারা গৃহে বদ্ধতৃষ্ণ, সেই সব পাপীদেরই আমার কাছে ধরে আনবে। আর আনবে সেই সব জড়বুদ্ধিদের, যাদের জিহ্বা ভগবানের নামগুণ কীর্তন করে না, যাদের মন ভগবানের চরণকমল স্মরণ করে না, যাদের মাথা কখনো কৃষ্ণপদে প্রণত হয় না, আর যাদের ভগবৎ-ব্রতাচরণে রুচি নেই।

পুরাণপুরুষ নারায়ণের কাছে যম ক্ষমা চাইল। আমার দূতদের অন্যায় মার্জনা করুন। এই অঞ্জলিবন্ধন করছি, ওরা না জেনে অপরাধ করেছে, সেই অপরাধের মার্জনা তো আপনার কাছেই পাওয়া যাবে। গরীয়সী ক্ষান্তি তো আপনারই গুণ।

শুকদেব বললে, 'ভগবান বিষ্ণুর নামসংকীর্তনই জগতের মঙ্গল-স্বরূপ। তার দ্বারাই মহৎ পাপেরও ঐকান্তিকী নিষ্কৃতি ঘটে। ভগবান হরির উদ্দামবীর্য মুহুর্মুহুঃ শ্রবণ ও কীর্তন করলে সুন্দরী

ভক্তি দেখা দেয়। সেই ভক্তিতে যেমন শুদ্ধি ঘটে ব্রতনিয়মেও তা লভনীয় নয়। যে একবার কৃষ্ণপাদপদ্মমধুর আস্বাদ পায় দুর্গতিময় মায়াবিষয়ে তার আর রতি হয় না। কিন্তু যে কামহত রাগান্ধ সে শুধু কর্মেই পাপের অনুবর্তন করে।'

যমকিঙ্করেরা সেই থেকে কৃষ্ণাশ্রিত ব্যক্তির প্রতি নেত্রপাত করতেও ভয় পায়, পাশবদ্ধ করার চেষ্টা তো দূরস্থান। 'নৈবাচ্যুতাশ্রয়জনং প্রতিশঙ্কমানা দ্রষ্টুঞ্চবিভ্যতি ততঃ প্রভৃতি।'

সাধুনিন্দা, কৃষ্ণ ও অন্য দেবতাতে ভেদজ্ঞান, গুরুর প্রতি অভক্তি, শাস্ত্রনিন্দা, বেদনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নাম উপলক্ষে অসৎবৃত্তির চরিতার্থতা, অন্য মাঙ্গলিক কার্যের সঙ্গে হরিনামের সমত্ববিধান, অনধিকারী ও বহির্মুখকে নামোপদেশ, নামমাহাত্ম্যশ্রবণে অনিচ্ছা— এই দশ নামাপরাধ বর্জন করে নাম করো। আর কে না জানে, 'নাম-অপরাধ হয় নামেতে খণ্ডন।'

সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম : 'নারায়ণপরাবেদা নারায়ণপরাক্ষরা। নারায়ণপরামুক্তিঃ নারায়ণপরাগতিঃ॥' ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম : 'রামনারায়ণান্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন॥' দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম : 'হরে মুরারে মধু-কৈটভারে। গোপালগোবিন্দ মুকুন্দশৌরে॥ যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণোবিষ্ণো। নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥' আর কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম : 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥'

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥
প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥

নিরবধি সবে জপ করে কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥
এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥'

এই জড়জগতে হরিনামই জীবের একমাত্র বন্ধু। যার কেউ নেই তার নাম আছে। নাম আছে মানেই নামী আছে। লোকে-অলোকে যদি কিছু দামী থাকে তবে এই নামীকে পাওয়া।

গারুড়ে বলছে, 'নামে সিংহত্রস্ত মৃগ রক্ষা পায়, অর্থাৎ হরিনাম পাপভীত জীবকে উদ্ধার করে। হরিনাম অখিলপাপের উন্মূলক।'

স্কান্দে বলছে, 'নামে সর্বব্যাধির বিনাশন। 'আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্তনাৎ তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহং'॥ নামাশ্রিতের সকল উপদ্রবই নামশমিত হয়।'

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলছে, নামকৃৎ ব্যক্তি মহাপাতক থাকলেও শুদ্ধান্তঃকরণ হয়ে যায়। তার কুলসঙ্গও পবিত্র হয়। 'মহাপাতক মুক্তোঽপি কীর্তয়ননিশং হরিং। শুদ্ধান্তঃকরণোভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ॥"

বৃহৎবিষ্ণুপুরাণে বলছে, 'নামপরায়ণব্যক্তির সমস্ত দুঃখের উপশম হয়ে যায়। 'সর্বরোগোপশমনং সর্বোপদ্রবনাশনং। শান্তিদংসর্বারিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্তনং॥"

বৃহন্নারদীয়ে বলছে, 'নামোচ্চণকারীর কলিবাধা থাকে না। 'হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং নহি তান বাধতে কলিঃ॥'

নারসিংহে বলছে, হরিনামশ্রবণে নারকীর উদ্ধার। ভাগবতে বলছে, হরিনামে প্রারব্ধকর্মের বিনাশ। 'বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাঙ্গতি প্রাপ্নোতি।' হরিনাম করলে আর বেদপাঠের দরকার হয় না,

'গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ।' দরকার হয় না তীর্থভ্রমণের। নামই তীর্থকোটিসহস্রাণি। হরিনামের বাইরে আর সৎকর্ম কী আছে? হরিনামই দান করতে পারে সর্বার্থ। হরিনামেই সর্বশক্তি নিহিত। আর হরিনামই সর্বজগতের আনন্দকর। 'জগৎ প্রহৃষ্যতে অনুরজ্যতে চ।'

যে নাম করে তাকে নাম জগদ্বন্দ্য করে। 'নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দন। ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্বত্রবন্দিতাঃ।'

নামই অগতির গতি, অনাথের নাথ, অকারণেব আশ্রয়। নামই জীবের পরম পুরুষার্থ। 'কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।'

এবার কলিধর্মকথা শোনো।

কলিতে বিত্তই মানুষের জন্ম, আচার ও গুণ নির্ধারণ করবে, বলই ধর্ম ও ন্যায় নিরূপণের হেতু হবে। 'বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ। ধর্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেব হি॥' পরস্পরের আকর্ষণ বা অভিরুচি হলেই বিবাহ হবে, কুলশীল আচারবিচার কিছুই বিবেচিত হবে না, শুধু মনোরথ শুধু ক্রয়-বিক্রয় শুধু রতি-আসক্তিই কার্যকর হবে। শুধু যজ্ঞসূত্রেই ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হবে। 'বিপ্রত্বে সূত্রমেব হি।' যে দরিদ্র সে বিচারালয়ে পরাজিত হবে। 'অবৃত্ত্যা ন্যায়দৌর্বল্যং।' আর যে বচনবাগীশ সেই পণ্ডিত বলে কীর্তিত হবে। 'পাণ্ডিত্যে চপলং বচঃ।' ধনহীনতা অসাধুতার পরিচায়ক হবে আর গর্বই হবে সাধুতার লক্ষণ। 'সাধুত্বে দম্ভ এব তু।' যশের লোভে ধর্মসাধন করবে। 'যশোঽর্থে ধর্মসেবনম।' কুটুম্বভরণই হবে দক্ষতার মানদণ্ড। পৃথিবী এমনিধারা দুষ্টপ্রজাকীর্ণ হলে যে বলবত্তম সেই রাজা হবে। 'যো বলী ভবিতা নৃপঃ।' রাজা লুব্ধ ও নির্দয় দস্যুর মত ব্যবহার করবে, প্রজার স্ত্রী ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করে বেড়াবে। গিরিকাননে আশ্রয় নেবে প্রজারা, ফল মূল শাক পাতা খেয়ে থাকবে, অনাবৃষ্টিহেতু দুর্ভিক্ষে বিনষ্ট হবে। 'অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ।' শীত বাত রৌদ্র বর্ষা তো আছেই,

পরস্পর বিবাদে—ক্ষুধা তৃষ্ণা ব্যাধি তো আছেই, অধিকন্তু চিন্তাদহনে প্রপীড়িত হবে। 'সন্তপ্স্যন্তে হি চিন্তয়া।' মানুষ মোটে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত আয়ু পাবে। 'ত্রিংশ দ্বিংশতি বর্ষানি পরমায়ুঃ কলৌ।' শরীর ক্ষীণ হবে, ব্যবহার দাঁড়াবে চৌর্য মিথ্যা ও বৃথা হিংসা। ওষধিও ক্ষীণগুণ হবে, মেঘ বিদ্যুৎভূয়িষ্ঠ হবে, আর গৃহ শূন্যপ্রায় হবে। ধর্মে পাষণ্ডরাই বেশি প্রতিপত্তি করবে, 'পাষণ্ড-প্রচুরে ধর্মে।' সমস্ত বেদপথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আরো শোনো :

সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল—সত্য দয়া তপস্যা ও দানই ছিল ভিত্তি। তাই তখনকার লোকেরা প্রায়ই সন্তুষ্ট দয়ালু মৈত্রীসম্পন্ন শান্ত দান্ত ক্ষমাবান আত্মারাম সমদর্শী ও আত্মাভ্যাসযুক্ত ছিল। ত্রেতায় ধর্মের এক পদ স্খলিত হয়, তাই তখন লোকে মিথ্যা, হিংসা ও কলহে রত হয়। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে ও তপেজপে আগ্রহ জন্মায়। দ্বাপরে —মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ—অধর্মের চার পায়ই দেখা দেয়। তাতে ধর্মের চার পা-ই নিস্তেজ হয়ে আসে। কলিতে ধর্মের তিনটি পা-ই খসে যাবে, বাকিটাও অধর্মের স্ফীতিতে ক্ষীণীকৃত হয়ে আসবে। তখন ছল মিথ্যা আলস্য নিদ্রা হিংসা দুঃখ শোক মোহ ভয় ও দৈন্যই রাজত্ব করবে। মানুষ ক্ষুদ্রদৃষ্টি অল্পভাগ্য অথচ আহারে অতিকামী হবে আর স্ত্রীরা স্বৈরিণী হবে। জনপদ দস্যু-পরিপূর্ণ ও বেদ পাষণ্ডকলুষিত হবে, রাজারা প্রজার শোণিত শোষণ করবে ও ব্রাহ্মণেরা শিল্প ও উদরেই মনোযোগ দেবে। 'দস্যুৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ। রাজানশ্চ প্রজাভক্ষাঃ শিশ্নোদর-পরা দ্বিজাঃ॥' ব্রহ্মচারীরা অব্রত ও অশৌচ হবে, গৃহস্থ ভিক্ষুক হবে, তপস্বীরা বন ছেড়ে গৃহে ফিরবে আর সন্ন্যাসীরা অর্থলোলুপ হবে। রমণীরা খর্বাকার হবে, বেশি খাবে, বহু সন্তানবতী হবে ও লজ্জার ধার ধারবে না। 'হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ।' বণিকেরা নীচাশয় প্রবঞ্চক হয়ে ক্রয়বিক্রয় করবে। অখিলোত্তম

হয়েও যদি প্রভু নির্ধন হয় ভৃত্য তার সেবা করবে না, যেমন নিষ্দুগ্ধা হলে গাভীকে ত্যাগ করবে প্রভু। মানুষের প্রীতি ও মমতা সুরত-চালিত হবে, স্ত্রৈণতা ও দীনতা বাড়বে আর পিতা ভ্রাতা বন্ধু ও জ্ঞাতিদের বর্জন করে স্ত্রী ও তার ভাই-বোনদের সঙ্গে মন্ত্রণা করবে। 'পিতৃভ্রাতৃ সুহৃদজ্ঞাতীন হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ। নন্দান্দৃশ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ॥' প্রজারা অন্নাভাবে ও অনাবৃষ্টির ভয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন মনে অবস্থান করবে ও দুর্ভিক্ষে ও রাজকরে নির্যাতিত হবে। 'নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্শিতাঃ। নিরন্নে ভূতলে রাজন, অনাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ॥' যাঁকে স্মরণ করলে অমোঘ কল্যাণ ঘটে সেই চরাচরের গুরু অচ্যুত ভগবানকে কেউ স্মরণ করবে না।

কলিযুগ অশেষ দোষের আকর হলেও তার এক মহৎ গুণ আছে —মানুষ কৃষ্ণনামকীর্তনের ফলে মুক্তবন্ধন হয়ে পরম পুরুষকে পেতে পারে। 'কলের্দোষনিধেঃ রাজন অস্তি হ্যেকো মহানগুণঃ। কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।' যখন ভগবান পুরুষোত্তম চিত্তে অধিষ্ঠিত হন তখন মানুষের সমস্ত কলিকৃত দোষ দূরীকৃত হয়। হৃদিস্থিত ভগবান শ্রুত, কীর্তিত, চিন্তিত, পূজিত বা আদৃত হলে মানুষের দশ হাজার বছরের অশুভ নাশ করে থাকেন। 'ধুনোতি জন্মাযুতাশুভম।' যেমন আগুন সুবর্ণের ধাতুজ দুর্বর্ণ দূর করে তেমনি হৃদিস্থিত বিষ্ণু যোগীদের অশুভ বাসনা নাশ করেন। ভগবান হৃদিস্থিত হলে অন্তরাত্মা যেমন অত্যন্তশুদ্ধি লাভ করে, দেবতার উপাসনা তপস্যা প্রাণায়াম ব্রত দান জপ বা তীর্থস্নানে তেমনি পাওয়া যায় না। সুতরাং কায়মনোবাক্যে হরিকে হৃদয়ে ধারণ করো, ম্রিয়মাণ জনও তাঁতে মন ধারণ করলে পরমাগতি লাভ করে। 'তস্মাৎ সর্বাত্মনং রাজন হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।' সত্যযুগে ধ্যানে যে ফল, ত্রেতায় যে ফল যজ্ঞে, দ্বাপরে যে ফল পূজায় বা পরিচর্যায়, কলিতে সেই ফল শুধু হরিকীর্তনে।

নাম করো। নাম করতে-করতেই মোহন বেণুরব শুনতে পাবে। বেণুধ্বনি অনুসরণেই পেয়ে যাবে বংশীধরকে।

'কাঁহা সে মুরলীধ্বনি নবাভ্রগর্জিত জিনি
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি ধায় ব্রজজন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার॥'

কোথায় কৃষ্ণের সেই মুরলীধ্বনি যার মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের কাছে নবীন মেঘের গর্জনও পরাভূত। সমস্ত জগৎকে সবলে আকর্ষণ করে কৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসে। আর ব্রজজনের কথা কী বলব? মেঘ-গর্জন শুনে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনায় পিপাসার্ত চাতক যেমন ছোটে তেমনি কৃষ্ণের বাঁশি শুনে কৃষ্ণদর্শনলালসায় ব্রজাঙ্গনারা ধাবিত হয়। কতক্ষণে কৃষ্ণকে দেখব, কতক্ষণে তার কান্তিসুধাধারা পান করব?

বিশাল আকাশে জলধরমালা অবাধে বিচরণ করে কিন্তু কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে তাদের গতি বারে বারে স্তম্ভিত হয়, গন্ধর্ব বিদ্যাগুরু তুম্বুরুর ধ্যান ভেঙে যায়, ব্রহ্মা বিস্মিত হয়, পাতালে বসে বলি তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য হারিয়ে চটুল হয়ে ওঠে, অন্যে পরে কা কথা। মহাস্থির বাসুকীর মাথাও ঘুরে ওঠে, ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভেদ করে সে ধ্বনি অনন্ত কোটি বিশ্বে ঘুরে বেড়ায়।

বেণুনাদবিনোদ ব্রজগোপালের বংশীধ্বনি মানুষের ইতর বাসনা ভুলিয়ে তাঁরই চরণসমীপে টেনে নিয়ে আসে, বেদবাণীগুলিকে প্রস্ফুট করে মুখরিত করে তোলে, তরুলতাগুলিকে সরসায়িত করে দেয়। তার স্পর্শে পাষাণ বিদ্রাবিত হয়, পশুপাখি আনন্দ নিমগ্ন হয়, গোপগণ পুলকোচ্ছল হয়ে ওঠে। মুনিদের ধ্যাননিষণ্ণ চিত্ত আনন্দে মুকুলিত হয়, সপ্তস্বর সম্প্রকাশিত ও সম্প্রসারিত হয়, যোগীদের যোগ-সিদ্ধির ফল যে ওঙ্কার তাই কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে। গোবিন্দের বংশীনাদই ওঙ্কারের পরিপূর্ণ বিকাশ। 'শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্ত মুখাম্বুজে।'

নাম করতে-করতে বাঁশি বাজবে, নাম বৈখরী পেরিয়ে অনাহতে উত্তীর্ণ হবে। তখন হৃদয়তন্ত্রীতে নিরন্তর নাম হতে থাকবে। তখন সেই ধ্বনি বা নাদ থেকে জ্যোতির আবির্ভাব হবে। নাদজ্যোতি সেই পরম ঈপ্সিতের অগ্রদূত হয়ে আসবে। তারপর কৃষ্ণ এসে দেখা দেবেন, জড়াবেন বাহুপাশে।

'প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ
দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকুণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু॥'

স্নিগ্ধ বেণুধ্বনিতে সঙ্কেতস্থান জানাবার সঙ্গে সঙ্গে হে স্মিতাক্ষী দ্রুত পায়ে কুঞ্জে হরির পার্শ্বে চলে এলে, নত আস্যে স্পর্শ করলে শ্রবণ-কুহর। হে শ্রেয়সী কৃষ্ণপ্রেয়সী, কবে তোমার নিজ দাস্যে আমাকে স্নান করাবে?

ভগবানে, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তা অহৈতুকী, তাই অপ্রতিহতা, আর তাইতেই আত্মার সুপ্রসাদ। ভগবানের কৃপা-বাতাসে গুরুকে কর্ণধার করে মানবশরীররূপ তরণী পেয়ে যে পুরুষ ভবসিন্ধু পার না হয় সে আত্মঘাতী। কৃষ্ণচরণে উপস্থিতিই মানব-জন্মের কর্তব্য যেহেতু কৃষ্ণই সর্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ।

গভীর বেগবিশিষ্ট কাল যেমন সর্বত্র দুঃখ আনছে তেমনি তা কর্মীর প্রাপ্য জড়সুখও এনে দিচ্ছে, তার জন্যে যত্নের প্রয়োজন কী? ভক্তের যে দুঃখ তাও ভগবৎপ্রেমেরই সম্বর্ধক। ভগবানের দেওয়া দুঃখ ভক্তের পক্ষে আনন্দের সমতুল। ভক্তের আর্তি ভগবৎপ্রীতি-ব্যাকুলতা ছাড়া কিছু নয়। আর এই প্রীতির আস্বাদনেই ভক্তের সর্বদুঃখবিস্মরণ।

'না জানি আপন দুখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।

মোরে যদি দিয়া দুখ তাঁর হৈল মহাসুখ
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য ॥'

নামই ভক্তের সমস্ত দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। নামেই সর্বশক্তি সর্বশোভা সর্বস্ফূর্তি সর্বস্বস্তি। 'স্বস্তি নো গৌরবিধুর্দধাতু।' নামই আমাদের নিত্যানন্দে অবস্থিত করতে পারে। নামই অখিলরসময়। আর তার শুধু একমাত্র পথ। সে পথ ভক্তির, প্রপত্তির, শরণাগতির 'মামেকং শরণং ব্রজ।' দুঃখ-সুখের পথ নয়। শুদ্ধা রতি, চিৎ-রতির পথ।

হে উদ্ধব, তুমি আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি স্নেহমমতা ত্যাগ করো। সমস্ত হৃদয়-মন আমাতেই ঢেলে দাও। মদ্‌গত চিত্তে সর্বত্র বিচরণ করো, কোথাও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটবে না। যারা আমাতে শরণাগত তারাই দুরত্যয়া মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে। 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

'বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।' যার কৃষ্ণে, সেই দিব্যকিশোর-মূর্তিতে শুদ্ধ ভক্তির উদয় হয়েছে, তাকে সেবা করবে বলে মুক্তি মুকুলিতাঞ্জলি হয়ে বসে থাকে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত তার দিকে ফিরেও তাকায় না। আর ধর্ম, অর্থ, কামও অনুরূপ সেবার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে, তাকেও শুদ্ধ ভক্ত অগ্রাহ্য করে। কর্মীর প্রার্থনীয় ধর্মার্থকাম ও জ্ঞানীর স্পৃহনীয় মোক্ষ—দুইই ভক্তের কাছে অকিঞ্চিৎ।

জ্ঞানীযোগীদের মৃগ্য কৈবল্যসুখ শুদ্ধ ভক্তের কাছে নরকতুল্য। 'কৈবল্যং নরকায়তে।' কর্মীর লোভনীয় ইন্দ্রপুরীর ঐশ্বর্য শুদ্ধ ভক্তের কাছে অবাস্তব আকাশকুসুম। যার গৌরাঙ্গসুন্দরে প্রেম হয়েছে তার আর পতনভয় নেই, মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষের এমনি প্রভাব।

তাই সর্বপ্রকার জ্ঞানীর চেয়ে শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়তর। শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের কাছে প্রিয়তর। প্রেমনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে ব্রজগোপীরা আরো বেশি প্রিয়। আর গোপীমণ্ডলীর

মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই প্রিয়তমা। রাধিকার দাস্যই আমাদের প্রার্থনীয়।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেই অচিন্ত্যগুণস্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে হৃদয়ে দর্শন করি।

৮৭

প্রেমমূর্তি রাধা যেমন কৃষ্ণময়ী, প্রেমবিগ্রহ কৃষ্ণও তেমনি রাধাময়।

'রাধা পুরঃ স্ফুরতি মে পশ্চিতশ্চ রাধা
রাধাধিসব্যমিহ দক্ষিণতশ্চ রাধা।
রাধা খলু ক্ষিতিতলে গগনে চ রাধা
রাধাময়ী মম বভুব কুতস্ত্রিলোকী॥'

আমার সামনে রাধা পিছনে রাধা বাঁয়ে রাধা ডাইনে রাধা মাটিতে রাধা আকাশে রাধা। সমস্ত ত্রিভুবনই আমি রাধাময় দেখছি কেন?

'চিদচিল্লক্ষণং সর্বং রাধাকৃষ্ণময়ং জগৎ।' জগতের সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তুই রাধাকৃষ্ণময়। সমস্তই তাঁদের বিভূতি। 'বিনা তাভ্যাং ন কিঞ্চন।' রাধাকৃষ্ণ ছাড়া কিছুই নেই।

কৃষ্ণ যেমন ত্রিতত্ত্বস্বরূপ, কৃষ্ণবল্লভা রাধিকাও তেমনি ত্রিতত্ত্বরূপিণী। কৃষ্ণ যেমন প্রকৃতির অতীত তাঁর শক্তিরূপা রাধাও তেমনি প্রকৃতির অতীত। 'বিনারাধা প্রসাদেন কৃষ্ণপ্রাপ্তির্নজায়তে।' রাধার কৃপা ছাড়া কৃষ্ণলাভ অসম্ভব। সুতরাং কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি রাধাঠাকুরাণীর দাস্য নাও। কৃষ্ণকে ভজনা করলে অথচ তার ভক্তকে সেবা করলে না, এ উষরে শস্যরোপণ। সমস্ত আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ। আবার বিষ্ণুর আরাধনার চেয়ে বিষ্ণুভক্তের

আরাধনা শ্রেষ্ঠতর। 'মম ভক্তা হি যে পার্থ ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ। মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥' রাধিকাই ভক্তশ্রেষ্ঠ, ভক্তমুকুটমণি। 'কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী।' গোবিন্দমোহিনী, রসিকানন্দা।

'যথা ক্ষীরেষু ধাবল্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা।
ভুবি গন্ধো জলে শৈত্যং তথা কৃষ্ণে স্থিতি তব॥'

যেমন ক্ষীরে ধবলতা, আগুনে দাহ, মাটিতে গন্ধ, জলে শৈত্য, তেমনি কৃষ্ণে রাধা। সূর্যের আলো ছাড়া যেমন সূর্যকে দেখা যায় না, তেমনি রাধার কৃপা ছাড়া কৃষ্ণসাক্ষাৎকার অসম্ভব। রাধাই কৃষ্ণচন্দ্রাধিদেবতা।

অর্জুনকে বলছেন কৃষ্ণ: অর্জুন, স্বর্গ মর্ত আর পাতাল এই ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, যেহেতু তাতে বৃন্দাবন বর্তমান আর বৃন্দাবনের মধ্যে গোপীরাই ধন্যা আর তাদের মধ্যে রাধা নাম্নী গোপিনীই ধন্যতমা। রাধিকাই আমার আনন্দোচ্ছলিতা শক্তি।

কৃষ্ণ রাগ, রাধা রতি। কৃষ্ণ সূর্য, রাধা প্রভা। কৃষ্ণ শশাঙ্ক, রাধা অনপায়িনী কান্তি। কৃষ্ণ সমুদ্র, রাধা বেলাভূমি। কৃষ্ণ দ্রুম, রাধা লতা। কৃষ্ণ দিন, রাধা রাত্রি। কৃষ্ণ লোভ, রাধা তৃষ্ণা। কৃষ্ণ ধ্বজ, রাধা পতাকা। কৃষ্ণ ভগবান, রাধা ভক্ত।

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রোহঃ॥'

ভগবান শ্রীহরি নিশ্চয়ই এই রমণী কর্তৃক আরাধিত হয়েছেন যার জন্যে গোবিন্দ প্রীত হয়ে আমাদের পরিত্যাগ করে একে এ নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছেন। অথবা,

'অত্রোবাবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া॥'

এখানে বসে সে রমণী কৃষ্ণকর্তৃক পুষ্পভূষণে অলঙ্কৃতা হয়েছে যেহেতু অন্য জন্মে এর দ্বারা সর্বাত্মা বিষ্ণু অভ্যর্চিত হয়েছিলেন।

রাধাই কৃষ্ণের মূর্তিমতী আরাধনা। রাধাই কৃষ্ণসারস্বরূপা, রাধাই কৃষ্ণের সর্বশক্তিবরীয়সী হ্লাদিনী। 'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।' রাধাই কৃষ্ণের সমস্ত বাসনাপূর্তি। 'কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে ॥'

রা আর ধা নিয়ে রাধা। 'রা শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ। ধা শব্দোচ্চারণাৎ পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ ॥' রা শব্দের উচ্চারণেই কৃষ্ণ উল্লসিত হন আর ধা শব্দ উচ্চারণমাত্রই কৃষ্ণ সাগ্রহে উচ্চারণকারীর পশ্চাদ্ধাবন করেন।

'রা শব্দোচারণভক্তো রাতি মুক্তিং সুদুর্লভাং। ধাশব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদম ॥' রা শব্দের উচ্চারণেই ভক্ত মুক্তি লাভ করে আর ধা শব্দ উচ্চারণমাত্রই হরির পাদপদ্মে প্রধাবিত হয় ॥

'রা শব্দং কুর্ব্বতস্ত্রস্তো দদামি ভক্তিমুত্তমাং। ধা শব্দং কুর্ব্বতঃ পশ্চাদ যামি শ্রবণলোভতঃ।' রা শব্দের উচ্চারণে আমি উত্তমা ভক্তি দান করি, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর ধা শব্দ উচ্চারিত হওয়া মাত্রই আমি সেই নাম শোনবার লোভে উচ্চারণকারীর পশ্চাদনুসরণ করি।

রাধা নামের র কৃষ্ণপদাম্বুজে নিশ্চলা ভক্তি ও দাস্য দিয়ে সর্বেপ্সিত সদানন্দ ও সর্বসিদ্ধিপ্রদ প্রীতি নিয়ে আসে, আর ধ-তে শ্রীহরির সমান ঐশ্বর্য লাভ করিয়ে নিত্যকাল তাঁর সঙ্গে একত্রবাসের অধিকার দেয়। আর দুই আ-কার জীবের তেজবৃদ্ধি করে আর নিরন্তর হরিস্মৃতিতে মগ্ন করে রাখে।

আবার বলছে : রাধা নামের র জীবের কোটিজন্মার্জিত পাপ ও শুভাশুভকর্মভোগ বিনষ্ট করে। আ-কার দূর করে ব্যাধি, মৃত্যু ও গর্ভবাসের যন্ত্রণা। ধ আয়ুবৃদ্ধি করে আর আ-কার ঘুচিয়ে দেয় ভববন্ধন। সুতরাং রাধা-নামের শ্রবণে-স্মরণে কীর্তনে-উচ্চারণেই কৃষ্ণনিত্যানন্দ।

যে রাধানাম স্মরণকীর্তন করে তার সর্বতীর্থ ভ্রমণের ফল হয় আর তার সর্ববিদ্যা অধীত হয়ে যায়। অনুদিন রাধানাম করবার সৌভাগ্য ঘটলে কোটি সাধনও পরিত্যাজ্য হয়ে যায়। রাধপদকমলসুধা নীরাজন করে কোটি সৎপুরুষার্থকেও তুচ্ছজ্ঞান করা যায়। রাধা-পাদাব্জলীলাভূমি বৃন্দাবনে কোটি আনন্দমন্দার বিরাজমান আর রাধাকিঙ্করীদের চরণে কোটি অদ্ভুত সিদ্ধি বিলুণ্ঠিত। রাধার চরণরেণু অনন্তশক্তিসম্পন্ন চূর্ণৌষধির মত পরমপুরুষ কৃষ্ণকে বশীভূত করে, সেই চরণরেণুই আমার অনুস্মরণীয়। যে মহাসুখকর নাম কৃষ্ণ প্রেমভরে স্মরণ করেন, জপ করেন, সখীসঙ্গে গান করেন, অশ্রুসিক্ত হয়ে চিন্তা করেন, সেই অমৃতময় রাধানামই আমার জীবন। সেই রাধানামই আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হোক।

হে রাধে, যে তোমার নামামৃত একবার গ্রহণ করে তোমার প্রেমাবিষ্ট কৃষ্ণ তার কোনো অপরাধই আর গণনার মধ্যে আনেন না, বরং তাকে কী অমূল্য উপহার দেওয়া যায় তারই চিন্তা করেন। সুতরাং, তোমার দাস্যে যে একান্তচিত্ত হয়েছে তার মহিমার কে বর্ণনা দেবে? 'স্নপয়তি নিজ দাস্যে রাধিকা মাং কদানু।'

তাই রাধাকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণ নেই। রাধাকৃপা ছাড়া কৃষ্ণকৃপা মিলবেনা। ভক্তসেবা বাদ দিয়ে মিলবেনা কৃষ্ণের প্রসন্নতা।

অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেণু
মনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীর চিত্তান
কুতঃ শ্যামসিন্ধো রসস্যাবগাহঃ॥'

'রাধিকাচরণ-পদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধাপদাঙ্কিতধাম বৃন্দাবন যার নাম
তাহা যে না আশ্রয় করিল॥

রাধিকা-ভাবগম্ভীর চিত্তে যে বা মহাধীর
গণ সঙ্গ না কৈল যতনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ রসসিন্ধুস্নানানন্দ
লভিবে বুঝহ এক মনে॥'

যে রাধাপাদপদ্ম অনাদর করে শুধু গোবিন্দভজনে ইচ্ছুক হয়, যে রাধারিক্ত একক গোবিন্দে রতি করে সে মূঢ়মতি দাম্ভিক ছাড়া আর কিছু নয়। সে ছলধর্মী সে বিষ্ণুবঞ্চক। তাই কৃষ্ণ নারদকে বলছেন, 'সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব পুনঃ পুনঃ। বিনারাধা-প্রসাদেন মৎপ্রসাদো ন বিদ্যতে। 'রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে। রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ববেদে বলে।'

'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তবে অকারণে গেলা॥
আতপরহিত সূরয নাহি জানি।
রাধাবিরহিত মাধব নাহি মানি॥'

আবার কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে রাধা নেই। রাধিকাই কৃষ্ণমেঘনিকষে বিদ্যুৎপ্রিয়া। কৃষ্ণময়ী বলেই শ্রীমতী। 'মাধবাতিবশা লোকে মাধবী মাধবপ্রিয়া।' মাধবকে প্রেমে অতিশয়রূপে বশীভূত করেছে ও নিজেই আবার মাধবের অত্যন্ত বশীভূত হয়ে মাধবী ও মাধবপ্রিয়া নাম নিয়েছে। কৃষ্ণের চিদঘনবিগ্রহধারিণী লীলারাজ্যবিজয়িনী, মূর্তিমন্মাধুরীঘটা।

রাধা তো চোখই মেলবেনা পাছে কৃষ্ণদর্শন না হয়।

'শুন গো মরম সই।
যখন আমার জনম হইল
নয়ন মুদিয়া রই॥
দিত ক্ষীর সর জননী আমার
নয়ন মুদিত দেখি।

জননী আমার　　করে হাহাকার
　　কহিল সকলে ডাকি ॥
শুনি সেই কথা　　জননী যশোদা
　　বঁধুকে লইয়া কোরে
আমারে দেখিতে　　আইল তুরিতে
　　সূতিকা-মন্দির-দ্বারে ॥
দেখিয়া জননী　　কহিলেন বাণী
　　এই কি ছিল কপালে।
করিয়া সাধনা　　পেলাম অন্ধ কন্যা
　　বিধি এত দুঃখ দিলে ॥
উঠ উঠ বলে　　করে ধরি তুলে
　　বসায় যতন কোরে।
হেনই সময়ে　　মায়ে তেয়াগিয়া
　　বঁধু পরশিল মোরে ॥
গায়ে দিলা হাত　　মোর প্রাণনাথ
　　অন্তরে বাঢ়ল সুখ।
হাসিয়া কান্দিয়া　　আঁখি প্রকাশিয়া
　　দেখিনু বঁধুর মুখ ॥'

রাধা রাসেশ্বরী রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী। বৃন্দাবনে পরিপূর্ণতমা সতী। নারদকে বলছেন, আমিই ললিতা, আমিই নিত্যকামকলাত্মক বাসুদেব। আমিই সত্যিকার যোষিৎস্বরূপ, আমিই সনাতনী রমণী। আমিই পুরুষদেহে শ্রীকৃষ্ণ। সত্যি সত্যি বলছি, 'আবয়োরন্তরং নাস্তি,' আমাতে শ্রীকৃষ্ণে কোনো প্রভেদ নেই। কৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ আর আমি আশ্রয়-বিগ্রহ। আশ্রয় না পেলে বিষয় দাঁড়াবে কোথায়? আর বিষয় নেই তো আশ্রয় নিরর্থক হয়ে যাবে। তাই কৃষ্ণ রাধারমণ আর আমি কৃষ্ণরমণী। এই দুয়ে মিলে পূর্ণ ভগবত্তা।

আবার কৃষ্ণ বলছে :

'পূজা রাধা জপে রাধা রাধিকা চাভিবন্দনে।
শ্রুতৌ রাধা স্তুতৌ রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥
জিহ্বাগ্রে রাধিকা নাম নেত্রাগ্রে রাধিকা তনুঃ।
কর্ণাগ্রে রাধিকা কীর্তিমনোগ্রে রাধিকা মনুঃ ॥
রাধা রসসুধাসিন্ধু রাধা সৌভাগ্যসুন্দরী।
রাধা ব্রজাঙ্গনা মুখ্যা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥'

রাধাই আমার পূজনীয়া মননীয়া স্তবনীয়া বন্দনীয়া। রাধাই আমার আরাধনার বস্তু। রাধানামই আমার কীর্তনীয়, রাধাবিগ্রহই আমার দর্শনীয়, রাধাযশই আমার শ্রবণীয়, রাধাকথাই আমার চিন্তনীয়। রাধাই আমার রসামৃতবারিধি, আমার সৌভাগ্যসুন্দরী ও ব্রজাঙ্গনাপ্রধানা। রাধাই আমার একমাত্র আরাধনার বস্তু।

'কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥'

কংসারি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সারভূতবাসনার শৃঙ্খলস্বরূপা রাধাকে হৃদয়ে ধারণ করে অন্যান্য ব্রজসুন্দরীকে ত্যাগ করলেন। রাসলীলা একমাত্র রাধিকার দ্বারাই সম্ভব, আর সমস্ত এহো বাহ্য। 'কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণ প্রাণধন। তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥' 'মমেষ্টা হি সদা রাধা।' 'ন রাধিকা সমা নারী।' 'দ্বিতীয়া কা মমাপরা।'

'রাধিকা-চরণ রেণু ভূষণ করিয়া তনু
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকাচরণাশ্রয় করে যেই মহাশয়
তারে মুঞি যাঙ বলিহারি ॥
জয় জয় রাধানাম বৃন্দাবন যাঁর ধাম
কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি।

হেন রাধাগুণগান না শুনিল মোর কান
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তাঁর ভক্ত সঙ্গে সদা রাসলীলা প্রেমকথা
যে করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই তার কভু সিদ্ধি নেই
নাহি যেন শুনি তার নাম ॥
কৃষ্ণনামগানে ভাই রাধিকা চরণ পাই
রাধানামগানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিল কথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
দুঃখময় অন্য কথা দ্বন্দ্ব ॥'

তাই রাধাও বলবে, কৃষ্ণও বলবে। রাধাকৃষ্ণ নামই আমাদের নিত্য উপাস্য। 'উপাস্য মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান। শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগলরাধাকৃষ্ণনাম।'

'রাধানামসুধাযুক্তং কৃষ্ণনামরসায়নম।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ব্যাধিভিশ্চ ন বাধ্যতে ॥
যশ্চোচ্চৈরুচ্যতে রাগৈঃ রাধাকৃষ্ণপদদ্বয়ম।
বামে চ দক্ষিণে তস্য রাধাকৃষ্ণেনানুধাবতি ॥
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো রাধাকৃষ্ণেতি কীর্তয়ন।
সুখেন প্রেমসম্পত্তিং লভতে হ্যাশু বৈষ্ণবঃ ॥
রাধাকৃষ্ণ মহামন্ত্রং যো জপেদ্ভক্তি-মুক্তিদম।
অন্তকালে ভবেত্তস্য রাধাকৃষ্ণেতি সংস্মৃতিঃ ॥'

প্রভাতে গাত্রোত্থান করে যে রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করে তার ব্যাধি হয় না, যে সপ্রেমে উচ্চারণ করে তার দক্ষিণে-বামে রাধাকৃষ্ণ সর্বদা অবস্থান করেন। রাধাকৃষ্ণ নামকীর্তনে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি ঘটে, আর সদ্য সদ্য প্রেমসম্পত্তি লাভ করা যায়। ভক্তিমুক্তি-প্রদ রাধাকৃষ্ণনাম কীর্তন করলে মৃত্যুকালে রাধাকৃষ্ণস্মৃতি জাগ্রত হয়।

জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কী? রাধাকৃষ্ণপ্রেম। শ্রেষ্ঠ গান কী? যে গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রকাশিত। শ্রেষ্ঠ ধ্যান কী? রাধাকৃষ্ণচরণাম্বুজধ্যান। শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কী? রাধাকৃষ্ণপ্রেমকেলিই কর্ণরসায়ন। আর শ্রেষ্ঠ উপাস্য কী? দেহ-দেহী নাম-নামী অভেদ বলে রাধাকৃষ্ণ নামই শ্রেষ্ঠ উপাস্য। 'যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধা চ যা রাধা কৃষ্ণ এব সঃ। এবং জ্যোতির্দ্বিধা ভিন্নঃ রাধামাধবরূপকম॥'

'রাধেতি নাম নবসুন্দরসীতমুগ্ধং কৃষ্ণেতি নাম মধুরাদ্ভুতগাঢ়দুগ্ধম। সর্বক্ষণং সুরভিরাগহিমেন রম্যং কৃত্বা তদেব পিব মে রসনে ক্ষুধার্তে।' রাধা এই নাম নবীন সজীব অমৃতমনোমোহন আর কৃষ্ণ এই নাম মধুর চমৎকার গাঢ়দুগ্ধ—হে ক্ষুধিত রসনা, সুরভি অনুরাগের হিমে রমণীয় করে তা সর্বক্ষণ পান করো।

রাধাকে বলছেন কৃষ্ণ, 'ত্বং মে প্রাণাধিকা তব প্রাণাধিকোঽপ্যহম। ন কিঞ্চিদাবয়োর্ভিন্নং একাঙ্গং সর্বদৈব হি॥' তুমিই আমার প্রাণাধিকা আর আমিই তোমার প্রাণাধিক। আমাদের মধ্যে কিছু ভেদ বা ব্যবধান নেই। আমরা একাঙ্গ, আমরা একীভূত। আমি বিষয়-ভগবান তুমি আশ্রয়-ভগবান। বিষয়বিগ্রহ আমি স্বয়ংরূপ ভগবান, তুমি আশ্রয়বিগ্রহ স্বয়ংরূপা ভগবতী। 'দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ।'

'যুগল চরণে প্রীতি করব আনন্দ তথি
রতি প্রেম হউ পরবন্ধে।
কৃষ্ণনাম রাধানাম উপাসনা রসধাম
চরণে পড়িয়া পরানন্দে॥'

'সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই। রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥' রাধিকা কৃষ্ণপ্রণয়ের বিকারস্বরূপা অর্থাৎ গাঢ়তম অবস্থা বা মহাভাবস্বরূপা। সেইহেতু কৃষ্ণের হ্লাদিনী বা আনন্দ-দায়িনী শক্তি। শক্তিমান ও তার শক্তি অভেদ বলে রাধা আর কৃষ্ণ একাত্মা, কিন্তু একাত্মা হয়েও অনাদিকাল থেকেই গোলোকে পৃথক

দেহ ধরে আছেন। অধুনা কলিযুগে সেই দুই দেহ একীভূত হয়ে শ্রীচৈতন্যনামে প্রকট হয়েছেন। তাই রাধাভাবকান্তিগঠিত কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

রাধায়িত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণায়িত রাধাই শ্রীগৌরাঙ্গ।

৮৮

'বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকং পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
অবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥'

বৈরাগ্যবিদ্যা ও স্বীয় ভক্তিযোগ শেখাবার জন্যে এক করুণাসিন্ধু পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, আমি তাঁর শরণ নিই। কালপ্রভাবে ভক্তিযোগ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাই আবার প্রচার করবার জন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম নিয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর চরণপদ্মে আমার মনমধুকর প্রগাঢ় রূপে রসাসক্ত হোক।

এই শ্লোক দুটি তালপত্রে লিখে সার্বভৌম ভট্টাচার্য দিয়েছিলেন জগদানন্দকে, প্রভুকে দেবার জন্যে। প্রথমে সার্বভৌম গৌরহরিকে বিষ্ণুর অবতার বলে মানতে চাননি, মেনেছিলেন মাত্র মহাভাগবত বলে। এখন নিষ্কুণ্ঠে স্বীকার করলেন: একঃ পুরাণঃ পুরুষঃ। সর্ব-কারণকারণ।

'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥'

হে অনন্তরূপ, তুমিই আদি দেব, তুমিই অনাদি পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়স্থান। তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই পরম ধাম। সমস্ত বিশ্ব তোমাতেই ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

সার্বভৌম গৌরহরির আরো বন্দনা করলেন :

'উজ্জ্বলবরণগৌরবরদেহং।
বিলসতি নিরবধি ভাববিদেহং।
ত্রিভুবনপাবন কৃপয়ালেশং
তং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ং ॥
নিন্দিত অরুণ কমলদলনয়নং
আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলং।
কলেবর কৈশোর নর্তক বেশং
তং প্রণমামি শ্রীশচীতনয়ং ॥
হরিভক্তিপরং হরিনামধরং
করজপ্যকরং হরিনামপরং।
নয়নে সততং প্রেমসংবিশতং
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং ॥
যুগধর্মযুতং পুন র্নন্দসুতং
বদনে স্খলিতং স্বনাম মধুরং
কুরুতে সুরসং জগতজ্জীবনং
প্রণমামি শচীসুতগৌরবরং ॥'

জড়শশধর রাহুগ্রস্ত হলে চিৎশক্তিপ্রকটিততনু চিন্ময় গৌরহরি ফাল্গুনপূর্ণিমার প্রদোষে শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হলেন।

'অঙ্গীকুর্ব্বন নিজসুখকরীং রাধিকাভাবকান্তিম
মিশ্রাবাসে সুললিতবপু র্গৌরবর্ণো হরির্যঃ।
পল্লীস্ত্রীণাং সুখমভিদধৎ খেলয়ামাস বাল্যে
বন্দেঽহং তং কনকবপুষং প্রাঙ্গণে রিঙ্গমানম॥'

রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে সুললিতদেহ যে গৌরবর্ণ হরি জগন্নাথমিশ্রের ভবনপ্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিয়ে বাল্যে খেলা করে দের আনন্দবর্ধন করেছিলেন সেই কনককান্তিময়কে বন্দনা ব...

'তীর্থভ্রামিদ্বিজকুলমণের্ভক্ষয়ন পক্কমন্নম্
পশ্চাত্তং যো বিপুলকৃপয়া জ্ঞাপয়ামাস তত্ত্বম।
স্কন্ধারোহীচ্ছলবহুতয়া মোহয়ামাস চৌরৌ
বন্দেঽহং তং সুজনসুখদং দণ্ডদং দুর্জনানাম॥'

তৈর্থিক ব্রাহ্মণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ জগন্নাথমিশ্রের ঘরে অতিথি হয়ে কৃষ্ণকে অন্নার্পণ করলে যিনি তা ভক্ষণ করেছিলেন ও প্রভূত কৃপাপরবশ হয়ে নিজতত্ত্ব জানিয়েছিলেন এবং দুই চোরের কাঁধে উঠে তাদের ছল করে মোহিত করে দিয়েছিলেন সেই ভক্তসুখদাতা ও দুর্জনশাসক গৌরচন্দ্রকে বন্দনা করি।

'সন্ন্যাসার্থং গতবতি গৃহাদগ্রজে বিশ্বরূপে
মিষ্টালাপৈর্ব্যথিতজনকং তোষয়ামাস তূর্ণম।
মাতুঃ শোকং পিতরি বিগতে সান্ত্বয়ামাস যশ্চ
তং গৌরাঙ্গং পরমসুখদং মাতৃভক্তং স্মরামি।'

সন্ন্যাস নিয়ে বড় ভাই বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করলে মিষ্টবাক্যে ব্যথিত পিতাকে যিনি পরিতুষ্ট করেছিলেন, পিতা জগন্নাথ তিরোহিত হলে মায়ের শোক প্রশমিত করেছিলেন সেই পরমসুখকর গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'প্রেতক্ষেত্রে দ্বিজপরিবৃতঃ সর্বদেবপ্রণম্যঃ
মন্ত্রং লেভে নিজগুরুপুরী বক্ত্রতো যো দশার্নম।

গৌড়ং লব্ধ্বা স্বমতি বিকৃতিচ্ছদ্মনোবাচ তত্ত্বম
তং গৌরাঙ্গং নবরসপরং ভক্তমূর্তিং স্মরামি ॥'

পিতৃশ্রাদ্ধ করবার জন্যে যিনি দ্বিজপরিবৃত হয়ে গয়াধামে গিয়ে ঈশ্বর পুরীর থেকে দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছিলেন ও গৌড়ে ফিরে এসে চিত্তবিকারছলে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, সেই সর্বদেব-প্রণম্য নবরস-আবিষ্ট গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'মাতুর্বাক্যাৎ পরিণয়বিধৌ প্রাপ্য বিষ্ণুপ্রিয়াং যঃ
গঙ্গাতীরে পরিকরজনৈর্দিগজিতো দর্পহারী।
রেমে বিদ্বজনকুলমণিঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ
বন্দেঽহং তং সকলবিষয়ে সিংহমধ্যাপকানাম ॥'

জননীর অনুরোধে যিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করলেন ও গঙ্গাতীরে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্পনাশ করে বিদ্বানশ্রেষ্ঠ নবদ্বীপচন্দ্ররূপে স্বপরিকরসহ গৌরবদীপ্ত হয়েছিলেন, সকল বিষয়ে সেই অধ্যাপকসিংহ গৌরাঙ্গকে বন্দনা করি।

'আজ্ঞাপয়চ্চ ভগবানবধূতদাসৌ
নামানি গোকুলপতে নগরেষু দাতুম।
সর্বত্রজীবনিচয়েষু পরাবরেষু
যস্তং স্মরামি পুরুষং করুণাবতারম ॥'

যিনি অবধূত নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাসকে নগরে নগরে আপামর জনসাধারণকে কৃষ্ণনাম বলাতে আদেশ করেছিলেন সেই করুণা-বতার পরমপুরুষকে স্মরণ করি।

'নিদ্রাত্যাগঃ স্নপনমশনং গোদ্রুমাদৌ বিহারো
গ্রামে গ্রামে বিচরণমহো কীর্তনঞ্চাল্পনিদ্রা।
যামে যামে ক্রমনিয়মতো যস্য ভক্তৈর্বভূবু
স্তং গৌরাঙ্গং ভজনসুখদং হৃষ্টযামং স্মরামি ॥'

নিশান্তে নিদ্রাত্যাগ, প্রাতে স্নান ও ভোজন, পরে গোদ্রুম উপবনে গ্রামে গ্রামে কীর্তনবিহার ও হরিচর্চা, রাত্রে অল্পনিদ্রা—এই

ভাবে অষ্টযামে ক্রমনিয়মে ভক্তদের সঙ্গে যাঁর লীলা হয়েছিল সেই ভজনসুখদ গৌরাঙ্গকে আমি অষ্টকাল স্মরণ করি।

'যো বৈ সঙ্কীর্তনপরিকরৈঃ শ্রীনিবাসাদিসঙ্ঘৈ
স্তত্রত্যানাং পতিতজগদানন্দমুখ্যদ্বিজানাম।
দুর্বৃত্তানাং হৃদয়বিবরং প্রেমপূর্ণং চকার
তং গৌরাঙ্গং পতিতশরণং প্রেমসিন্ধুং স্মরামি॥'

যিনি শ্রীনিবাসাদি পরিকরের সঙ্গে নবদ্বীপের দুর্বৃত্ত পতিত জগাই-মাধাই প্রভৃতি দ্বিজগণের হৃদয় প্রেমপরিপূর্ণ করেছিলেন সেই পতিতশরণ প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'ভাবাবেশৈর্নিখিল সুজনান শিক্ষয়ামাস ভক্তিম
তেষাং দোষান সদয়হৃদয়ো মার্জয়ামাস সাক্ষাৎ।
ভক্তিব্যাখ্যাং সুজনসমিতৌ যো মুকুন্দশ্চকার
তং গৌরাঙ্গং স্বজনকলুষক্ষান্তিমূর্তিং স্মরামি॥'

ভাবাবেশদ্বারা যিনি নিখিলসুজনদের ভক্তিশিক্ষা দিয়েছিলেন, সদয়হৃদয় হয়ে তাদের দোষ সাক্ষাৎ মার্জনা করেছিলেন আর সাধুসভায় ভক্তিব্যাখ্যা বিস্তার করেছিলেন সেই স্বজনদোষক্ষমামূর্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'যো বৈ সঙ্কীর্তনসুখরিপুং চান্দকাজীং বিমুচ্য
লাস্যোল্লাসৈর্নগরনিচয়ে কৃষ্ণগীতং চকার।
বারম্বারং কলিগদহরং শ্রীনবদ্বীপধাম্নি
তং গৌরাঙ্গং নটনবিবশং দীর্ঘবাহুং স্মরামি॥'

যিনি সঙ্কীর্তনসুখের প্রতিবন্ধক চাঁদকাজীকে উদ্ধার করে বারে বারে নবদ্বীপধামের নগরসমূহে নৃত্যোল্লাসময় কলিকলুষহর নগরকীর্তন করেছিলেন সেই নৃত্যবিহ্বল দীর্ঘবাহু গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'গোপীভাবাৎ পরমবিবশো দণ্ডহস্তঃ পরেশো
বাদাসক্তানতিজড়মতীন তাড়য়ামাস মূঢান।

তস্মাত্তে যৎ প্রতিভটতয়া বৈরভাবানতঘ্নন
তং গৌরাঙ্গং বিমুখকদনে দিব্যসিংহং স্মরামি ॥'

যাঁর গোপীভাববিহ্বলতাকে অধম পড়ুয়া উপহাস করেছিল ও যিনি সেই অতিজড়মতি বাদাসক্ত মূঢ়কে তাড়না করে সমস্ত বৈরিতা ও বিরুদ্ধতাকে দমন করেছিলেন সেই দিব্যসিংহরূপ গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'তেষাং পাপপ্রশমনমতিঃ কণ্টকে মাঘমাসে
লোকেশাক্ষিপ্রমবয়সি যঃ কেশবান্ন্যাসলিঙ্গং।
লেভে লোকে পরমবিদুষাং পূজনীয়ো বরেণ্য
স্তং চৈতন্যং কচবিরহিতং দণ্ডহস্তং স্মরামি ॥'

যিনি অধমমূঢ়দের পাপপ্রশমনে প্রবৃত্ত হয়ে মাঘমাসে শুক্লপক্ষে চব্বিশ বৎসর বয়সে পণ্ডিতপূজনীয় বরেণ্য পুরুষ কেশব ভারতীর থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন সেই মুণ্ডিতকেশ দণ্ডধারী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে স্মরণ করি।

'ত্যক্ত্বা গেহং স্বজনসহিতং শ্রীনবদ্বীপভূমৌ
নিত্যানন্দপ্রণয়বশগঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।
ভ্রামং ভ্রামং নগরমগমচ্ছান্তি পূর্বং পরং য
স্তং গৌরাঙ্গং ব্রজজিগমিষাবিষ্টমূর্তিং স্মরামি ॥'

গৃহত্যাগ করে নবদ্বীপধামের স্বজনদের সঙ্গে ভ্রমণ করতে-করতে যিনি শান্তিপুরে এসেছিলেন সেই নিত্যানন্দপ্রণয়ানুগত, ব্রজধাম-গমনেচ্ছায় আবিষ্টমূর্তি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে স্মরণ করি।

'তত্রানীতাত্বজিতজননী হর্ষশোকাকুলা সা
ভিক্ষাং দত্ত্বা কতিপয়দিবা পালয়ামাস সূনুং।
ভক্ত্যা যস্তদ্বিধিমনুসরন ক্ষেত্রযাত্রাং চকার
তং গৌরাঙ্গং ভ্রমণকুশলং ন্যাসিরাজং স্মরামি ॥'

শান্তিপুরে সমানীতা হর্ষশোকাকুলা অজিতজননী শচীদেবী যে পুত্রকে ভিক্ষাদান করে কয়েক দিন পালন করেছিলেন, যিনি

মাতৃভক্তিতে মাতৃ-আজ্ঞা অনুসরণ করে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেছিলেন সেই ভ্রমণ-কুশল সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'নিত্যানন্দঃ সুজনহরিদাসোঽথ দামোদরশ্চ
সেবাদাসৌ বিবুধজগদানন্দদত্তৌ মহান্তৌ।
এতে ভক্তাশ্চরণমধুপা যেন সার্দ্ধং প্রচেলু
স্তং গৌরাঙ্গং প্রণতপটলপ্রেষ্ঠমূর্ত্তিং স্মরামি॥'

যাঁর সঙ্গে চরণভৃঙ্গ নিত্যানন্দ সুজন হরিদাস দামোদর পণ্ডিত জগদানন্দ ও মুকুন্দ দত্ত পুরীধামে গিয়েছিলেন সেই প্রণতজনের প্রিয়তমমূর্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'ভগ্নে দণ্ডে কপটকুপিতস্তান বিহায় স্ববর্গা
নেকোনীলাচলপতিপুরং প্রাপ্য তূর্ণং প্রভুর্যঃ।
ভাবাবেশং পরমগমৎ কৃষ্ণরূপং বিলোক্য
তং গৌরাঙ্গং পুরটবপুষং ন্যস্তদণ্ডং স্মরামি॥'

দণ্ডভঙ্গের পর কপটকোপান্বিত হয়ে যে প্রভু ভক্তগণকে ত্যাগ করে একক নীলাদ্রিনাথের মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণরূপদর্শনে পরম ভাবাবেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই স্বর্ণকান্তি বিগতদণ্ড গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'ভাবাস্বাদপ্রকটসময়ে সার্বভৌমস্য সেবা
তস্যানর্থান প্রকৃতিবিপুলান নাশয়ামাস সর্বান।
তস্মাদযস্য প্রবলকৃপয়া বৈষ্ণবোঽভূত স চাপি
তং বেদার্থপ্রচরণবিধৌ তত্ত্বমূর্তিং স্মরামি॥'

সেই ভাবাবেশকালে যিনি সার্বভৌমের সেবা পেয়ে তার সমস্ত স্বভাব-অনর্থ মোচন করেছিলেন, যাঁর প্রবলকৃপায় সার্বভৌম বৈষ্ণব হয়েছিলেন, সেই বেদার্থপ্রচারক্রিয়ার তত্ত্বমূর্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'তত্রোষিত্বা কতিপয়দিবা দাক্ষিণাত্যং জগাম
কূর্মক্ষেত্রে গদবিরহিতং বাসুদেবং চকার।

রামানন্দে বিজয়নগরে প্রেমসিন্ধুং দদৌ য
স্তং গৌরাঙ্গং জনসুখকরং তীর্থমূর্ত্তিং স্মরামি ॥'

সেখানে কয়েকদিন থেকে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে যিনি কূর্মক্ষেত্রে কুষ্ঠপীড়িত বাসুদেবকে নিরাময় করেছিলেন, বিদ্যানগরে রায় রামানন্দকে প্রেমসমুদ্র ঢেলে দিয়েছিলেন সেই জনগণানন্দী তীর্থমূর্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'বৌদ্ধান জৈনান ভজনরহিতান তত্ত্ববাদাহতাংশ্চ
মায়াবাদহ্রদনিপতিতাং শুদ্ধভক্তিপ্রচারৈঃ।
সর্ব্বাংশ্চৈতান ভজনকুশলান যশ্চকারাত্মশক্ত্যা
বন্দেঽহং তং বহুমতধিয়াং পাবনং গৌরচন্দ্রম ॥'

যিনি স্বীয়শক্তি বিস্তার করে শুদ্ধভক্তি প্রচার দ্বারা বৌদ্ধ, জৈন, তত্ত্ববাদী ও মায়াবাদহ্রদমগ্ন ব্যক্তিদের ভজনকুশল করে তুলেছিলেন সেই বহুমতহতবুদ্ধিদের পাবনস্বরূপ গৌরচন্দ্রকে বন্দনা করি।

'কাশীমিশ্রদ্বিজবরগৃহে শুদ্ধচামীকরাভো
বাসঞ্চক্রে স্বজননিকরৈঃ র্যঃ স্বরূপপ্রধানৈঃ।
নামানন্দং সকলসময়ে সর্বজীবায় যোঽদাৎ
তং গৌরাঙ্গং স্বজনসহিতং ফুল্লমূর্ত্তিং স্মরামি ॥'

কাশীমিত্র ব্রাহ্মণের ঘরে যে শুদ্ধকনককান্তি পুরুষ স্বরূপদামোদর প্রভৃতি স্বগণের সঙ্গে থেকে সর্বসময়ে সর্বজীবকে নামানন্দ দিয়েছিলেন সেই স্বজনবেষ্টিত প্রসন্নমূর্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'নীলাগেশে রথমধিগতে বৈষ্ণবৈ র্য স্তদগ্রে
নৃত্যন্ গায়ন্ হরিগুণ-গণং প্লাবয়ামাস সর্ব্বান।
প্রেম্নৌড্রীয়ান গজপতি-মুখান সেবকান শুদ্ধভক্তাং
স্তং গৌরাঙ্গং স্বসুখজলধিং ভাবমূর্ত্তিং স্মরামি ॥'

নীলাদ্রিনাথ রথারূঢ় হলে বৈষ্ণববেষ্টিত যে পুরুষ রথাগ্রে নৃত্য ও হরিগুণগান করে সকলকে প্রেমপ্লাবিত করেছিলেন আর গজপতি

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি উৎকল ভক্তদের প্রেমদান করে শুদ্ধভক্ত করে তুলেছিলেন সেই স্বসুখসমুদ্র ভাবমূর্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'বৃন্দারণ্যেক্ষণকপটতো গৌড়দেশে প্রসূতিং
দৃষ্ট্বা স্নেহাদ্‌যবনকবলাৎ সাগ্রজং রূপমেব।
উদ্ধৃত্যোড্রং পুনরপি যযৌ যঃ স্বতন্ত্রঃ পরাত্মা
তং গৌরাঙ্গং স্বজনতরণে হৃষ্টচিত্তং স্মরামি॥'

যিনি বৃন্দাবন দর্শন করবার ছলে গৌড়ে জননী শচীদেবীকে দেখে পরে পরমস্নেহে যবনসম্রাটের হাত থেকে রূপ ও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনকে উদ্ধার করে পুনরায় উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন সেই স্বজনতরণে হৃষ্টচিত্ত গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'সঙ্গং হিত্বা বহুবিধনৃণাং ভদ্রমেকং গৃহীত্বা
যাত্রাং বৃন্দাবনদৃঢ়মতির্যশ্চকারাত্মতন্ত্রঃ।
ঋক্ষব্যাঘ্রপ্রভৃতিকপশূন্ মাদয়িত্বাত্মশক্ত্যা
তং স্বানন্দৈঃ পশুমতিহরং গৌরচন্দ্রং স্মরামি॥'

যিনি জনতার সঙ্গ ত্যাগ করে শুধু একজনকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেছিলেন ও বনপথে ব্যাঘ্র-ঋক্ষ পশুসমূহকে আত্মশক্তিবলে কৃষ্ণভক্তিতে উন্মাদিত করেছিলেন সেই পশুমতিহারী আত্মতন্ত্র পুরুষ আনন্দময় গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

'বৃন্দারণ্যে গিরিবরনদীন গ্রামরাজীং বিলোক্য
পূর্বক্রীড়াস্মরণবিবশো ভাবপুঞ্জৈর্মুমোহ
তস্মাস্তদ্রো ব্রজবিপিনতশ্চালয়ামাস যঞ্চ
তং গৌরাঙ্গং নিজজনবশং দীনমূর্তিং স্মরামি॥'

যিনি বৃন্দাবনে গিরিগোবর্ধন যমুনা নন্দগ্রাম বৃষভানুপুর প্রভৃতি গ্রাম দেখে পূর্বলীলা স্মরণ করে বিবশভাবপুঞ্জ হয়ে মূর্ছিত হয়েছিলেন ও যাঁকে বলভদ্র ব্রজবিপিন হতে বার করে নিয়ে এসেছিলেন সেই নিজজনবশ দৈন্যমূর্তি গৌরাঙ্গকে স্মরণ করি।

কৃষ্ণের নামকরণকালে গর্গ-মুনি নন্দমহারাজকে বলেছিলেন, তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিন যুগে ধারণ করেন, অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন। 'যঃ শ্যামো দধদাস বর্ণকমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে। সোঽয়ং গৌরবিধুর্বিভাতি বলয়ন্নামাবতারং কলৌ।' যিনি দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ধারণ করে শ্যাম-নামে অভিহিত হয়েছিলেন তিনিই কলিযুগে গৌরবিধু নামে অবতীর্ণ হয়ে বিরাজমান আছেন। গৌরাঙ্গী রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করেছেন বলেই শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ গৌরবর্ণ হয়েছেন।

নরহরি সরকার বলছেন :

'রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোর বর
নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এসব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে বেথা
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য ॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্যনাম
গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান শ্যাম হইল গৌরাঙ্গ
রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাক্ষী ॥
অন্তরেতে শ্যামতনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভুত চৈতন্যের লীলা।
রাইসঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জরায় বিলাইতে
অনুরাগে গৌরতনু হৈলা ॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিত্তে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ ॥'

'না কহিলে মনে বড় তাপ।' 'না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।' 'না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিতে।'

'না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে, তবু লিখি এ বড় বিস্ময়।'

'না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেয় স্বচরণ।'

'কহিবার কথা নহে, দেখিলে সে জানি। তাঁহার স্বভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি॥'

'কহিবার কথা নহে কহিলে কেহ না বুঝয়ে
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে চৈতন্যের কৃপা যারে
হয় তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ॥'

৮৯

শ্রীরূপ গোস্বামী বলছেন :

'সদোপাস্য শ্রীমান ধৃত-মনুজ-কায়ৈ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ-পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভি।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ-ভজন-মুদ্রামুপদিশন
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম॥'

পরমেষ্ঠি পঞ্চানন প্রমুখ গীর্বাণগণ দিব্য নরাকার ধরে পরম প্রীতিভরে যাঁর সেবা করছেন, যিনি তাঁর ভক্তদের জন্যে শুদ্ধা ভজনমুদ্রা উপদেশ করছেন সে প্রভু শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার লোচনগোচর হবেন ?

'সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়নোপনিষদাং
মুনীনাং সর্বস্বং প্রণত-পটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাস প্রেম্নো নিখিল পশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥'

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের দুর্গস্বরূপ, শ্রুতিসমূহের একমাত্র গতি, যিনি মুনিগণের সর্বস্ব, যিনি প্রণত ভক্তগণের পক্ষে মাধুর্যস্বরূপ আর যিনি পঙ্কজনয়না ব্রজবনিতাদের প্রেমনির্যাস, সেই প্রভু শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার নয়নপথবর্তী হবেন ?

'স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম ॥'

যিনি জগৎ-অতুল স্বরূপ-দীপ্যমান, অদ্বৈতের দয়িত, শ্রীবাসের নিবাসস্থল, পরমানন্দের গরিমাস্থল ও গজপতি-কৃপাকারী, সেই দীনোদ্ধারী কৃপাদ্রব হরি শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার নয়নসম্মুখে এসে উপস্থিত হবেন ?

'কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহো নাহি মানে।' নিত্য-অব্যক্ত ভগবান শুধু নিজ কৃপাশক্তিতেই দৃশ্যমান। নইলে কার সাধ্য অপ্রমেয় পরমাত্মা হরিকে দেখে ? 'কৃপারজ্জু গলে বাঁধি চরণে আনিলা।' 'যারে তাঁর কৃপা, তাঁরে সে জানিতে পারে।' 'কৃষ্ণ কৃপা বিনা কোনো সুখ নাহি হয়।' 'তুমি তো সাক্ষাৎ বট সাক্ষাৎ নারায়ণ। কৃপা করি কর মোর সংসার মোচন ॥' 'কৃপা করে কর মোরে পদধূলিসম।' 'জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। কৃপা করি দেহ প্রভু নিজপদদান ॥'

'রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম ॥'

যিনি দিব্যজ্যোতি অনুপমকান্তি ও রসোন্মাদ, যিনি কোটি মন্মথকে জয় করেছেন, যিনি যতিকুলশিরোমণি, যাঁর পরিধানে

সূর্যকরোজ্জ্বল বসন, যাঁর তনুপ্রভা স্বর্ণশোভাকেও হার মানায়, সেই শ্রীচৈতন্য কি আমার নয়ন-আকাশে আবার সমুদিত হবেন ?

'মন্মথমন্মথরূপে যাহার প্রকাশ।' 'পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ।' পীতবসনধারী বনমালী সাক্ষাৎ মদনবিমোহন। 'স্বমাধুর্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।' 'কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে।' 'কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম্যকাময়া।' কামও ভগবানের সেবায়, ভগবদ্দাস্যে নিয়োজিত হোক। 'কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি। দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥' যে সর্বতোভাবে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাকে ভজন করে তার পক্ষে গৃহস্থকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দরকার হয় না।

'হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম গণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণি-সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগল-খেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম॥'

হরেকৃষ্ণ নামাক্ষর যাঁর রসনায় নিরন্তর স্ফুরিত হচ্ছে, নামসংখ্যা-গণনায় যাঁর বামহস্ত কটিসূত্রে গ্রন্থীকৃত হয়ে শোভা পাচ্ছে, যাঁর দীর্ঘ দুই হাত আজানুলম্বিত, সেই দীপ্ত বিশালনেত্র চৈতন্য কি আবার নয়নপথগামী হবেন ?

'উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কানে।' 'সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ। উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন।' 'উচ্চ সঙ্কীর্তন তাতে করিলা প্রচার। স্থির-চর-জীবের সব খণ্ডাইল সংসার॥' 'উচ্চ করি করে সভে নামসঙ্কীর্তন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর হইল চেতন॥' 'হরিনাম্নো জপাৎ সিদ্ধির্জপাদ ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাদ গানং ভবেচ্ছ্রেয়ঃ গানাৎ পরতরং নহি।' হরিনামের জপেই সিদ্ধি, জপের চেয়ে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যানের চেয়ে গান বা কীর্তন শ্রেষ্ঠ। গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।

'তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥
শুনিলেই জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে—তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্যকথন॥'

নামেই লোকে 'লোকবাহ্য' হয়ে যেতে পারে। মানুষ প্রশংসা করবে না নিন্দা করবে তার হিসেব নামে লুপ্ত হয়ে যায়। নামকারী সম্মানে-অপমানে অবধানশূন্য হয়ে ওঠে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুতে অভিনিবেশ থাকে না। কে কী বলছে কে বিচার করে। নামে-প্রেমে চিত্ত বিরহার্ত, একমাত্র কৃষ্ণই সেই আর্তির প্রত্যুত্তর।

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম॥

এককালে যিনি সমুদ্রতীরে উপবনশ্রেণী দেখে বৃন্দাবন স্মরণ-জনিত প্রেমে অভিভূত হয়েছিলেন, বারম্বার কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যাঁর রসনা চঞ্চল হয়েছিল, সেই ভক্তি-রসিক শ্রীচৈতন্য কি আবার নয়নের পথগোচর হবেন ?

'চৈতন্যচরণ বিনে নাহি জানে আন। ভক্তি বিনু শাস্ত্রের আর না করে ব্যাখ্যান॥' ভক্তি-সাধনের পাঁচটি উপায় কলিকালের উপযোগী। সেই পাঁচটি হচ্ছে সাধুসঙ্গ, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্তিপূজন ও নামসঙ্কীর্তন। এই পাঁচটি অঙ্গের স্বল্প সাধনা থেকেও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রেমোদয় হবে। আর ভক্তিসাধনের শ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামসঙ্কীর্তন। 'ভক্তিসাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হইল মন। প্রভু উপদেশ কৈল—নামসঙ্কীর্তন॥'

নববিধা ভক্তি—শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চন বন্দন দাস্য সখ্য ও আত্মনিবেদন। এই একটির সর্বাঙ্গীণ অনুশীলনে যদি নৈরন্তর্য লাভ হয় তা হলে কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তি।

শ্রবণে পরীক্ষিত, কীর্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, অর্চনে পৃথুরাজ, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন ও আত্মনিবেদনে বলি কৃষ্ণপ্রাপ্ত হয়েছিল।

'রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে
রদভ্রপ্রেমোর্মিস্ফুরিত নটনোল্লাস-বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥

যিনি রথস্থিত নীলাচলপতির নিকটস্থ পথে অত্যধিক প্রেমতরঙ্গোচ্ছ্বাসে নর্তনানন্দে বিবশ হয়েছিলেন আর কীর্তনানন্দ বৈষ্ণবেরা যাঁকে বেষ্টন করে নেচেছিল সেই শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হবেন?

'যারে দেখে তারে কহে—কহ কৃষ্ণনাম। এইমত বৈষ্ণব কৈল সব গ্রাম॥' যিনি একবার কৃষ্ণনাম করেন তিনিই বৈষ্ণব। 'প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার।' 'এই কলিকালে আর নাহি অন্যধর্ম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম॥' 'সর্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥' 'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ। তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ কারণ॥'

'ভুবং সিঞ্চন্নশ্রুস্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্রপুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপস্তবক নবকিঞ্জল্কজয়িভিঃ
ঘনস্বেদস্তোম স্তিমিত তনুরুৎকীর্তন সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম॥'

যিনি অবারিত অশ্রুপ্লাবনে বসুন্ধরাকে প্রগাঢ়পুলকে সিঞ্চিত করেছিলেন, যিনি সঙ্কীর্তনসুখে কদম্বকেশররোমাঞ্চিত, ঘনস্বেদসিক্ত

যাঁর বরতনু, সেই শ্রীচৈতন্য কি আবার আমার নয়নপথে আবির্ভূত হবেন ?

'চৈতন্যচন্দ্রামৃতে'র রচয়িতা প্রবোধানন্দ বলছেন :

'দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্তিতঃ সংস্মৃতো বা
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা ।
প্রেম্নঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুম্ ॥'

যিনি কেবল দৃষ্ট স্পৃষ্ট স্মৃত ও কীর্তিত হলে বা দূরবর্তীদের নমস্কৃত বা সমাদৃত হলে প্রেমরসসার দিয়ে ফেলেন সেই দয়ালুদেব শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করি।

এবার রঘুনাথদাস গোস্বামীর শচীসূন্বষ্টকম পড়ি :

'হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধাপ্রিয়তরসখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥'

যিনি গোষ্ঠে দর্পণে নিজের নিরুপম দেহমাধুরী দেখে রাধাভাবে তা আস্বাদ করবার জন্যে রাধাকান্তি ধরে গৌড়ে জন্মগ্রহণ করলেন সেই শচীসূনু শ্রীহরি কি আমার নয়নশরণীর পথিক হবেন ?

'পুরীদেবস্যান্তঃ প্রণয়মধুনা-স্নানমধুরো
মুহুর্গোবিন্দোদ্যদ্বিশদ-পরিচর্য্যার্চ্চিত পদঃ ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ কমল-নীরাজিত মুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥'

যাঁর স্নিগ্ধ দিব্য দেহ পুরীদেবের নিত্যপদগোবিন্দসেবিত স্নেহে মধুস্নাত, স্বরূপের কোটি প্রেমোচ্ছল প্রাণপদ্মের শিশিরে যাঁর মুখকমল নিত্য নীরাজিত সেই শচীসূনু শ্রীহরি কি আমার নয়নপথের পথিক হবেন ?

'দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রিদ্যুতিভিরভিতঃ সেবিত তনুঃ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজমধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥'

যাঁর বরবপু সুদীর্ঘ সুন্দর, সুমেরুপ্রভাসেবিত সমুজ্জ্বল, যাঁর কটিতটে কৌপীন ও তার উপরে অরুণবর্ণ বহির্বাস, সদা নিজ নামকীর্তনে মধুরমুখর সেই শচীপুত্র শ্রীহরি কি আমার নয়নপথের পথিক হবেন ?

'অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তিনিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাম।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥'

ভক্তিনিপুণ মুনিগণ যা সম্যক অবধান করতে পারেননি সেই বেদগোপ্যা প্রেমোজ্জ্বলরসফলা ভক্তিলতিকা যিনি কৃপাপরবশ হয়ে গৌড়ভূমিতে প্রকাশিত করলেন সেই শচীনন্দন শ্রীহরি কি আমার নয়নপথের পথিক হবেন ?

'নিজত্বে গৌড়ীয়ান জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্তয়ত ভোঃ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষকং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥'

যিনি গৌড়জনকে নিজজন গণনা করে হরেকৃষ্ণ কীর্তনে আহ্বান করে পিতার মত স্নেহে উপদেশ বিতরণ করেছিলেন সেই শচীনন্দন কি আবার আমার দৃষ্টি পথের পথিক হবেন ?

'পুরঃ পশ্যন নীলাচলপতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত নিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনুঃ।
সদা তিষ্ঠন দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভচরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥'

যিনি প্রণয়িগরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে নীলাচলপতিকে দর্শন করে নয়নজলে তাঁর সুদীর্ঘ উজ্জ্বল তনু ভাসিয়ে দিতেন সেই শচীতনয় কি আবার আমার নয়নপথের পথিক হবেন ?

'মুদাদন্তৈ র্দষ্ট্বা দ্যুতিবিজিত বন্ধুকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটিনিহিতমন্যং পরিলসন।
সমুত্থাপ্য প্রেম্নাগণিতপুলকো নৃত্য-কুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥'

যিনি তার বন্ধুকবিজয়ী রক্তাধর দশনে দংশন করে বাম হাত কটিতে রেখে দক্ষিণ হাত উপরে তুলে পুলককৌতুকে অগণ্য প্রেমবিকারে নৃত্য করতেন সেই শচীনন্দন কি আবার আমার নয়ন-পথগামী হবেন ?

'সরিত্তীরারামে বিরহবিধুরো গোকুলবিধো
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন জলধারা বিততিভি।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥'

যিনি নদীতীরের কুসুমকুঞ্জে গোকুলবিধুর বিরহে বিধুর হয়ে তাঁর নয়নজলধারায় অন্য এক নদী সৃষ্টি করে ঘন-ঘন মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হতেন সেই শচীনন্দন কি আমার নয়নপথের পথিক হবেন ?

এবার পণ্ডিত জগদানন্দকে শোনা যাক :

'অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নাম বাহিরায় বটে তবু নাম কভু নয় ॥
কভু নামাভাস হয় কভু নাম-অপরাধ
এ সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥
দশ অপরাধ ত্যজ মান-অভিমান
অনাসক্ত্যে বিষয়ভুঞ্জ লহ কৃষ্ণনাম ॥

কৃষ্ণভক্তি-অনুকূল করহ স্বীকার।
কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কর পরিহার॥
জ্ঞানযোগ চেষ্টা ছাড় আর কর্মসঙ্গ
মর্কটবৈরাগ্য ত্যজ যাতে দেহরঙ্গ॥'

অন্তরে বিষয়বাসনা নিয়ে বাইরে যে বৈরাগ্য তাই মর্কটবৈরাগ্য। বানর কী করে? বানর অনিকেত, বৃক্ষশাখায় বাস করে, ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে, বেশবাসের ধার ধারে না, বাইরে থেকে দেখলে মহাবৈরাগী। কিন্তু বানর আসলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ভোগ-লালায়িত। তাই বাহ্যবৈরাগ্যের বাতুলতা ছেড়ে অন্তরে নিষ্কপট হও। শুধু বসন না রঙিয়ে মন রাঙাও।

'অসুন্দরঃ সুন্দরশেখরো বা গুণৈর্বিহীনো গুণিনাং বরো বা। দ্বেষী ময়ি স্যাৎ করুণাম্বুধির্বা শ্যামঃ স এবাদ্য গতির্মমায়ম॥' অসুন্দরই হোন কি সুন্দরোত্তমই হোন, গুণহীন হোন বা গুণিশ্রেষ্ঠই হোন, আমার প্রতি দ্বেষই প্রকাশ করুন বা আমার প্রতি উচ্ছলিত করুণাসমুদ্রই হোন, সেই শ্যামই আমার একমাত্র গতি।

এই নিত্যসিদ্ধ নিসর্গরতিই অকপট বৈরাগের মূল।

জগদানন্দ আরো বলছেন :

'গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ যেন নামবিনা দিন নাহি যায়॥
বহু অঙ্গ সাধনের নাহি প্রয়োজন
কৃষ্ণনামাশ্রয়ে শুদ্ধ করহ জীবন॥
বদ্ধজীবে কৃপা করি কৃষ্ণ হৈল নাম।
কলিজীবে দয়া করি কৃষ্ণ গৌরধাম॥
একান্ত সরলভাবে ভজ গৌরজন।
তবে ত পাইবে ভাই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
গৌরজন সঙ্গ কর গৌরাঙ্গ বলিয়া
হরেকৃষ্ণ নামবল নাচিয়া নাচিয়া॥

অচিরে পাইবে ভাই নামপ্রেমধন।
যাহা বিলাইতে প্রভুর নদে আগমন॥'

'ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্ন বেদ সুখমাত্মনঃ। দুঃখঞ্চেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্লুতঃ॥' মহাদেব পার্বতীকে বলছেন, হে মহেশানি, যে ভগবান শ্রীহরির ভাবে উন্মত্ত হয়েছে সে নিজের সুখ-দুঃখ কিছুই জানতে পারে না, সে সর্বদা পরমানন্দে ডুবে থাকে।

হে লীলাপুরুষোত্তম, তোমার যাতে সুখ হয় তাই করো। তোমার সুখেই আমার সর্বগরিমাময়ী তৃপ্তি। তুমি আমাকে তোমার বাহুবেষ্টনেই রোমাঞ্চিত করো বা অদর্শনে রেখে বিরহক্লেশে নির্যাতিত করো, সর্বাবস্থায় তোমার সুখসাধনেই আমার রতি মতি গতি হোক।

৯০

সনাতন বলছেন :

'শ্রীমচ্চৈতন্যরূপায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ।
যাৎ কারুণ্যপ্রভাবেন পাষাণোহপ্যেষনৃত্যতি॥'

ভগবান শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি, যাঁর করুণার গুণে পাষাণও প্রাণনৃত্যময় হয়ে ওঠে।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী আগে মায়াবাদী ছিলেন, গৌরহরির কৃপালাভের পর গৌরপ্রেমসিন্ধুতে ডুবে গিয়েছিলেন। গৌরপ্রেম-সিন্ধুই রাধারসসুধানিধি। 'স জয়তি গৌরপয়োধির্মায়াবাদর্বাত-সন্তপ্তম। হৃন্নভ উদশীতলয়দ যো রাধারসসুধানিধিনা॥' বলছেন, যিনি ইন্দ্রনীলমণিবিড়ম্বিনী কান্তি পরিত্যাগ করে গৌরকান্তি ধারণ করেছিলেন সেই শ্রীগৌরহরিই আমার কেবলা গতি।'

প্রবোধানন্দ গৌরভক্তদের গুণাবলী বর্ণনা করছেন :

তৃণাদপিচ নীচতা সহজসৌম্য মুগ্ধাকৃতিঃ
সুধামধুরভাষিতা বিষয়গন্ধ-থুথুৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদগুণা জগতি গৌরভাজামমী॥

গৌরভক্তের তৃণতুল্য দৈন্য, সুমধুর লাবণ্য, স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর, বিষয় বিরক্তি আর তীব্র হরিপ্রণয়েও ধৈর্যাবলম্বন লক্ষনীয়।

গৌরভক্তই মহৎ, আর মহৎই বৈষ্ণবপদবাচ্য। 'মহৎ কৃপা বিনা কোনো কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণকৃপা দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয়।' 'ভক্তপদরজঃ আর ভক্তপদজল। ভক্ত-ভুক্ত শেষ তিন সাধনের বল।'

যার ভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি, ভগবদভাব ছাড়া অন্য ভাব যার মনে স্থান পায় না সেই মহৎ, আর সেই মহতের পদরজই সর্বাঙ্গের ভূষণ।

নরোত্তম বলছেন :

'বৈষ্ণবচরণরেণু ভূষণ করিয়া তনু
আর নাই ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণবচরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত॥'

ভক্ত ভগবান ছাড়া আর কারো অপেক্ষা রাখে না। সর্বাধিক প্রিয় যে দেহ তার প্রতিও মহৎজনের মায়ামমতা নেই। শত বিপদেও তার মনে কোনো বিক্ষোভ আসে না। তার শান্তশীতল চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মে ভৃঙ্গায়মান হয়ে থাকে। ভগবানের নাম ও রূপ ও লীলার স্মরণে-মননে সে তন্ময়। জীব কৃষ্ণের অধিষ্ঠান বলে সকলের প্রতিই তার সমান ভালোবাসা, কারো প্রতি তার বৈরিতা নেই। শ্বাপদেরাও তাকে দেখে স্বভাবহিংস্রতা ভুলে যায়। আর সব চেয়ে বড় কথা, স্বয়ং ভগবান তার পিছু-পিছু হাঁটেন তার পায়ের ধুলো গায়ে মেখে পবিত্র হবার জন্যে।

'নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥

ভগবানের মধ্যে আবার অপবিত্রতা কী। ভগবানের নিজের কোনো অপবিত্রতা নেই কিন্তু তাঁর মধ্যে যে ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে সেগুলোকে পবিত্র করবার জন্যেই তিনি ভক্তের পায়ের ধুলোর স্পর্শ চান। আসলে ভগবান ভক্তকে নিজের চেয়েও মহৎ নিজের চেয়েও পবিত্র মনে করে তৃপ্তি পান। সমস্ত অপবিত্র পাপকে একমাত্র ভক্তিই দগ্ধ করতে পারে আর এ ভক্তি ভক্তে আছে, ভগবানে নেই। ভগবান তো ভক্তির বিষয়মাত্র, ভক্তির আসল আশ্রয় হচ্ছে ভক্ত। তাই ভক্তিহীন ভগবান ভক্তিমান ভক্তকে অধিকতর পবিত্র মনে করেন। তাই মহাপ্রভু সনাতনকে বললেন, 'ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।' আরো বললেন, 'সনাতন, তোমাকে আমি স্পর্শ করছি নিজে পবিত্র হবার জন্যে।'

'প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥
তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাহি তোমার গুণ।
সর্বেন্দ্রিয়ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ ॥'

উদ্ধব কৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত। 'আবাল্যদেব গোবিন্দে ভক্তিরস্য সদোত্তমা।' পাঁচ বছর থেকেই কৃষ্ণার্চনায় মেতে আছে। ক্ষুধার্ত শিশুকে মা খেতে ডাকলেও খেতে যেত না, শুধু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ খেলা করত। কৃষ্ণ বললে, উদ্ধব, তুমি আমার যেমন প্রিয় তেমন সঙ্কর্ষণ বা লক্ষ্মীও আমার প্রিয় নয়। এমন কি আমিও আমার তেমন প্রিয় নই।

সেই উদ্ধবের চেয়েও ব্রজাঙ্গনারা কৃষ্ণের প্রিয়তরা। বলছে কৃষ্ণ :

'ব্রজদেব্যো বরিয়স্য ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।
যদাসাং প্রেমমাধুর্যং স এবোঽপ্যভিযাচতে ॥'

আর উদ্ধব গোপীপদরেণু পাবার আশায় গোপীদের চলাচলের পথে একটি গুল্ম তৃণ লতা বা ওষধি হতে অভিলাষ করল। বুঝল জ্ঞানে বা উপদেশে কিছু হবার নয়, সমস্ত কিছু হবে প্রেমমাধুর্যে। আর সে প্রেমমাধুরী পাওয়া যাবে গোপীপদরেণুসেবায়। তাই সে-পদরেণুই বাঞ্ছা করল উদ্ধব।

আবার গোপরমণীদের মধ্যে মহাভাবময়ী রাধিকা শ্রেষ্ঠা। আর রাধাকুণ্ডে রাধিকা স্নান করে, পা ধোয়, রাধাকুণ্ডে রাধিকার পদরেণু রয়েছে, তাই রাধাকুণ্ড কৃষ্ণের প্রিয়তম তীর্থ। তাই মহতের পদরজই আমাদের সম্বল।

মধুসূদন সরস্বতীও অদ্বৈতবাদী হয়ে দাসীভাবভাবিত রসিক ভক্ত। বলছেন :

'অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়াস্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃতা গোপীবধূবিটেন॥'

আমরা অদ্বৈত সাম্রাজ্যের পথের পথিক হলেও ইন্দ্রের বৈভব তৃণতুল্য তুচ্ছ করলেও কোন এক গোপবধূলম্পট শঠের দ্বারা সবলে দাসীকৃত হয়েছি।

সেই মায়াবাদী সন্ন্যাসীই আবার বলছেন : কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে। কৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো তত্ত্ব আমার জানা নেই। দ্বিভুজ নরলীল কৃষ্ণই আমার একমাত্র উপাস্য।

রূপসনাতনের ছোট ভাই অনুপম, তার পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। মধুসূদনের কাছে বেদান্ত শিখে পরে পিতৃব্যদের কাছে ভক্তিশাস্ত্র পড়েন। তিনি কী বলছেন মহাপ্রভুকে ?'

'নমশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণচৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥'

পরে আরো বলছেন :

'অন্তঃকৃষ্ণংবহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম।
কলৌ সঙ্কীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥'

যিনি অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ ও বাইরে গৌরবর্ণ, যিনি স্বীয় অঙ্গাদির বৈভব জনসমাজে প্রকটিত করেছেন আমরা কলিযুগে সঙ্কীর্তনাদি-দ্বারা তাঁর উপাসনা করি।

শ্রীজীব গৌরহরিকে বন্দনা করছেন :

'বন্দে শ্রীগৌরচন্দ্রং রসময়বপুষং ধামকারুণ্যরাশে
র্ভাবং গৃহ্ণনরসয়িতুমিহ শ্রীহরিং রাধিকায়াঃ।
উদ্ধর্তুং জীবসঙ্ঘান্ কলিমলমলিনান সর্বভাবেনহীনান
জাতো যো বৈ সুখাপঃ পরিজননিকরৈঃ শ্রীনবদ্বীপমধ্যে ॥'

সর্বভাবহীন কলিমলমলিন জীবকে উদ্ধার করবার জন্যে গৌর-হরির আবির্ভাব। 'তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।' শুধু ভক্তিপরায়ণ হও। 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' 'ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।' ভক্তি কী? রূপ গোস্বামী বলছেন, 'রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে।' যে রস বা রুচি ভগবানকে পাবার জন্যে চিত্তে স্নিগ্ধতা আনে তাই ভাব বা ভক্তি। মধুসূদন সরস্বতীর কথায় দ্রবীভাব-পূর্বিকা হি মনসো ভগবদাকারতা সবিকল্পকবৃত্তিরূপা ভক্তিঃ।' দ্রবীভূত মন যখন ভগবৎ-আকারে একীকৃত হয় তখন যে অনুভূতি তাই ভক্তি। ভগবৎকৃপার স্পর্শে মনে ভগবদনুগতির উদ্দীপনার নামই ভক্তি।

'শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।' 'শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।' 'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।' শুধু ভগবানকে আশ্রয় করলেই হবে এ আস্তিক্যময় দৃঢ় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে। যদি পণ করেই থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।' আর এই শ্রদ্ধা থেকেই ভক্তির আবির্ভাব। এমন কি যে কোমলশ্রদ্ধ, অর্থাৎ যার শাস্ত্রজ্ঞান তো নেইই, বরং বিরুদ্ধ তর্ক শুনে যার মতি চঞ্চল হয়, সেও ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করতে-করতে ভক্তোত্তম হয়ে যাবে। অভ্যাস

থেকেই চলে আসবে অনুরাগে। 'যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে-ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥'

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর কী বলছেন? বলছেন, 'লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ, সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈব অসিদ্ধেঃ।' ভগবৎ-ভজনে চিত্তে লোভ জাগলে শাস্ত্রযুক্তির জন্যে বসে থাকতে হয় না। আর শাস্ত্রই বা কতক্ষণ? যতক্ষণ না শ্রদ্ধা জাগে। 'তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে।' বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, 'তথা আকস্মিকমহৎকৃপাজনিতা শ্রদ্ধা।' মহৎকৃপার ফলে যদি শ্রদ্ধা জাগে তাহলেই কর্মত্যাগ ঘটে আর অবিমিশ্রা ভক্তিতে অধিকার জন্মায়।

এবার এই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শচীনন্দন বিজয়াষ্টক শোনো :

'গদাধর! যদা পরঃ স কিলকশ্চনালোকিতো
ময়াশ্রিত গয়াধ্বনা মধুরমূর্তিরেকস্তদা।
নবাম্বুদ ইব ব্রুবন্ ধৃতনবাম্বুদো নেত্রয়ো
লুঠন্ ভুবি নিরুদ্ধবাগ বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥'

গদাধর, গয়াপথে সে এক মনোহরমূর্তি দর্শন করেছি—মেঘস্বরে এই কথা বলে যিনি ধূলিতে লুণ্ঠিত হলেন, নেত্রবিগলিত অশ্রুতে যাঁর কণ্ঠ নিরুদ্ধ হয়ে গেল সেই শচীনন্দন জয়যুক্ত হোন।

'অলক্ষিতচরীং হরীত্যুদিতমাত্রতঃ কিং দশা
মসাবতি বুধাগ্রণীরতুলকম্পসম্পাদিকাম।
ব্রজন্নহহ! মোদতে ন পুনরত্র শাস্ত্রেষ্বিতি
স্বশিষ্যগণবেষ্টিতো বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥'

যিনি অতর্কিতে 'হরি' এই দুই বর্ণ কর্ণে শুনে অনুপম ভাবকম্পান্বিত হলেন, পণ্ডিতপ্রধানরূপে শিষ্যসংসদে শাস্ত্রালাপেও যেমন কোনোদিন হননি, সেই শচীনন্দন জয়মণ্ডিত হোন।

'হহ! কিমিদমুচ্যতে পঠ পঠাত্র কৃষ্ণং মুহু
র্বিনা তমিহ সাধুতাং দধতি কিং বুধা! ধাতবঃ।

প্রসিদ্ধ ইহ বর্ণ-সংঘটিত-সম্যগাম্নায়কঃ
স্বনাম্নি যদিতি ব্রুবন বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥'

হায় হায়, বিদ্যার্থীরা কী পড়ছে! কৃষ্ণ কৃষ্ণ পড়ো। কৃষ্ণ ছাড়া ধাতুশুদ্ধি হবে না। সমস্ত বর্ণমালা কৃষ্ণনামনির্ভর—যিনি স্বনামব্যাখ্যানে তৎপর সেই শচীনন্দন জয়যুক্ত হোন।

'নবাম্বুজদলে যদীক্ষণসবর্ণতাদীর্ঘতে
যদাসহৃদি ভাব্যতাং সপদি সাধ্যতাং তৎপদং।
স পাঠয়তি বিস্মিতান স্মিতমুখঃ স্বশিষ্যানিতি
প্রতি প্রকরণং প্রভুর্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥'

যাঁর আয়ত নয়নযুগল পদ্মদলের সমতুল সেই হরির পদকমল নিরন্তর ধ্যান করো আর সাধন করো—প্রতি প্রকরণে যিনি স্মিতমুখে বিস্মিত শিষ্যদের শুধু এই পাঠই দিচ্ছেন, সেই প্রভু শচীনন্দনের জয় হোক।

'ক্ব যামি করবাণি কিং ক্ব নু ময়া হরির্লভ্যতাং
তমুদ্দিশতু কঃ সখো কথয় কঃ প্রপদ্যেত মাং।
ইতি দ্রবতি ঘূর্ণতে কলিত-ভক্তকণ্ঠঃ শুচা
সমূর্চ্ছয়ন্তি মাতরং বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥'

কোথায় যাব, কী করব, কোথায় গেলে আমার হরিকে পাবো, হে বন্ধু, কে আমাকে উদ্দেশ দেবে, কে আমাকে আশ্রয় দেবে—এই বলে ভক্তকণ্ঠ ধরে যিনি বিলাপ করেন, মাকে মূর্ছিত করে নিজে মূর্ছিত হন, সেই শচীনন্দন জয়যুক্ত হোন।

'স্মরার্ব্বুদদুরাপয়া তনুরুচিচ্ছটাচ্ছায়য়া
তমঃ কলিতমঃ-কৃতং নিখিলমেব নির্ম্মূলয়ন।
নৃণাং নয়নসৌভগং দিবিষদাং মুখৈস্তারয়ন
লসন্নাধিধরঃ প্রভু র্বিজয়তে শচীনন্দনঃ ॥'

যাঁর অঙ্গজ্যোতিচ্ছটা কোটি কন্দর্পের দর্প হরণ করে, জীবের

কলিসঞ্জাত অন্ধকার নির্মূল করে, যাঁর অধরমাধুরী দেবতাদের নয়নানন্দকর, সেই মধুরশব্দ প্রভু শচীনন্দন জয়ান্বিত হোন।

'অয়ং কনকভূধরঃ প্রণয়রত্নমুচ্চৈঃ কিরন্
কৃপাতুরতয়া ব্রজন্নভদত্র বিশ্বম্ভরঃ।
সদক্ষিপথসঞ্চরৎ সুরধুনীপ্রবাহৈর্নিজং
পরঞ্চ জগদার্দ্রয়ন বিজয়তে শচীনন্দনঃ॥'

এই দেখ সেই কাঞ্চনপর্বত, করুণাপরবশ হয়ে প্রেমরত্ন বিতরণ করছেন, বিশ্বের ভরণ করছেন বলে যাঁর নাম বিশ্বম্ভর, যাঁর নেত্র-পথাশ্রিত গঙ্গাস্রোত নিজের ও পরের দুই ভুবন প্লাবিত করে দিচ্ছে, সেই শচীনন্দনের জয় হোক।

'গতোঽস্মি মথুরাং মম প্রিয়তমা বিশাখা সখী
গতা নু বত! কিং দশাং বদ কথং নু বেদ্যানি তাং।
ইতীব স নিজেচ্ছয়া ব্রজপতেঃ সুতঃ প্রাপিত-
স্তদীয় রসচর্ব্বণাং বিজয়তে শচীনন্দনঃ॥'

মথুরাগত আমার বিরহে আমার প্রিয়তমার কী দশা হল, বিশাখাসখীর কাছ থেকে কী করে সেই খবর পাব বলো—এই ভাবে যিনি স্বেচ্ছামত্ত রসের চর্বণ করছেন সেই নন্দনন্দন শচীনন্দনের জয় হোক।

ভক্তি কোথায় প্রকাশিত হয়? বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন, কোথাও কিছুর অপেক্ষা না করে ভক্তিদেবী স্বেচ্ছায় যথা-তথা আবির্ভূত হন। 'স্বপ্রকাশতাসিদ্ধ্যর্থমেব হেতুত্বানপেক্ষতা।' ভক্ত-কৃপা ছাড়া কি ভগবৎ কৃপা হয় না? না, হয় না। ভগবান ভক্তের বশীভূত বলে তাঁর কৃপাও ভক্তকৃপার অনুগামিনী। অর্থাৎ ভক্তকৃপা হলেই ভগবৎকৃপা। সেই ভক্ত পাই কোথায়? 'সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয়।' সেই সাধুসঙ্গ আমাকে কে এনে দেবে? ভগবন্নামই এনে দেবে সেই সাধুকে, স্বয়ং ঈশ্বরকে। ভগবানই গুরুরূপ ধরবেন। যে নামের আশ্রয় নিয়েছে ভগবানই তার ভার

নেবেন। তার আর শাস্ত্রবিধি পালনের দায় থাকে না। যদি তার কিছু কৃত্য থাকে তা ভক্তাধীন ভগবানই করে নেবেন। শুধু নামের শক্তিতেই সে ভগবানকে জয় করে নিয়েছে।

'জিতস্তেন জিতস্তেন জিতস্তেনেতি নিশ্চিতম।
জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম।'

যার জিহ্বাগ্রে হরি-নামক ছুটি অক্ষর বিরাজ করে সে ভগবানকে জয় করে নিয়েছে। 'প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার।'

হরি-ই একমাত্র গতি, অগতির গতি। ভক্ত যদি সুদুরাচারও হয় ভগবান তাকে আশ্রয় দেন। ভক্তের দুরাচরতা ভগবানকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করে আনে, কেননা তার দুরাচরতা যে তাঁকে দূর করতে হবে ক্ষমা করে। তাই ভক্তের মালিন্যই ভগবানের কাছে অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে ওঠে। যেমন পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক কবিদের চোখে পূর্ণচন্দ্রের অলঙ্কার।

তাই হরিনামই সকলের পরিত্রাণ।

'তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্বতা-
দটন্তু তীর্থাণি পঠন্তু চাগমান।
যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈ
র্হরির্বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি॥'

রৌদ্রে দগ্ধ হোক বা পর্বত থেকেই পড়ুক, তীর্থই ভ্রমণ করুক বা বেদশাস্ত্রাদিই পড়ুক বা যাগযজ্ঞই করুক বা তর্কবাগীশই হোক, হরি ছাড়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যাবে না।

নামকীর্তনাদি দ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ, অর্থাৎ ভগবানের তৃপ্তিবিধান, তাই মানুষের পরম ধর্ম।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করল: হে পিতামহ! কো ধর্মঃ সর্বধর্মাণাং ভবতো পরমো মতঃ? আপনার বিচারে কোন ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ?

ভীষ্ম বললেন :

'এষ মে সর্বধর্মাণাং ধর্মোঽধিকতমো মতঃ
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চেন্নরঃ সদা ॥
তমেব চার্চ্চয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম
ধ্যায়ন স্তবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ ॥'

কায়মনোবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির পূজা, ধ্যান, গুণকীর্তন ও নমস্কার দ্বারা তাঁর আরাধনা বা তাঁর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

স্বর্গলাভের জন্যে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান নয়, ভগবৎতত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের একমাত্র প্রয়োজন। 'জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ।' হে জনার্দন, তোমার প্রতি নিশ্চলা সেবাই মুক্তিপদবাচ্য। তোমার ভক্তরাই একমাত্র মুক্ত। মুক্তি অর্থ স্বরূপ-উপলব্ধি। 'নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈবমুক্তি র্জনার্দন। মুক্তা এব ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥' দান ব্রত তপ হোম জপ বেদাধ্যয়ন সংযম— এ সমস্ত উপায় মাত্র। কিসের উপায়? কৃষ্ণভক্তিলাভের উপায়। কৃষ্ণভক্তি না এনে দেওয়া পর্যন্ত এরা পণ্ডশ্রমমাত্র।

স্কান্দে বলছে :

বিষ্ণুভক্তি বিহীনানাং শ্রৌতাঃ স্মার্ত্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
কায়ক্লেশঃ ফলং তাসাং স্বৈরিণীব্যভিচারবৎ ॥

ব্যভিচারিণী নারী যেমন বহু পুরুষের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে কারুই সন্তোষ বিধান করতে পারে না তেমনি বিষ্ণুভক্তিহীন মানুষের সমস্ত শ্রৌত ও স্মার্ত ক্রিয়ার ফল অনর্থক কায়ক্লেশ। ভক্তিই পরমপ্রাপ্তি।

'সমস্ত লোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম।
তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥'

জল যেমন সমস্ত লোকের জীবন বলে প্রসিদ্ধ তেমনি ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির জীবনস্বরূপ। ভক্তিই মানুষকে ভগবানের কাছে নিয়ে

যায়, ভগবানকে দর্শন করায়। 'ভগবান একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই ভূয়সী—সর্বশ্রেষ্ঠা। 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি। ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ॥'

'হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে।' হৃষীক অর্থ ইন্দ্রিয়। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাহীনা নির্মলা ইন্দ্রিয়দ্বারা-কৃষ্ণসেবাই ভক্তি। সতী-নারী যে ভাবে পতিপরায়ণা সেভাবেই ইন্দ্রিয়পতি কৃষ্ণের সেবার্চনা। তাইতেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সতীত্বরক্ষা।

শুধু কর্মাচরণ দেখলে ভক্তি মহাদেবী দূরে যান, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার লোভে মন্ত্র-জপ করতে দেখলে ভক্তিদেবী মৃদু হাস্য করেন, সমাধিযোগ দেখলে চোখ বোজেন, একমাত্র দৈন্য দেখলেই উপনীত হন।

দৈন্য কী?

সর্বগুণান্বিত হয়েও নিরহঙ্কার চিত্তে 'আমি কিছুই করতে সমর্থ নই' এই আন্তরিক অপকৃষ্ট বুদ্ধি আরোপ করাই দৈন্য। দৈন্য বিনা প্রেম উদিত হয় না, আবার দৈন্য প্রেমেরই পরিপাক। লৌকিক দৈন্য রক্ষা করতে করতেই প্রেম দেখা দেবে আর প্রেম দেখা দিলেই প্রকাশিত হবে বাস্তবিক দৈন্য। যেমন শ্রবণ-কীর্তন করতে করতে জাগবে ভক্তি আবার ভক্তিই এনে দেবে ব্রজপ্রেম। প্রীতি ছাড়া ভক্তি কি সুখকর হয়? হয় না। যেমন নুন ছাড়া ব্যঞ্জন সুখকর নয়, ক্ষুধা ছাড়া আহার্য সুখকর নয়, ফুল-ফল ছাড়া উদ্যান সুখকর নয়।

সর্বগুহ্যতম উপদেশই ভক্তির উপদেশ। 'সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।' কৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভক্তির ভিত্তি। 'মন্মনা ভবমদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু।' আর, নমস্কারই শরণাগতি। নমস্কারই সমস্ত অহঙ্কারের নিষেধ। আমি কর্তা আমি ভোক্তা এই অভিমান ছাড়ার নামই নমস্কার। আমি কৃষ্ণদাস আমি কৃষ্ণ-সেবক এই দৈন্যবুদ্ধিই নমস্কার। আত্মনিবেদন ও স্বতন্ত্রতাবর্জনই একমাত্র মঙ্গল।

'কামাদীনাং কতি না কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতাময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লুব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়তঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥'

হে ভগবান, কামাদির কত দুষ্ট আদেশই না আমি পালন করেছি। তবু আমার প্রতি তাদের করুণা হল না, আর আমার লজ্জারও উপশম হল না। হে যদুপতে, আমি এখন তাদের পরিত্যাগ করে সদবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে তোমার অভয়চরণে শরণাগত হলাম, তুমি আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত করো।

'যথা হি পুরুষস্যেহবিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম। যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয়ঃ আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥' জীবের এই মনুষ্যজন্মে বিষ্ণুর শ্রীচরণাশ্রয়ই একমাত্র কর্তব্য, যেহেতু বিষ্ণুই সর্বভূতের নিবাস ও সুহৃদ। 'এতাবানেব লোকেঽস্মিন পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ। একান্ত ভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম॥' ভগবান গোবিন্দের প্রতি একান্ত ভক্তি আর সর্বভূতে তাঁকে দর্শন করাই ইহলোকে পুরুষের পরমস্বার্থ।

সুবুদ্ধি কী? কলিকলুষনাশিনী কৃষ্ণলীলাকথা। এই কৃষ্ণকথায় রুচি বা নিষ্ঠাই সম্যগব্যবসিতা বুদ্ধি, সম্যগনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—সত্যিকার সুবুদ্ধি। এই সুবুদ্ধি থেকেই কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। শরণ্য শরণাগতিকে রক্ষা ও পালন করবেন এতে আর আশ্চর্য কী।

সুতরাং কৃষ্ণৈকশরণ, নামৈকশরণ হও। আর যা কৃষ্ণনাম তাই গৌরনাম।

৯১

গৌরহরি নিত্যানন্দকে বললেন, গৌড়ে যাও, আমি প্রতিজ্ঞা করে আছি মূর্খ নীচ দরিদ্রকে প্রেমানন্দে ভাসাব। তুমি যদি উদ্দাম ভাব ছেড়ে মুনিধর্মে মন দাও তা হলে সংসার উদ্ধার হবে কী করে? তুমিই তো ভক্তিরসদাতা, তুমি ভক্তি দিয়ে সবার বন্ধন মোচন করো।

গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন নিত্যানন্দ। পথেই সর্বপারিষদকে প্রেমময় করে তুললেন। গঙ্গাতীরে পানিহাটিতে এসে রাঘব পণ্ডিতের ঘরে উঠলেন। 'সুকৃতি মাধব ঘোষ কীর্তনে তৎপর' দু ভাই গোবিন্দ আর বাসুদেবকে নিয়ে নাচতে লাগল। নাচতে লাগলেন নিত্যানন্দ, আর মুখে দুর্মদ হরি-হুঙ্কার।

'হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদভরে পৃথিবী করয়ে টলমল॥
নিরবধি 'হরি' বলি করেন হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে লাগে চমৎকার॥'

বলছেন সবাইকে :

'এতেকে তোমরা সব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউক প্রেমরসে॥'

ভক্তদের ঘরে-ঘরে পর্যটন করে ফিরতে লাগলেন। 'কি ভোজনে

কি শয়নে কিবা পর্যটনে। ক্ষণেকো না যায় ব্যর্থ সঙ্কীর্তন বিনে॥'
পানিহাটি থেকে খড়দহ হয়ে এলেন সপ্তগ্রামে। ভাগ্যবন্ত উদ্ধারণ দত্তের গৃহে। সপ্তগ্রামের ভক্তদের ঘরে-ঘরে কীর্তনে বিহার করতে লাগলেন।

'রাত্রিদিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্বদিগ হৈল হরিসঙ্কীর্তনময়॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি নগরে-চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তনে বিহরে॥'

তারপর শান্তিপুর হয়ে এলেন নবদ্বীপ।

'নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্তনে আনন্দ-মূর্তিমন্ত॥
পরম মোহন সঙ্কীর্তন মল্লবেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দবিশেষ॥'

লোকগতি দেখে অদ্বৈত শোকাকুল, কিসে এদের মঙ্গল হবে? বিবেচনা করে দেখলেন নামকীর্তন ছাড়া কলিকালে অন্য ধর্ম প্রশস্ত নয়। কিন্তু এ নাম প্রচার করবে কে? কৃষ্ণ যদি স্বয়ং অবতীর্ণ হন আর ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন তবে তিনিই নাম প্রচার করবেন। তা হলেই জগতের পরিপূর্ণ মঙ্গল, জীবের বহির্মুখতার অবসান।

'নাম বিনু কলিকালে ধর্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে কঁরো কীর্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥'

'পৃথিবীর শিরোমণি' হরিদাস কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধুতে নিরন্তর মগ্ন হয়ে আছেন। 'নির্জন বনে কুটির করে তুলসী সেবন। রাত্রিদিন তিন লক্ষ নামের গ্রহণ ॥'

'তবে হরিদাস গঙ্গাতীরে গোফা করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি ॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফাই হইল তান বৈকুণ্ঠ ভবন ॥'

'আচার প্রচার নামের কর তুই কার্য্য।' সনাতন বলছেন হরিদাসকে, 'তুমি সর্বগুরু তুমি জগতের আর্য ॥'

রূপগোস্বামী বলছেন :

'নারদবীণোজ্জীবনসুধোর্মিনির্যাসমাধুরীপূর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥'

হে কৃষ্ণনাম, তুমি নারদের বীণায় উজ্জীবিত হয়ে সুধাতরঙ্গের নির্যাসের মত মাধুরীপরিপূর্ণ হয়েছ। তুমি সরস হয়ে আমার রসনায় অজস্রস্ফূর্ত হয়ে ওঠো।

রঘুনাথদাস নামরসসুধাপানের জন্যে নিজের রসনার কাছে প্রার্থনা করছেন। 'পিব মে রসনে ক্ষুধার্তে।' হে আমার ক্ষুধার্ত রসনা, রাধানামের অমৃত ও কৃষ্ণনামের ঘন দুগ্ধ একত্র করে তাতে অনুরাগের কর্পূর মিশিয়ে অনুক্ষণ পান করো। সেই আস্বাদনের মত উপাদেয় আর কী আছে ?

শ্রীনিবাস বলছেন :

'আপনারে সাপরাধ মানি সর্বক্ষণ।
নিরন্তর করিবে এ নামসংকীর্তন ॥'

স্থাবর-জঙ্গমের নিস্তার হবে কী করে ? ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে। হরিদাস বলছেন :

'তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় তো শ্রবণ॥
শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করায় কার্তন।
তোমার কৃপায় এই অকথ্যকথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥'

সমস্ত জগৎ এই নামধ্বনিতে স্পন্দিত করে তোলো।
নরোত্তম দাস বলছেন :

'নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী নন্দের নন্দন।
নরোত্তম কহে এই নাম সংকীর্তন॥'

জড়ের উপর জয়ী হবে জীবন, আর এই জীবনের পূর্ণতা প্রেমে। আর একমাত্র নামেই প্রেমোদয়। 'প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি। নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥'

আর এই নাম নেবে নিরভিমানে, নিরপরাধে, অপার সহিষ্ণু হয়ে, নিরভিযোগে, বিনিঃশেষ নম্রতায়, অমানীকে মান দিয়ে। 'এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয়॥'

'সর্বভাবে ভজ লোক চৈতন্যচরণ।
যাহা হইতে পাবে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত ধন॥'

মহাজন পদাবলী বলছে :

'হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাঁকিয়া খোল করতালে
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া
কপাট হানিল দ্বারে॥'

নরোত্তম বলছেন : 'বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।' 'বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ।' 'সর্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে, কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে।' 'রাধাকৃষ্ণ পদধ্যান, না শুনিও কথা আন্, প্রেম বিনু অন্য নাহি চাও।'

'হরিনাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।
বিফলে মনুষ্যজন্ম যায় দিনে দিনে॥
দিন গেল মিছে কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।
মিছে মায়ায় বদ্ধ হৈয়া বৃক্ষসম হইনু॥
ফলরূপে পুত্রকন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে॥'

নিস্তার কী? নিস্তার নামকীর্তন। রূপ গোস্বামী বলছেন, অবিদ্যা পিত্তের দোষে রসনা তপ্ত হয়ে রয়েছে তাই কৃষ্ণনাম কীর্তনে রুচি হয় না। কিন্তু আদর করে অনুদিন নামমিছরি সেবা করলেই

পিত্তদোষ, তিক্তদোষ কেটে যাবে, নামমধুরিমা স্বাদ্বী হয়ে উঠবে, কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড় ভোগব্যাধিরও উপশম হবে। 'স্বাদ্বী ক্রমাত্তবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী।' সুতরাং পরম উৎসাহে, ধৈর্যে, বিশ্বাসে, কৃষ্ণনামের শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করবে।

'সর্বপাপ-প্রশমক সর্বব্যাধিনাশ।
সর্বদুঃখ বিনাশন কলিবাধাহ্রাস॥
নারকী-উদ্ধার আর প্রারব্ধ খণ্ডন।
সর্ব-অপরাধ ক্ষয় নামে অনুক্ষণ॥
সর্ব সৎকার্যের পূর্তি নামের বিলাস।
সর্ব বেদাধিক নাম মূর্তের প্রকাশ॥
সর্বতীর্থের অধিক নাম সর্বশাস্ত্রে কয়।
সকল সৎকর্মাধিক্য নামেতে উদয়॥
সর্বার্থপ্রদাতা নাম সর্বশক্তিময়।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম হয়॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্বজন।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন॥'

ভক্তির আনুকূল্যে কী করবে? রূপগোস্বামী উপদেশ করছেন, ষড়বেগদমন করবে। ষড়বেগ কী কী? বাগবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ। এই ষড়বেগ যে ধারণ করতে পারে সে সমস্ত পৃথিবী শাসন করতে সমর্থ। এই সব বেগে মন আবিল থাকলে শুদ্ধ ভক্তির অনুশীলন হয় না। বাগবেগের পরিচয় অযথার্থ বচনপ্রয়োগে, মনোবেগের পরিচয় নানা অভিলাষে, ক্রোধবেগের পরিচয় রূঢ়বাক্যপ্রয়োগে, জিহ্বাবেগের পরিচয় নানা রসলালসায়, উদরবেগের পরিচয় ভোজনপ্রয়াসে আর উপস্থবেগের পরিচয় কামসম্ভোগেচ্ছায়। নামানুশীলনে নামবলে নামকৃপায় এই ষড়বেগ প্রশমিত হবে। 'জিহ্বার লাগিয়া যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥'

বাক্য মন ও শরীরের এই ষড়বিধ চেষ্টা যে সম্যক সহ্য করতে সমর্থ সেই গোস্বামী।

ভক্তির কণ্টক কী? রূপগোস্বামী বলছেন, কণ্টকও ছ'টি। অত্যাহার অর্থাৎ অধিকসঞ্চয় বা আহরণ, প্রয়াস অর্থাৎ ভক্তিবিরোধী চেষ্টা বা বিষয়োত্তম, প্রজল্প অর্থাৎ কালহরণকারী অনাবশ্যক গ্রাম্য-কথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ স্বাধিকারগত নিয়মবর্জন ও অন্য অধিকারগত নিয়মগ্রহণ, জনসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণাভক্তসঙ্গ এবং লৌল্য অর্থাৎ তুচ্ছ বিষয়ে তৃষ্ণাচাঞ্চল্য। এই ছয় প্রাতিকূল্যে ভক্তির বিনাশ ঘটে।

'প্রেমের সাধন ভক্তি তাতে নৈলে আনুরক্তি
শুদ্ধ প্রেম কেমনে মিলিবে।
দশ অপরাধ ত্যজি নিরন্তর নাম ভজি
কৃপা হলে সুপ্রেম পাইবে॥
না মানিলে সুভজন সাধুসঙ্গে সঙ্কীর্তন
না করিলে নির্জনে স্মরণ।
না উঠিয়া বৃক্ষোপরি টানাটানি ফলধরি
দুষ্ট ফল করিলে অর্জন॥
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন সুবিমল হেম
এই ফল নৃলোকে দুর্লভ।
কৈতবে বঞ্চনামাত্র হও আগে যোগ্যপাত্র
তবে প্রেম হইবে সুলভ॥'

ভক্তিয় সহায়ক কা? এইখানেও ছয় অঙ্গ। রূপ গোস্বামী বলছেন, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য, তত্তৎকর্ম, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি। উৎসাহ অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য, নিশ্চয় অর্থাৎ বিশ্বাস, ধৈর্য অর্থাৎ অভীষ্টলাভে বিলম্ব দেখেও সাধনায় শিথিল না হওয়া, তত্তৎকর্ম অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনপালন ও কৃষ্ণপ্রীতির জন্যে ভোগবর্জন,

সঙ্গত্যাগ অর্থাৎ দুঃসঙ্গত্যাগ আর সাধুবৃত্তি বা সদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ সাধুদের সদাচার। এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তির সমৃদ্ধি ঘটে।

কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচাঞ্চল্য, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ছাড়া অন্য সঙ্গ বর্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ—এই ছয় বৃত্তিতেই ভক্তির বিস্তার।

ভক্তির পোষক কী? ভক্তির পোষক ভক্তসঙ্গ। রূপ গোস্বামী বলছেন, ছয়টি প্রীতিলক্ষণ। 'দদাতি প্রতিগৃহ্লাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম।' দেয় আর নেয়, গুপ্তকথা বলে ও জিজ্ঞাসা করে, খায় আর খাওয়ায়। অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করে ভক্তসঙ্গ করাই ভক্তিপ্রীতি। হরিবিরোধীরা আত্মঘাতী, তাই তাদের কাছে কিছু বলবে না, তাদের কথা কিছু শুনতেও চাইবে না। অশ্রদ্দধানকে হরিনাম দানও অপরাধ। 'আপন ভজন কথা কহিবে না যথাতথা।' তাদের থেকে খাবে না, তাদের খাওয়াবেও না। 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥' ভক্তের সঙ্গ করলেই প্রীতি বাড়বে, প্রসন্নতা জেগে থাকবে।

বৈষ্ণবসেবা কী ভাবে হবে? যার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হচ্ছে তাকে মনে মনে আদর করবে। দীক্ষিত হয়ে যদি কেউ হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকে তাকে প্রণাম করে আদর করবে। আর যিনি নিন্দাশূন্য মহাভাগবত তাকে ঈপ্সিতসঙ্গ জেনে শুশ্রূষাদ্বারা অর্থাৎ প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারা আদর করবে।

নামই সৎ, সারভূত সচ্চিদানন্দঘন। নামই চিন্ময় বস্তু। নামের মত জ্ঞান বা ধ্যান, ব্রত বা ফল, শম বা ত্যাগ, গতি বা পুণ্য নেই। নামই পরমামুক্তি, পরমাগতি, পরমাশান্তি, পরমাস্থিতি, পরমাস্মৃতি, পরমামতি, পরমাপ্রীতি। নামই জীবের কারণ, জীবের প্রভু, জীবের পরমগুরু।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করে, গৌরনিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নেই। অপরাধী কৃষ্ণনাম করলে কখনো নামফল বা কৃষ্ণপ্রেম পায় না, কিন্তু অপরাধী গৌরনিত্যানন্দ নাম নিলে তার অপরাধ মোচন হয়ে যায় আর অপরাধমোচনান্তে নামফলের অধিকারী হয়।

'কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥'

যে অনর্থযুক্ত তার দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্তিত হয় না। নামাপরাধ কোটি কৃষ্ণকীর্তন করলেও কৃষ্ণপদে প্রেম দেয় না। কিন্তু অনর্থযুক্ত হয়েও জীব যদি অকপট ভগবদ্‌বুদ্ধিতে গৌরনিত্যানন্দের নাম করে তার অনর্থ দূরীকৃত হয়। গৌরনিতাইয়ের কাছে কৃষ্ণবিমুখ কৃষ্ণোন্মুখ হয়ে যায়, অনর্থযুক্ত অনর্থমুক্ত হয়ে দাঁড়ায়, আর অনর্থ-মুক্তি ঘটলেই প্রেমোদয়।

'নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত।' পাপী-তাপীকে বললেন, তুমি যেই ধর্মপথে থেকে হরিনাম নেবে তুমি অমনি বৈষ্ণবাচার্য হয়ে লোকত্রাণ করতে পারবে।

'শুন দ্বিজ যত পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকাচুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবে পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া॥'

'জগৎ যারে ত্যাগ করে নিতাই তারে বুকে ধরে।' 'অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলে জগৎ যারে ঠেলে ফেলে। ভয় নেই, আমি তোর আছি বলে—নিতাই তারে করে কোলে।'

নিত্যানন্দের পদাশ্রয় ছাড়া গৌরকৃপা লাভ হয় না।

নরোত্তম বলছেন :

'নিতাই-পদ-কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
সে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃক্ষ জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা নিতাই পদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি!
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ভজ তাঁর চরণ দুখানি॥
নিতাই চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাইপদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥'

বলরাম দাস বলছেন :

'প্রভু কহে নিত্যানন্দ জগজীব হৈল অন্ধ
কেহ ত না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥

কৃত পাপী দুরাচার   নিন্দুক পাষণ্ড আর
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়   জীবে যেন নাহি রয়
মুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন   পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণপ্রেম দান করি   বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সংকীর্তন প্রেমরসে   ভাসাইয়া গৌড় দেশে
[illegible] কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা অবতারে   উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥'

নিত্যানন্দনর্তনে গৌর-আবির্ভাব। পতিত-উদ্ধারের জন্যে গৌরহরি বদ্ধপরিকর। তাই প্রাণাধিক প্রিয় নিত্যানন্দকে নিজ সঙ্গহারা করে পাঠিয়ে দিলেন গৌড়ে। জীবের জন্যে এমন করুণার কথা কেউ কোথাও শোনে নি। বললেন, তুমি কৃপা করে গৌড়ে যাও, সেখানে নিরর্গল প্রেমভক্তি প্রকাশ করো। তুমি ছাড়া জীবের গতি নেই। আমিও যাব তোমার সঙ্গে, কিন্তু অলক্ষিতে। তোমার কীর্তন-নর্তন দর্শন করব

'নামরূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্তিমন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
যত কিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তি যোগ অবতার॥
স্বর্ণমুক্তা হীরাকসা রুদ্রাক্ষাদিরূপে।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সবার হইল বিমোচন॥

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক সবারে।
তাহা বাঞ্ছে সুরসিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥
'স্বতন্ত্র' করিয়া দেবে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সঙ্কীর্তন সুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহকৃষ্ণ বিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জন প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে॥'

'যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণ সংকীর্তন।' বিপ্র এসে প্রকাশানন্দের কাছে মহাপ্রভুর বর্ণনা দিচ্ছে।

'নিরন্তর কৃষ্ণনাম তাঁর জিহ্বা গায়। দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধার প্রায়।'

প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন : 'সন্ন্যাসী হয়ে হীনাচার কর কেন? সন্ন্যাসীর আবার নাচ-গান কী!'

'কী করব! আমার গুরু আমাকে বললেন, তুমি মূর্খ, তুমি বেদান্তের অন্ত পাবেনা, তুমি শুধু কৃষ্ণমন্ত্র জপ করো। কৃষ্ণমন্ত্র থেকেই সব পাবে।' বললেন মহাপ্রভু, 'সেই থেকে আমার এই পাগল দশা। গুরুকে গিয়ে বললাম, এ আমাকে তুমি কী মন্ত্র দিলে, জপ করতে করতে পাগল হয়ে গেলাম। গুরু বললেন, তাই তো হবে, কৃষ্ণনামমহামন্ত্রের স্বভাবই তো এই, এই উন্মত্ততার নামই তো প্রেমানন্দ। বললেন, যাও, 'নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্তন।' তাঁর বাক্য আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, তাই নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করে যাচ্ছি। কৃষ্ণনামই আমাকে গাইয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।'

প্রকাশানন্দ হার মানলেন। মহাপ্রভুর চরণে দণ্ডবৎ করে হরিধ্বনি করে উঠলেন। বারাণসী দ্বিতীয় নবদ্বীপ হয়ে গেল।

তবে আর কথা কী। সমস্ত সংসার নবদ্বীপ হয়ে যাবে। সমস্ত জড়বস্তু প্রাণময় প্রেমময় হয়ে উঠবে। তবে আর কথা কী! 'নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্তন।'

'আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখ থুয়ে॥
রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই ঝঙ্কার।
ঘুমের পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফ'লে
রাখব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-খনে তোমারি নাম, বঁধু॥'